উত্তর বাংলার সেরা ওয়েব ম্যাগাজিন www.ekhondooars.com

উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

জল। জঙ্গল। জনসত্তা

সেপ্টেম্বর ২০২০। মূল্য ২০ টাকা

এমনি বরষা ছিল সে দিন

প্রতিনিধির মাথা গুনে নয়, উত্তর বাংলার প্রাপ্য মর্যাদা আসবে নেতৃত্বের উৎকর্ষতায়

বর্ষার পাঁচ গদ্য

জ্যোতির্ময় বিশ্বাস। আবিরা সেনগুপ্ত। সত্যম ভট্টাচার্য। সময়ীতা ঘোষ। মায়েদা আফরিন তনু।

পাঁচ প্রেমের গল্প

দেবায়ন চৌধুরী। দেবপ্রিয়া সরকার। শাঁওলি দে। হিমি মিত্র রায়। রঙ্গন রায়।

এবং অন্যান্য ধারাবাহিক ও নিয়মিত কলাম

ডুয়ার্সের বইপত্র অনলাইনে
www.dooarsbooks.com

এখন ডুয়ার্স

সপ্তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২০

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনা
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

সম্পাদকীয় দপ্তর সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট, পাহাড়ি পাড়া, কদমতলা, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

প্রচ্ছদ গৌতমেন্দু রায়

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সম্পাদকের চিঠি ৩
উত্তর বাংলার প্রাপ্য মর্যাদা আসবে নেতৃত্বের উৎকর্ষতায় ৫

ধারাবাহিক প্রতিবেদন
সার্জেন রেনী'র ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি ১০

গান্ধী ১৫০। খোলা মনে
গান্ধী না চাইলেও দেশভাগ হল কোন পরিস্থিতিতে?১৮

রাজনগরের রাজনীতি
কোচবিহারে কংগ্রেসকে ফিরিয়ে আনল ইন্দিরার ইমেজ ২২

আসামের চিঠি
করোনা-বন্যা-বেরোজগারির ত্রিফলা আক্রমণে আসাম ২৬

এ নদী কেমন নদী
করলা ও তিস্তার দিকে আর কবে নজর দেব? ২৯

গল্প
এমনি বরষা ছিল সেদিন ৩২, একমুঠো বকুল ৩৫, কোনো একদিন ৩৯, পেস্তা রঙের তোয়ালে ৪৩, রবীন্দ্রনাথের পাঞ্জাবি ৪৬

এ ডুয়ার্স কি তোমার চেনা?
বীরপাড়া: এক টুকরো সবুজ ভারত ৫১

পর্যটন। বৃষ্টিমুখর ডুয়ার্সের ডাকে করোনা যখন তুচ্ছ ৫৬

ধারাবাহিক উপন্যাস
ডাউন হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ৬০

ধারাবাহিক কাহিনি। তাজ্জব মহাভারত ৭১

বর্ষার গদ্য
ধরা যাক মেয়েটির নাম বর্ষা মুর্মু ৮০, তোমার জন্য লিখতে পারি এক পৃথিবী ৮৪, নদীর পাশে নদীর গন্ধ ৮৬, বর্ষা বন্দনা ৯০, সংক্ষিপ্ত বর্ষা ৯৩

শ্রীমতি ডুয়ার্স। বিজ্ঞানের দুনিয়ায় নারী ৮০, পাতাবাহার ৯২

আমচরিত কথা। ভিরিঙ্গি শিবপদ ৮৫

নিয়মিত বিভাগ। ফেসবুক পোস্ট ৯০, খুচরো ডুয়ার্স ৯৪

বড়লোকের বিদেশি রোগ ধরার বদ্যি মিলল কই?

ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার আগ্রাসী সফরের সামনে একটি ন্যানো মিলির নতুন ভাইরাস কোত্থেকে এসে চ্যালেঞ্জের কায়দায় প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল— যেভাবে চলছিল সেরকমটি আর চলবে না হে জনার্দন। অ্যাদ্দিন যা ভেবে এসেছ সব পাল্টে ফেলতে হবে বটে। শোষণের কায়দায় পরিবর্তন আসছে, হৃদপিণ্ডে রক্তপাতহীন সার্জারির মতই বেদনাহীন হবে বদলের নয়া দুনিয়া। তোমার মগজাস্ত্রকে অসাড় করে আলগোছে তোমাকে জুড়ে দেওয়া হবে নতুন ঘানিতে। শাসক গালিচা বিছিয়ে মসৃণ করে দিয়ে যাচ্ছে আগামীদিনের প্রভুদের আবির্ভাবের পথ, ঠিক যেমনটি তার পূর্বসুরীরা উপহার দিয়ে গিয়েছিল আজকের শাসন। এই চিরন্তন প্রথায় মানুষের সঙ্গে তার মনিবের মতই আচরণ অম্লান। কেবল জিভ পাল্টাতে আচারের মত মাঝেমধ্যে হাজির হয় বিপ্লব, নয়া শোষকের সাথে সান্ধ্য পানীয়ের আপ্লুত আড্ডা দিয়ে বলে যায়, প্রয়োজন হলে ডেকে নেবেন স্যর, প্রতিবাদে- বিদ্রোহে-মিছিলে -সঙ্গীতে-ভঙ্গিতে অচল করে দেব রাজপথ, দুচার দশটা তাজা লাশ ফেলতে চাইলে তাও হয়ে যাবে ডোন্ট ওরি।

ছবির শুরুটা হয়েছিল ধনতান্ত্রিক উন্নত দুনিয়াতেই। অনুন্নত পৃথিবীতে মানুষের অবরুদ্ধ মানসপটে দেখানো হল ভয়াবহ মহামারির অস্বচ্ছ একশ বছরের পুরনো সাদাকালো চলচ্চিত্র, রাস্তায় মৃতের শব ডিঙিয়ে হাঁটতে হচ্ছে জীবন্মৃতদের। সায়েন্স ফিকশনের ট্রিলিয়ন বাজেটের হলিউডি ছবিও মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে টাইলসের সাদা ফুটপাথে। চড়কি পাক লেগেছে বিজ্ঞানী-চিকিৎসকের মগজে, সিলেবাসে নেই বলে হাত তুলে ঘরে ঢুকে গেছে পরীক্ষক। আর আবেগের জোয়ারে কিছুদিন ভেসে এসেছে বস্তা বস্তা চাল ডাল আটা নুন বা সরষের তেল সয়াবীন, পথের কুত্তা বা ভিখিরিরা ক'টা দিন ফয়েল প্যাকে গরম ভাত-সব্জি পেয়েছে সাথে ন্যাপকিন মিনারেল জল। পাড়ায় পাড়ায় গণকিচেন থেকে ফ্ল্যাটবাবু ও অরন্ধনাদের রোজ ভোজ উৎসব মনে করিয়ে দিয়েছে, কমরেড এটাই লড়াই করে বাঁচবার পথ। বিদ্রোহী সমাজের আর্তচিৎকার 'টেস্ট চাই শুধু টেস্ট' কবে যেন ক্ষীণ হয়ে গেল খেয়াল নেই। ল্যাব যখন শেষমেশ পৌঁছেই গেল তোমার শহরে তখন তোমার ভয় 'কোথায় পাইলে গেল ট্যার পাইলাম না গো'। ডাক্তারই তো এখন বলে দিচ্ছেন, সুস্থ থাকলে টেস্ট কীসের? ঘরে থাকুন, বাইরে গেলে মাস্ক পড়ুন। যাহ কেলো! মৃতের মিছিল, অনাহারের স্তূপ কিংবা টেস্ট কিছুই তো হল না কত্তা! সব হিসেব তো গুইলে গেল গো! বাঁধের পাড়ে ঝুপড়ি চায়ের দোকানে রোগের নাম শুনে তো অবাক! ওতো বড়লোকদের অসুখ, এখানে পাবেন কোথায়? মানে? মানে ভিখিরিদের বা ফুটপাথের ক'টা মানুষ মরতে দেখেছেন দাদা?

আসলে ভাবনাচিন্তায় বা এতদিনকার বিশ্বাসে আমূল বদল না এলে, বহুল প্রচলিত অংক ধরে এগোলে আমাদের হোঁচট খেতে হচ্ছে বারবার। পিপিইর আড়ালে লুকিয়ে বিষণ্ণ ছোকরা ডাক্তার এখনই ভেবে ভেবে কুল পায় না, এর পরে চেম্বারে যদি আর না-ই ভিড় হয় তবে ইএমআই-ক্লান্ত কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর ফারাক রইল কোথায়? হেডলাইন বা সান্ধ্য আড্ডায় ক্রমাগত আতংকের কাহিনি ছড়িয়ে বাজার খুলতে বাধা দিয়েছে মিডিয়া, যার ফলে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তাকে শূন্যে নামিয়ে ফেলে নিজের অস্তিত্বকে সংকটেই ফেলেছে সংবাদপত্র বা চ্যানেলগুলি। তেমনই কেউ যদি আজ দাবি করে বিজ্ঞাপন নেই তাই রক্ষে কিছুটা! নইলে টিভিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বা যোগাগুরু কিংবা ফিল্মস্টারদের কথা শুনে কাল থেকে মাস্ক সত্যি সত্যিই সবাই ঠিকঠাক অভ্যেস করে ফেললে যে সামনের বছর দশেকের মধ্যেই ডাক্তারি কলেজের রমরমা ব্যবসায় মন্দা আসবে না, তা কে জোর দিয়ে বলতে পারে? যোগ্যতমের উদ্বর্তনে যাঁরা বিশ্বাসই করেন না, বাঁচার এইসব নতুন লড়াই তাঁদের চোখে ধরা পড়বে কি?

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

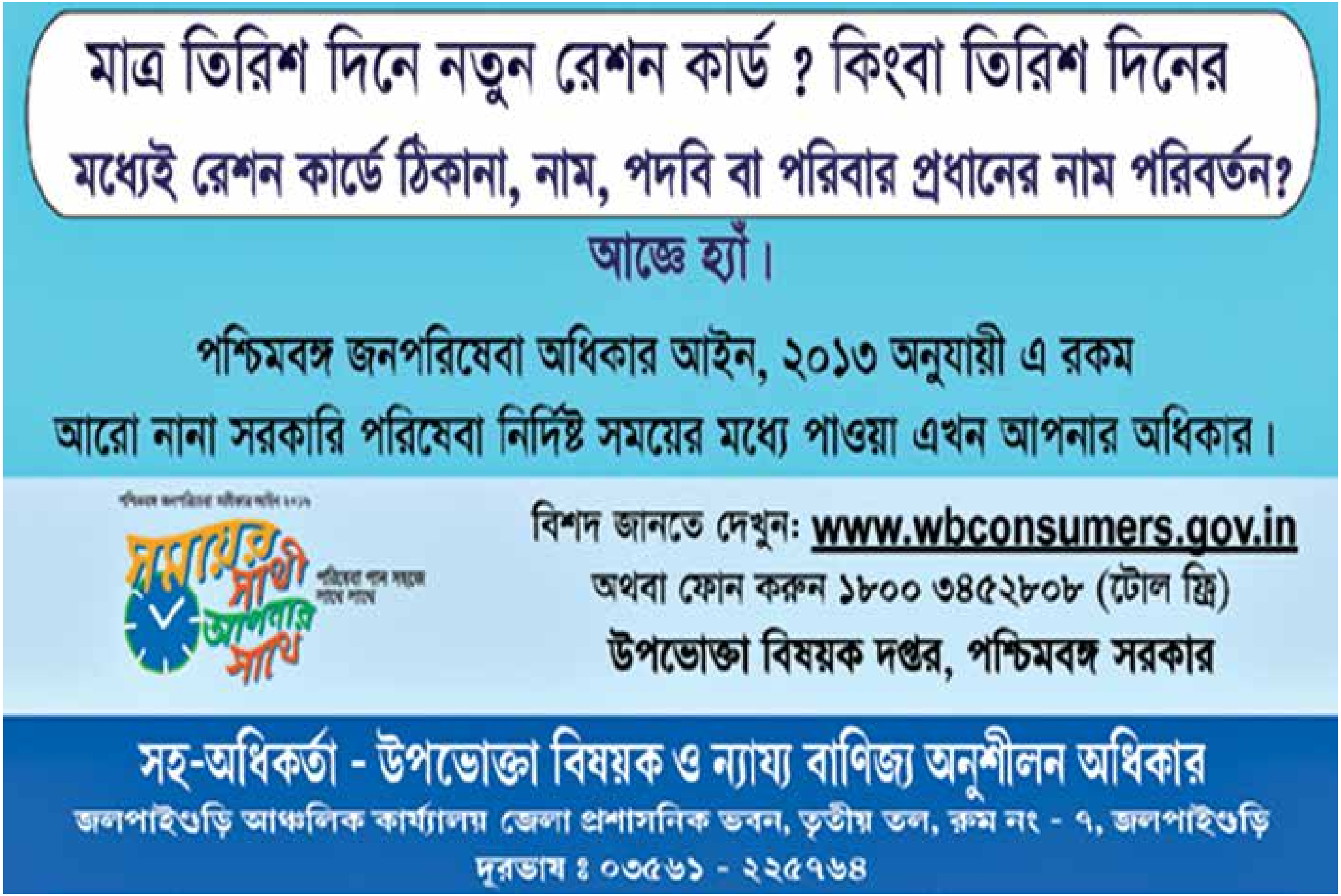
মাত্র তিরিশ দিনে নতুন রেশন কার্ড ? কিংবা তিরিশ দিনের
মধ্যেই রেশন কার্ডে ঠিকানা, নাম, পদবি বা পরিবার প্রধানের নাম পরিবর্তন?
আজ্ঞে হ্যাঁ।
পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৩ অনুযায়ী এ রকম
আরো নানা সরকারি পরিষেবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওয়া এখন আপনার অধিকার।
সময়ের সাথী আপনার সাথে
বিশদ জানতে দেখুন: www.wbconsumers.gov.in
অথবা ফোন করুন ১৮০০ ৩৪৫২৮০৮ (টোল ফ্রি)
উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
সহ-অধিকর্তা - উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার
জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কার্য্যালয় জেলা প্রশাসনিক ভবন, তৃতীয় তল, রুম নং - ৭, জলপাইগুড়ি
দূরভাষ ঃ ০৩৫৬১ - ২২৫৭৬৪

প্রতিনিধির মাথা গুনে নয়, উত্তর বাংলার প্রাপ্য মর্যাদা আসবে নেতৃত্বের উৎকর্ষতায়

সুমন ভট্টাচার্য

অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে নাকি অবিভক্ত চব্বিশ পরগণার দাপট ছিল সাংঘাতিক। কারণ সেই অবিভক্ত জেলাই সবচেয়ে বেশি সদস্য দিত। জেলা হিসেবে অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা নিজেদের এই দাপট ধরে রেখেছিল সিপিএমও। এই যে দাপট, এই যে প্রভাব, প্রতিপত্তি, তার সবটাই কিন্তু সংখ্যার জোরে। সংখ্যার এই দাপট একটা গণতান্ত্রিক বাস্তবতা। এর সঙ্গে কিন্তু উৎকর্ষের কোনও সম্পর্ক নেই। সেই জন্যই অবিভক্ত চব্বিশ পরগণার কতজন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গা পেয়েছে? বা পলিটব্যুরোতে? সংখ্যাটা কোনওদিনই খুব আশাপ্রদ নয়। অর্থাৎ সিপিএমের মত একটা আদর্শ ভিত্তিক দলেও, রেজিমেন্টেড দলেও সংখ্যার অনুপাতে

উৎকর্ষ তৈরি হয় নি।

কিন্তু সংখ্যা একটা বড় ফ্যাক্টর। সংখ্যা আপনাকে দলের ভিতরে এবং বাইরে একটা শক্তি দেয়। যে শক্তির প্রাবল্যে আপনি দলের ভিতরে সইফুদ্দিন চৌধুরীর মত তাত্ত্বিককে কোণঠাসা করে দিতে পারেন, এমনকি জ্যোতি বসুর মত জনপ্রিয় নেতাকেও দলের ভিতরে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নেতা বানিয়ে রেখে দিতে পারেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, সিপিএমের সরকারে যাওয়া উচিত কি না, সেই বিতর্কে জ্যোতি বসু সিপিএমের ভিতরে সংখ্যালঘু ছিলেন। গোটা নব্বই জুড়ে যে বিতর্কটা পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলকে আলোড়িত করেছে, যে বিতর্কের জেরে সইফুদ্দিন, সমীর পুততুন্ডরা দল ছেড়েছেন, পরবর্তীকালে যারই এক্সটেনশন হিসেবে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সিপিএম বহিষ্কার করেছে, সেই সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে দলের ভিতরে জ্যোতি বসুর মত ব্যক্তিত্বরাও সংখ্যালঘু ছিলেন। কারণ সেই সংখ্যা।

সংখ্যাকে সিপিএম বা একটি বামপন্থী দল কীভাবে গুরুত্ব দিত, সেটা বুঝতে পারলে হয়ত উত্তরবঙ্গের সমস্যাকে বুঝতে আমাদের সুবিধে হবে। কেন বামফ্রন্টের ৩৪ বছরে উত্তরবঙ্গ সেইভাবে গুরুত্ব পায় নি, উন্নয়নের নিরিখে পিছিয়ে ছিল, তা কিছুটা আন্দাজ করা যাবে। আরও একটা জিনিসকে মাথায় রাখতে হবে, যে কোনও একটা রেজিমেন্টেড দল বা সংগঠন, এক্ষেত্রে পড়ুন বামপন্থীরা, সবাইকে এক ধাঁচে ঢালতে চায়। কোনও বিভিন্নতা বা উৎকর্ষতাকে আলাদা করে স্বীকৃতি দিতে চায় না। আঞ্চলিকতা বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দেওয়া সেখানে বিচ্যুতি। সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়ন দেয় নি, আজকের চিনও দেয় না। প্রথমে সবাইকে এক এবং অভিন্ন করার চেষ্টা কর, তারপরে সেটা হয়ে গেছে মনে করলে সবাইকে সমান বলে ঘোষণা করে দাও। কারও আলাদা করে অস্তিত্বকে স্বীকার করো না। যে কোনও রেজিমেন্টশনের এটা নিয়ম।

এই রেজিমেন্টশনে শুধু সংখ্যা গুরুত্ব পায়, আর কিছু নয়। কোনও জাতিগোষ্ঠীর আলাদা করে কোনও সমস্যা আছে কিনা, ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে হওয়ার জন্য সে উপেক্ষিত হচ্ছে কি না, এইগুলো বিবেচিত হবে না। আঞ্চলিক সমস্যা এখানে আইডেন্টিটি পলিটিক্স হিসাবে গণ্য হবে এবং রেজিমেন্টশনের বিপরীতমুখী প্রচেষ্টা বলে ধরে তাকে দমন করার চেষ্টা হবে। এই আইডেন্টিটি পলিটিক্স এর বা আঞ্চলিক কোনও দাবিদাওয়ার অস্তিত্বকে কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা বিচ্যুতি হিসেবে দেখে। সেই আইডেন্টিটি পলিটিক্স কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের ক্ষেত্রেও হতে পারে বা কোন জনগোষ্ঠী, এলাকার ভিত্তিতেও হতে পারে। কমিউনিস্ট শাসন তাকে স্বীকৃতি দেবে না। ভেঙে যাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান, যা এককালে ভারতীয় কমিউনিস্টদের গাইডিং প্রিন্সিপল ছিল, পড়লেই আঞ্চলিকতাবাদকে কীভাবে দেখা হত, তা বোঝা যাবে। এই জন্যই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে রাশিয়া আর আজারবাইজানকে এক তুলাদন্ডে মাপা হত। জার শাসিত রাশিয়া যে অনেক উন্নত ছিল, তার সঙ্গে আজারবাইজান বা কাজাকস্তানকে এক আসনে বসানো সম্ভব নয়, সেটা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা দর্শনের দিক থেকে, সংবিধানের দিক থেকে স্বীকার করত না।

এই দর্শনকে আমি সব জায়গায় প্রয়োগ করেছি বলেই বুঝেও বুঝতে চাইব না কেন ব্রিটিশ শাসনে থাকার সময় থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ অনেক সুবিধা পেয়েছে, যা উত্তরবঙ্গ পায় নি! সেইজন্য উত্তরবঙ্গকে আলাদা নজরে দেখা উচিত, তার জন্য আলাদা পরিকল্পনা করা উচিত, কেন ভাবব সে কথা? মস্কো কাজাকস্তানের জন্য ভাবে নি, আমিও কলকাতায় বসে কোচবিহারকে আলাদা ভাবে দেখার মত সময়, মনযোগ কেন ব্যয় করব? মনে রাখবেন, সাচার কমিশনের রিপোর্ট এসে যাওয়ার পরও সিপিএমের সেটা মানতে অনীহা ছিল। মুসলিম অধ্যুষিত মালদহ বা মুর্শিদাবাদ যে উন্নয়নের নিরিখে অনেক পিছিয়ে, সেটা মেনে নিতে পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের তীব্র

অনীহা ছিল। কারণ তাহলেই আমি স্বীকার করে নেব আলাদা আলাদা জনগোষ্ঠীর এবং এলাকার উন্নয়নের মাপকাঠি আলাদা। সোভিয়েত মডেল বলেছে, মস্কোও যা, কিরগিজস্তানের বিশকেকও তা। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিশকেক যে ঐতিহাসিক ভাবে পিছিয়ে, তার জন্য যে উন্নয়নের আলাদা মডেল দরকার, এই কথা কমিউনিস্টদের সকলের জন্য এক তত্ত্বের পরিপন্থী। সোভিয়েত ইউনিয়ন যেটা মানতে চায় নি, সেটা আমি ভাগীরথী পারের মালদহের ক্ষেত্রে মেনে নেব কী ভাবে? অতএব অনুন্নয়নের সংখ্যাতত্ত্বকে মানতে না চাওয়া বাস্তবকে অস্বীকার করা।

একটা আদর্শ ফেডারেল কাঠামো এই সমস্যাগুলোকে জানে। সে কখনো সবাইকে একধাঁচে ঢালাই করে দেওয়ার চেষ্টা করবে না। আমরা যদি মন দিয়ে আমেরিকার সংবিধানকে পড়ি, তাহলে এই বিভিন্নতাকে স্বীকার করার, সেটাকে মেনে নিয়ে একসঙ্গে চলার চেষ্টাকে দেখতে পাব। জেফারসন বা হ্যামিল্টন, আমেরিকার সংবিধানের দুই প্রাণপুরুষ এবং ফেডারেলিজম এর দুই প্রবক্তা যেমন শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ার জন্য সওয়াল করেছেন, তেমনই আঞ্চলিক বিভিন্নতাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বারবার বলেছেন। সংখ্যা, শুধুই সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে কী সর্বনাশ হতে পারে, সেটা তারা জানতেন।

সেইজন্যই আমেরিকায় হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর পাশাপাশি সেনেট, যেখানে সব প্রদেশের সদস্যসংখ্যা সমান। ক্যালিফোর্নিয়ার ও যা, নিউ মেক্সিকো বা নিউ অর্লিয়েন্স-এরও তাই। ক্যালিফোর্নিয়ার জনসংখ্যা অনেক বেশি, তাই হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ-এ তাদের যত সদস্যই থাকুক, সিনেটে তারা এবং নিউ মেক্সিকো সমান। ফলে সংখ্যাই, শুধুমাত্র সংখ্যার অ্যাডভান্টেজই শেষ কথা বলছে না।

ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণেতারা মার্কিন সংবিধান থেকে অনেক কিছু নিলেন, ফেডারেল শব্দটাও নিলেন, কিন্তু সংখ্যাকে ব্যালেন্স করার কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা তৈরি করতে পারলেন না। মার্কিন সিনেট-এর আদলে আমাদের সংসদের যেটা উচ্চকক্ষ, সেই রাজ্যসভায় সব রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। উত্তরপ্রদেশ আর গোয়া, রাজ্যসভায় সমসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠায় না। তাই আমাদের সংসদের উচ্চকক্ষ মার্কিন সিনেটের মত নয় যে সব রাজ্য একজায়গায় দাঁড়িয়ে। আমাদের রাজ্যসভায় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব

উত্তরবঙ্গ থেকে উঠে আসা সবচেয়ে বিখ্যাত দুই সাহিত্যিকের কথা ভাবুন, যাঁদের লেখায় নদীর গন্ধ, যাঁদের গল্পে সন্ধ্যা নামে চা বাগানে, তাঁরা গত চল্লিশ বছর ধরেই কলকাতাবাসী। যদি আপনি যুক্তি হিসেবে বলেন ওঁরা চাকরির প্রয়োজনে কলকাতা অভিমুখী হয়েছিলেন, তাহলেও দেখবেন অবসরেও ওঁরা আর উত্তরবঙ্গে ফিরে আসেন নি। পশ্চিমের ক্রিস হেমসওয়ার্থের উদাহরণ যেখানে আমাদের দেখায় তুমি তারকা হয়ে গেলে নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠো, নিজের অবস্থান দিয়ে শিকড়কে চেনাও, উত্তরবঙ্গের উদাহরণ ঠিক উল্টো। সফল হলেই নিজের শিকড়কে ভুলে যাও।

জনসংখ্যার অনুপাতেই।

ভারতীয় সংবিধানের এই যে দুর্বলতা সেটাই আবার বিভিন্ন রাজ্যকেও সংখ্যার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করেছে। প্রথমত আমাদের সব রাজ্যের আইনসভায় কোনও উচ্চকক্ষ নেই। যে সব রাজ্যে রয়েছে সেখানেও সব জেলার সমান প্রতিনিধি পাঠানোর সুযোগ নেই। যদি থাকত তাহলে হয়ত পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির কাছে একটা

সুযোগ থাকত নিজেদের আরও মেলে ধরার, সবসময় সংখ্যার নিরিখে পিছু হটে যেতে হত না।

ভারতীয় সংবিধানের এই দুর্বলতার কথা মাথায় ছিল বলেই এখন ডুয়ার্স-এর ওয়েব ম্যাগাজিনের জন্য যখন লিখেছিলাম, তখন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি ভেঙে গিয়ে একটা আলাদা রাজ্য তৈরি হওয়াটাকে অনিবার্য বা আদর্শ সমাধান হিসেবে আমি সওয়াল করি নি। কারণ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে আলাদা রাজ্য হলেই তো সেই রাজ্য আমাদের রাজ্যসভায় সমান গুরুত্ব পাবে না। দ্বিতীয়ত, আজকের পৃথিবীতে যে কোনও রাজ্য বা

ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণেতারা মার্কিন সংবিধান থেকে অনেক কিছু নিলেন, ফেডারেল শব্দটাও নিলেন, কিন্তু সংখ্যাকে ব্যালেন্স করার কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা তৈরি করতে পারলেন না। মার্কিন সিনেট-এর আদলে আমাদের সংসদের যেটা উচ্চকক্ষ, সেই রাজ্যসভায় সব রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। উত্তরপ্রদেশ আর গোয়া, রাজ্যসভায় সমসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠায় না।

রাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে তার অর্থনীতির উপরে, তার রাজস্ব আদায়ের শক্তির উপরে। সেখানে উত্তরবঙ্গ কোথায় দাঁড়িয়ে? সে কি অর্থনৈতিকভাবে এই চ্যালেঞ্জটা নিতে পারবে?

শুধুমাত্র আবেগের বশে পাকিস্তান নামক আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে জিন্নাহ যে ভুল করেছিলেন, সেই রাষ্ট্রের রাজস্বের কী হবে সেই নিয়ে কোনওরকম চিন্তা না করাটা আজকের পাকিস্তানকে কোন সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিয়েছে, তা আমরা সবাই বুঝি।

পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতনের পরে সাবেক যুগোস্লাভিয়া বা চেকোস্লাভাকিয়া ভেঙে যেসব রাষ্ট্রগুলো তৈরি হয়েছে, সেগুলি কি ভাল উদাহরণ হিসেবে খাড়া হয়েছে? তাদের অর্থনীতি কি খুব শক্তিশালী জায়গায় দাঁড়িয়ে? তাহলে শুধু আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বা নিজেদের অস্তিত্বকে আরও প্রবল জানান দেওয়ার ইচ্ছে যে আইডেন্টিটি পলিটিক্স তৈরি করে, তা যদি সবসময় নিজের আলাদা আইডেন্টিটি তৈরি করতে চাপ দেয়, তা সবসময় কাম্য নাও হতে পারে। ইউরোপের উদাহরণ আমাদের সেটাই শিখিয়েছে। ঐক্যবদ্ধ জার্মানিকে একদিকে আর তার বিপরীতে স্পেনের সাম্প্রতিক রাজনীতিকে রাখলে, যেখানে একটি প্রদেশ বেরিয়ে আলাদা রাজ্য হয়ে যেতে চাইছে, আমরা দাড়িপাল্লায় মেপে নিতে পারব, কোনটা ঠিক রাস্তার সন্ধান দিতে পারে।

সংখ্যার বিপরীতে দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গ কোন মডেলকে অনুসরণ করতে পারে, সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমি এখন ডুয়ার্স এর ওয়েব পত্রিকায় ইজরায়েল-এর কথা টেনেছিলাম। কেন ইজরায়েল সফল, কেন তারা নিজেদেরকে আরব দুনিয়ার প্রতিস্পর্ধী হিসেবে খাড়া করে ফেলতে পারল, সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছিলাম। এই লকডাউন আর করোনার পৃথিবীতেও যদি কেউ ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ইজরায়েলের সিরিজ বা সিনেমা দেখেন, তাহলে বিষয়টা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। ইজরায়েলের ট্রাম্পকার্ড কখনই ট্রাম্প মহোদয় নন, বরং তার নিজস্ব উৎকর্ষতা। শুধু মেধা আর উৎকর্ষতাকে অবলম্বন করে তেল আভিভ এমন সব চমৎকারিত্ব দেখিয়েছে যে আজ গোটা দুনিয়া তাকে কুর্ণিশ করে। এমনকি সুন্নি শক্তিধর সৌদি আরবও তার সঙ্গে গোপন আঁতাত রেখে চলতে বাধ্য হয়।

আমাদের মাথায় রাখতে ইজরায়েল-এর কাছে কখনই সংখ্যায় হারিয়ে দেওয়ার সুযোগ ছিল না। যেটা ছিল সেটা তার ট্যালেন্ট পুল, মেধা আর উৎকর্ষতার নিরিখে তৈরি হওয়া মানব সম্পদ। যে মানব সম্পদ আর উৎকর্ষতার পরিচয় দেশটার মানব সম্পদে, ইজরায়েল এর বিজ্ঞান চর্চায়, প্রযুক্তিতে বা

আজ কৃষি থেকে শুরু করে সমরাস্ত্র বানানোতে।

উত্তরবঙ্গ কি ইজরায়েলের মডেল অনুসরণ করে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে মননে এবং উৎকর্ষতায়? কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। কঠিন এই কারণে যে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা সুশীল সমাজ এতদিন বিষয়টি ভাবেন নি, বা নিজেদের প্রতিস্পর্ধী মডেল খাড়া করার চেষ্টা করেন নি। এমনিতেই রাজ্য হিসেবে আমাদের সাংঘাতিক কলকাতা কেন্দ্রিকতা আছে, যেটা একদম ইউরোপ বা আমেরিকার সঙ্গে মেলে না। যেমন ধরা যাক হলিউডের এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় এবং দামী তারকা ক্রিস হেমসওয়ার্থ যতদিন আমেরিকায় পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পান নি, ততদিন ক্যালিফোর্নিয়ায় এপাশে ওপাশে থাকতেন। কিন্তু যেই ফোর্বসের বিচারে সবচেয়ে দামী তারকা হয়ে গেলেন, অমনি হেমসওয়ার্থ অস্ট্রেলিয়ায় নিজের দেশে চলে গেলেন। শুটিং থাকলে আমেরিকায় আসেন।

এর বিপরীতে উত্তরবঙ্গ থেকে উঠে আসা সবচেয়ে বিখ্যাত দুই সাহিত্যিকের কথা ভাবুন, যাঁদের লেখায় নদীর গন্ধ, যাঁদের গল্পে সন্ধ্যা নামে চা বাগানে, তাঁরা গত চল্লিশ বছর ধরেই কলকাতাবাসী। যদি আপনি যুক্তি হিসেবে বলেন ওঁরা চাকরির প্রয়োজনে কলকাতা অভিমুখী হয়েছিলেন, তাহলেও দেখবেন অবসরেও ওঁরা আর উত্তরবঙ্গে ফিরে আসেন নি। পশ্চিমের ক্রিস হেমসওয়ার্থের উদাহরণ যেখানে আমাদের দেখায় তুমি তারকা হয়ে গেলে নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠো, নিজের অবস্থান দিয়ে শিকড়কে চেনাও, উত্তরবঙ্গের উদাহরণ ঠিক উল্টো। সফল হলেই নিজের শিকড়কে ভুলে যাও। যদি নিউইয়র্ক পৌছে যেতে পারো তাহলে কদাপি নিজের ভিটের কথা মাথায় রেখো না। দিল্লি কিংবা মুম্বই থাকলেও শিকড়কে ভুলে যাও। নিদেনপক্ষে কলকাতার ফ্ল্যাটের ছবি পোস্ট করো।

ভারতবর্ষের অন্য রাজ্য কিন্তু এইভাবে নিজের শিকড়কে অস্বীকার করে না। রাজনীতিকরা তো করেনই না। শরদ পাওয়ার যতটা যত্নে বারামতীকে সাজিয়েছেন বা নীতিন গড়কড়ি নাগপুরকে, কোচবিহার নিয়ে কমল গুহ বা কালিয়াগঞ্জ নিয়ে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি ততটা ভেবেছিলেন কি? শেষ জীবনে রায়গঞ্জের সাংসদ হিসেবে তাও উত্তরবঙ্গে এইমস নিয়ে আসার বিষয়ে দাশমুন্সির যেটুকু সচেষ্টতা, কিন্তু রাজনীতির প্রথম ইনিংসে তিনি কতটা উত্তরকে নিয়ে ভেবেছেন? মতি নন্দীকে ধার করে বলতে গেলে সেই ইনিংসে তো প্রিয়রঞ্জন রাজ্যের নেতা, তার পরে সর্বভারতীয় নেতা।

গত পঞ্চাশ বছরের রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করলে উত্তরবঙ্গ থেকে উঠে আসা সবচেয়ে উজ্জ্বল রাজনৈতিক নামগুলো হচ্ছে কমল গুহ, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি, বরকত গণি খান চৌধুরি এবং অশোক ভট্টাচার্য। লক্ষণীয় এদের মধ্যে দুজন ডানপন্থী এবং দুজন বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তৃণমূলের এক যুগের শাসনে এমন কোনো আইকনিক নেতা উঠে আসেন নি যিনি গোটা রাজ্যের নজরকে উত্তরবঙ্গের দিকে টেনে আনবেন। ওই চারজন রাজনৈতিক দিক থেকে পারতেন, গনি মালদহের জন্য এবং অশোক ভট্টাচার্য শিলিগুড়ির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছেন। তার ডিভিডেন্ড অশোকবাবু যেমন পাচ্ছেন, তেমনই গনি পরিবারও এখনও তুলে যাচ্ছে।

কিন্তু বাকিটা? বাকিটা ব্যক্তিগত? যদি সেটাই বাস্তব হয়, তাহলে সেটাই উত্তরবঙ্গের দুর্ভাগ্য।

এবং সেই দুর্ভাগ্য, সেই রাজনৈতিক নেতৃত্ব না পাওয়াটাই উত্তরবঙ্গের ইজরায়েল মডেল অনুসরণে বাধা। মেধা আর উৎকর্ষ দিয়ে সংখ্যাকে টপকে যাওয়ার চেষ্টাটা যাঁরা করতে পারতেন, তাঁরা করেন নি বা করছেন না। দক্ষিণবঙ্গের ন্যারেটিভ-এর কাছে তাঁরা উত্তরবঙ্গের আইডেন্টিটিকে আত্মসমর্পণ করিয়ে দিয়েছেন। তাই অসমের বন্যা উত্তরবঙ্গে ঢুকে পড়তে চললেও রাজ্য জুড়ে তোলপাড় হয় না।

কিন্তু এই টুইটার ফেসবুকের যুগে এসে কি উত্তরবঙ্গ বদলাবে?

সার্জন রেনী'র 'ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি'

ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের ঐতিহাসিক লিপি

উমেশ শর্মা

সার্জেন রেনীর অভিজান: কলকাতা থেকে কারাগোলা হয়ে জলাপাহাড়

সার্জেন রেনী ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামে ৫৪ নং রেজিমেন্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর চিকিৎসক। ২৩শে ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে কমান্ডার-ইন-চিফ ৮০ নং রেজিমেন্টে যোগদান করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন যে, সেখানেও তিনি চিকিৎসক হিসেবেই কাজ করবেন। এ জন্যে তিনি প্রয়োজনীয় ডাক্তারি যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়েছিলেন। ৮০ নং রেজিমেন্টও যথাসময়ে দমদম থেকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি স্টেশনে সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হন। সেনাবাহিনীর লোকজনদের মধ্যে তখন অজানা নানা বিষয় নিয়ে বিশৃঙ্খলা চলছিল। ভারতীয় সৈনিকদের ভাষা না জানায় সার্জেন রেনী কিছু বুঝতে পারছিলেন না।

এটি স্পেশাল ট্রেন। হাওড়া থেকে ২৪৫ মাইল দূরবর্তী গঙ্গা নদীর তীরবর্তী কহলগাঁও ওই ট্রেনটির লক্ষ্যস্থল। তখন রাত ৮.৩০টা বাজে। পরদিন সকাল ৭টায় লিনথেয়া নামক জায়গায় পৌঁছায় এবং সকাল ৯টায় পৌঁছায় নলহাটিতে। এখানে সাহেবদের ব্রেকফাস্টের জন্য ২০ মিনিট বিরতি। দেশিয় সেনাদের রান্নাবান্না করা, ব্রেকফাস্ট তৈরি করার ব্যবস্থাও ট্রেনের মধ্যে। পরবর্তী বিরতি কলকাতা থেকে ২২০ মাইল দূরবর্তী সাহেবগঞ্জে। সাহেবগঞ্জের কয়েক মাইল আগে রাজমহলের তেলিয়াগঞ্জ দুর্গ। আগে গঙ্গাতীরবর্তী হলেও এখন গঙ্গা সরে গিয়েছে দূরে। বিকেল চারটেয় ট্রেনটি কলগাঁও-এ পৌঁছায়। গঙ্গার ধারে এটি একটি বড় জনপদ। এখানে দেশিয় নৌকা করে গঙ্গার অপর পারে কারাগোলা ঘাটে পৌঁছাতে হবে। সহেবগঞ্জ থেকে এর দূরত্ব ২২ মাইল।

কারাগোলা ঘাট থেকে সেনাদলটি পূর্ণিয়া হয়ে ১০৫ মাইল অতিক্রম করে রংপুর জেলার তেঁতুলিয়ায় যাবে। সেখানে ৫ কোম্পানি সেনা নিয়ে একটি বাহিনী ডুয়ার্সের ময়নাগুড়ি হেড কোয়ার্টারে যাবে। কর্ণেল হক্স সেখান থেকে ৫৫ মাইল দূরের দার্জিলিং-এ যাবেন। ডুয়ার্সের বাহিনীর অধিনায়ক হবেন মেজর হার্ডিঞ্জ।

কারাগোলাতে ওই সময়ে তিব্বতের কাম্পা ব্যবসায়ীদের তাঁবু খাটানো হয়েছিল। তাঁবুর ভেতরে

ডাকবাংলো থেকে ২০০ মাইল দূরবর্তী হিমালয়ের তুষার ঢাকা পাহাড় দেখতে পেয়েছিলেন সার্জেন রেনী। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। এমনকি ২২০ মাইল দূরবর্তী ভাগলপুর থেকেও তুষারশৃঙ্গ দেখা যায়।

ব্যবসায়িক মালপত্র। তারা বিক্রয়যোগ্য মালপত্রের বিনিময়ে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতেই এসেছেন। কিন্তু ওই সময়ে এ সব জিনিসপত্র কেনাবেচা ছিল নিষিদ্ধ। ফলে ভুটানের চাহিদা মেটাতে না পারায় উভয়পক্ষে একটা চাপা অসন্তোষ চলছিল। ওই দলে ছিলেন একজন মহিলা। শান্তস্বভাবা, দেখতে কিন্তু খুব একটা খারাপও ছিলেন না। মাথায় ঝোলানো দু'টি বেণী দেখে সাহেব সার্জেন তো বিশ বছর আগেকার ইংল্যান্ডের ফ্যাশানের সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন। তার সঙ্গের লোকটির পোশাক-আশাকও চিন দেশের ফ্যাশনের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে গিয়েছিল।

সেদিন সারাদিন ধরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। গঙ্গার ঘাট কর্দমাক্ত। নদী পারাপারেও প্রচণ্ড দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় আশ্রয় পেয়েছিলেন একটি ডাকবাংলোয়। দার্জিলিং রোডে ২৫ মাইল অন্তর অন্তর এমন ডাকবাংলো গড়েছিল ব্রিটিশ সরকার। যে কোনও মানুষ ২৪ ঘণ্টা এরূপ ডাকবাংলোয় থাকতে পারেন। চারটি ঘর— দুটি পুরুষদের জন্য এবং দুটি মহিলাদের জন্য। নিজেদের রাঁধুনি বা স্থানীয় রাঁধুনি দিয়ে রান্নাবান্না করবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ সব বাড়ি সময়মত সংস্কার করা হয় না বলে কোথাও কোথাও সাপখোপের আড্ডা হয়ে ওঠে।

ওই ডাকবাংলো থেকে ২০০ মাইল দূরবর্তী হিমালয়ের তুষার ঢাকা পাহাড় দেখতে পেয়েছিলেন সার্জেন রেনী। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। এমনকি ২২০ মাইল দূরবর্তী ভাগলপুর থেকেও তুষারশৃঙ্গ দেখা যায়। সিকিমের কাঞ্চনজঙ্ঘাও (২৮,১৭৭ ফুট) দেখা যায় সেখান থেকে।

তিনি ২৬শে ফেব্রুয়ারিতে জানতে পারলেন যে, তাদের মালপত্র, হাসপাতালের সামগ্রীসমূহ নিয়ে ৬ নং কোম্পানির সৈনিকেরা প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়ার জন্য তখনও কূলে পৌঁছাতে পারেনি। সার্জেন রেনী গঙ্গা পারাপারকারী দেশিয় নৌকাগুলোর পরিবহণ ব্যবস্থার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারিতে ৮০ নং রেজিমেন্টের সৈনিকেরা মালপত্র নিয়ে রওয়ানা দেবার মুহূর্তে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। মালপত্র সব ভিজে একশা! সকালে প্রচণ্ড শীতল বাতাস। নদী ঘাটও কর্দমাক্ত। সেদিন কারাগোলায় পৌঁছানোর আশা ছিলই না। স্থানীয় কমিশনারকে বলে নৌকার যাত্রীদের খাবার পাঠানো ব্যবস্থাও করা হয়। ইত্যাদি দায়িত্ব নিয়েছিলেন মুন্সী কৈরৎ আলি।

২৬ তারিখে দিনের শেষে ১৯ নং পাঞ্জাবি পদাতিক বাহিনী কহলগাঁও থেকে ভেজা জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে পৌঁছেছিল। অবশেষে স্থাপিত হয়েছিল সৈন্যশিবির।

২৭ ফেব্রুয়ারির পূর্বরাতে প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল। সকালে অবশ্য আকাশ বেশ পরিষ্কার। এবার কারাগোলা ত্যাগের পালা। ৫৫ নং রেজিমেন্টের বাম বাহিনীর হারিয়ে যাওয়া সৈন্যরা এসেছিল বিকেলে। এরা কোচবিহার যাবে।

সারাদিন কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র ধোওয়া ও শুকনোর কাজে গেল। বিকেলবেলা গোরুর গাড়িতে মালপত্র তুলে দেওয়া হল। ওই গাড়িগুলি ১৪০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করবে। প্রতিদিনকার ভাড়া মাত্র আট আনা। এবং ফেরার সময়ের ভাড়া চার আনা। ৩০০০ গো-যান-এ রওয়ানা দিলেন তারা। রওয়ানা দেবার তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং সময় সকাল পাঁচটা। এতগুলো গাড়ি ও ব্রিটিশ সেনাদের দেখতে রাস্তার দু'ধারে কৌতূহলী নরনারীর ভিড় কম ছিল না।

পূর্ণিয়া, দার্জিলিং ও রংপুরের একটি প্রধান নদী

বন্দর হল কারাগোলা। সেখানে ঘন বসতি, কুড়ে ঘর, হাট-বাজার— সবই আছে। এখানকার খাঁটি দুধের স্বাদ অপূর্ব। ঘুটে দিয়ে দুধ জ্বাল দেওয়া হয় এবং কাঁচা দুধ বড় বড় জালায় রাখা হয়। ওই জালাগুলি প্রতিদিন ভালভাবে ধোওয়া হয় না বলে অনেক সময় দুধ নষ্ট হয়ে যায়। পান করলে অম্বল হয়।

পূর্ণিয়া, ডিংগ্রা, অসুরাগর, কিষানগঞ্জ, গাজোল, চোপরা, আলুয়াগড়ি:

৮০ নং রেজিমেন্ট কারাগোলা থেকে ২৮ তারিখে সকাল পাঁচটায় রওয়ানা দিয়েছিল। ওই দল ৯ মাইল দূরে লক্ষ্মীপুরে প্রথম ক্যাম্প স্থাপন করবে। যাবার সময়ে একজন সৈনিকের কলেরা দেখা গিয়েছিল। উল্টোপাল্টা খাওয়াদাওয়া, পানীয় জলের অভাব ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ— কারোরই সহ্য হচ্ছিল না। তবে, কলেরা আক্রমণের অন্য কারণও থাকতে পারে। লোকটি দু'দিন নদীতে বেপাত্তা ছিল।

লক্ষ্মীপুর জায়গাটি একটি উঁচু স্থান। বন্যার জল সেখানে তেমন দাঁড়ায় না। জনবসতিও বেশি নেই। রাস্তার দিকে মুখ করে সেখানে তাঁবু টাঙানো হয়েছিল। একটা তাঁবুতে ১৬ জন ভারতীয় লোকের শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে প্রত্যেক লোকের ৩৪০ বর্গফুট বাতাস পাওয়ার সুবিধা হয়।

পরের দিন (২৯শে ফেব্রুয়ারি) লক্ষ্মীপুর থেকে ১১ মাইল দূরবর্তী চিত্রেপিতে আস্তানা গাড়া হয়েছিল। সকাল ৪.৩০ টায় রওয়ানা দেবার মুহূর্তে জানা গেল যে, কলেরায় আক্রান্ত ব্যক্তিটি মারা গিয়েছেন। ওই মুহূর্তে তার সৎকার করা সম্ভব নয়। তাই তাকে বহন করেই নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পথিমধ্যে একের পর এক কলেরায় আক্রান্ত রোগীর খবর পেয়ে তাদেরকে সামরিক হাসপাতালের ক্যাম্পে পাঠানো হল। রেনী জানতে পারেন যে, প্রচণ্ড খিদেয় পথের ধারে চাষীর জমি থেকে কাঁচা শশা তুলে খেয়েছিলেন এক সৈনিক। আর একজন সৈনিক দোকান থেকে আটা কিনে জলে গুলিয়ে খেয়ে পেটের জ্বালা নিবারণ করেছিলেন।

চিত্রেপি জায়গাটা লক্ষ্মীপুরের মতই উঁচু এক সমতলভূমি। সেখানে কবর খুঁড়ে মৃতদেহটি পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। ওই কবরস্থানে ম্যাকজের নামক এক সৈনিকের কবর ছিল। সমাধিক্ষেত্রের একটি গাছে টাঙানো টিনের উপরে লেখা ছিল, দার্জিলিং যাবার পথে ওই সৈনিকটি ১৮৬৪ সালের ৮ ডিসেম্বর প্রয়াত হয়েছিলেন।

মার্চ মাসের দুই তারিখে ভোর ৪টা নাগাদ ১০ মাইল দূরের পূর্ণিয়া শহরের উদ্দেশে সেনাদল যাত্রা শুরু করে। ওই দল পূর্ণিয়া নদী পার হয় সকালে। নদীতে পাথর ফেলে সেতু বানিয়ে নদী পেরনো সম্ভব হয়েছিল। তারপর পূর্ণিয়া শহরের ডাকবাংলোর পাশে ফেলা হয়েছিল ছাউনি।

পূর্ণিয়া জেলার সদর শহর হল পূর্ণিয়া। জায়গাটি সমতল। কিন্তু স্যাঁতসেতে। এখানকার প্রধান ফসল হল ধান ও নীল চাষ। শহরে সরকারি কর্মীদের বাড়িঘরগুলো বিচ্ছিন্ন। সাধারণ বসতিও বেশি নয়। শহরে আছে ডাকঘর, জেলখানা, বিলিয়ার্ড খেলার ঘর, আর দোকানপাট। একটি দোকানের নাম 'ইউরোপ শপ'। সেখানে পৌঁছে বিকেলবেলা ৮০ নং রেজিমেন্টের কয়েকজন সৈনিক মাঠে ফুটবল খেলতে শুরু করে দিয়েছিল। ওই খেলা দেখতে লোকজনের ভিড়ও জমে গিয়েছিল। শহরের কয়েকটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান (ইউরেশিয়ান) পরিবার তো গোরুর গাড়ি চেপে খেলা দেখতে এসেছিলেন। কেউ বা এসেছিলেন রিক্সায় বসে পায়ের উপর পা দিয়ে।

৩রা মার্চ বৃষ্টির মধ্যে ভোর চারটেয় তাঁবু গুটিয়ে বড় রাস্তায়, ঘুরপথে না গিয়ে, সোজা পথে রওয়ানা দিয়েছিল সেনাবাহিনী। তখনও কাটেনি অন্ধকার। গাঁয়ের রাস্তা কাঁচা। বৃষ্টি পড়ছিল। কাদায় ও গর্তে পড়ে নাস্তানাবুদ অনেক সৈনিক। লক্ষ্য বালগাছি নামে একটি জায়গা। সেখানেই হয়ত টাঙানো হবে সেদিনকার মত যাত্রাবিরতির তাঁবু। অবশেষে ওই মেঠোপথ থেকে বড় রাস্তায় উঠে এসে কিছুটা স্বস্তি পেলেন সেনারা। কিন্তু ততক্ষণে

অসুরাগড়ে এসে জানা গেল যে, ওই স্থানে সেবারই প্রথম সৈন্যবাহিনী এসেছে। যে অগ্রবর্তী দলকে আগে সেখানে পাঠানো হয়েছিল, গ্রামবাসীরা তাদের ধরে বেধরক পিটিয়ে দিয়েছিল। স্থানীয় সরকারি আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসনের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।

শুরু হয়েছিল প্রবল বর্ষণ। পায়ে হেঁটে চলাও দুষ্কর। বেলা দশটা নাগাদ সেনারা পৌঁছালেন ১৩ মাইল দূরবর্তী বালগাছিতে। সেখানে শিবির স্থাপন করা হল। মনে হল, ঘুরপথে বেশি পথ পেরোতে হয়েছিল তাদের। শিবিরের মাঠটি যেন জলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল ওই অকালবর্ষণে তাঁবু টাঙানোটাও হয়েছিল কষ্টকর। সঙ্গে অসুস্থ বেশ কয়েকজন সৈনিক। গোরুরগাড়িগুলি তখনও এসে পৌঁছায়নি। ওরা এসে পৌঁছালো বিকেলবেলায়। দিনের শেষে দেখা গেল ৬০ জন লোকের বিছানা ভেজা। ৮০ জন লোকের তাঁবু টাঙানো যায়নি। বৃষ্টির কারণে গাড়ির চাকাগুলো মাটিতে বসে যাচ্ছিল বলে ওই মন্থরগতি। কয়েকটি গাড়ির কোনও খবর নেই।

বাস্তব অসুবিধার কারণেই পরের দিনের যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছিল। সেদিন একজন গাড়োয়ান কলেরায় মারা যান। এ পর্যন্ত তিনজন লোকের কলেরায় মৃত্যু হল। সার্জেন রেনীর মাথায় সর্দি জমে বসেছে। তিনি ইচ্ছে করে বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি কমানোর চেষ্টা করছিলেন। পরদিন ৪ মার্চ তিনি মোটামুটি সুস্থই। তিনি এ নিদান সবাইকে মানতেও বললেন যে, সর্দি বসে গেলে মাথায় ঠান্ডা জল বেশি পরিমাণে ঢালা উচিত। আর ম্যালেরিয়া হলে বায়ু বদল করা অর্থাৎ স্থানান্তরে যাওয়া উচিত।

৫ মার্চ দুপুর ১১.৩০ টায় সেখানকার তাঁবু গুটিয়ে সেনাদল রওয়ানা দিল। ৩০ জন লোককে গাড়িগুলোর সঙ্গে আসতে বলা হল। ৪০টি গাড়ির গাড়োয়ান বলদ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে বা হারিয়ে গেছে। তাই মাঠের গোরুর পাল থেকে তাগড়া গোরু ধরে এনে নিজেদের কাজে লাগানো হল। সার্জেন রেনী সমস্যার জটিলতা ও চক্রান্তের আভাস পেয়ে গো-যানগুলির পেছনে হাঁটতে লাগলেন। বালাগাছিতে পড়ে থাকল কিছু সেনা, মালপত্র ও গো-যান।

এবার যেতে হবে মহানন্দা নদের তীরের দিংগ্রা ঘাটে। রাস্তার অবস্থা ভয়ঙ্করভাবে খারাপ। এক হাঁটু কাদা। গোরুর গাড়ির বলদগুলোরও নাজেহাল অবস্থা। বিকেল চারটের সময়ে বাহিনী যখন সেখানে পৌঁছাল, দেখা গেল, মালপত্র বোঝাই গাড়িগুলো তখনও বহু দূরে। তাঁবু টাঙাতে না পেরে খোলা আকাশের নিচে সবাই। সন্ধেবেলা কয়েকটা গাড়ি এলেও সমস্যা মিটল না। আশপাশের বাড়ি থেকে খড় এনে মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে খোলা আকাশের তলে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

ভোর রাতে খবর এল যে, বলদ সংগ্রহ করতে না পারায় বহু গাড়ি তখনও বালাগাছিয়াতেই আছে। বহু গাড়ি পথের মাঝখানে গর্তে পড়ে আটকে আছে। বিধ্বস্ত বলদগুলো শুয়ে পড়েছে কাদায়। গাড়োয়ানরা তাদের সম্পদ, অর্থ, পরিশ্রম— সব জলাঞ্জলি দিয়ে উদ্বিগ্ন ও কয়েকজন ‘চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা’ অবস্থায়। সৈন্যদের, গাড়োয়ানদের খাদ্য ও পানীয় নেই।

মহানন্দায় জোয়ার-ভাঁটা হয় না। শান্ত নদ। স্রোত কিন্তু তীব্র। মানুষখেকো কুমীর থাকায় স্নানের পক্ষেও নিরাপদ নয়। নদীতীরে বালুচরের পরিমাণ বেশি এবং নদীর ঢালও বেশি। বাঁ তীরের পারটা বেশ খাড়া। যে ঘাটে ফেরি নৌকায় পারাপার করা যায়, ওই ঘাটের নাম দিংগ্রা বা ডিংগ্রা ঘাট। দু’পারেই কিছু জনবসতি আছে এবং সাধারণ মানুষ কৃষিজীবী।

৬ মার্চ কয়েকটি গোরুর গাড়িকে ওই বিধ্বস্ত গাড়োয়ানদের দিয়ে পুনরায় ফেরৎ পাঠানো হল

বালগাছিয়াতে। ওরা বাকি গাড়ি বা মালপত্রগুলি নিয়ে আসবে। কেউ যেতে রাজি ছিল না। সেদিন রোদ থাকায় বিছানাপত্র ও কাপড়-চোপড় রোদে শুকানো হল। বিকেলের দিকে চিকিৎসার সরঞ্জাম নিয়ে দু'কোম্পানি সেনা ঘাট পেরিয়ে ওপারে তাঁবু টাঙালো। বাকিরা থেকে গেল পশ্চিম তটেই। নৌকার উপরে তিনটি গোরুর গাড়ি একবারে পার করা যায়। আর একটা দিন ওই গাড়িগুলোর ফেরার আশায় কাটানো হল। অবশ্য সন্ধ্যায় সব গাড়িই এসে গিয়েছিল।

৮ মার্চ এবার সেনাদল অসুরাগড়ের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছিল। প্রথমে যাত্রা শুরুর মুহূর্তে একটা সমস্যা সৃষ্টি হল। পূর্ণিয়া ও দার্জিলিং-এ পরিবহণকারী ইউরোপীয় কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সংস্থা নালিশ জানাল যে, রাস্তা থেকে ধরে আনা তাদের সাতটি বলদ তাদের কোম্পানির; যদি ওই বলদগুলোকে ছেড়ে না দেওয়া হয়, তাহলে তারা ক্ষতিপূরণের জন্য অভিযোগ জানাবে। কারণ, সকলেরই একই কণ্ঠস্বর— আমরা সর্বস্বান্ত হলাম।

সেখান থেকে অসুরাগড়ের দূরত্ব মাত্র সাত মাইল। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল। সার্জেন রেনী বিষয়টি এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। কারণ, তিনি জানেন যে, ওই গাড়িগুলো কোনও সংস্থা সরবরাহ করেনি, করেছিল বাংলার সরকার। কষ্টকর পরিস্থিতি হলেও গাড়োয়ানদের ঠকানোর কোনও অভিপ্রায় তাদের নেই। পারিশ্রমিকও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্ণিয়ার জেলাশাসক মি. বীমসকেও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছিলেন সার্জেন রেনী। জটিল পরিস্থিতির সুরাহা হয় আপোষরফার মাধ্যমে। স্থানীয় পরিবহণ সংস্থার কিছু গাড়ি নেওয়া হয়।

অসুরাগড়ে এসে জানা গেল যে, ওই স্থানে সেবারই প্রথম সৈন্যবাহিনী এসেছে। যে অগ্রবর্তী দলকে আগে সেখানে পাঠানো হয়েছিল, গ্রামবাসীরা তাদের ধরে বেধরক পিটিয়ে দিয়েছিল। স্থানীয় সরকারি আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসনের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। ওই স্থান থেকে কিছু বলদ ও কিছু গাড়ি সংগ্রহ করে ডিংগ্রা ঘাট থেকে মালপত্র নিয়ে আসার জন্য গ্রামবাসীদের সাহায্য চাওয়া হল। কিন্তু পুলিশ যখন গ্রামে ঘুরে ঘুরে ওই কাজ শুরু করে, তখন গ্রামবাসীরা ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশকে টাকা খাওয়ানো হয়েছিল বলে, ওরা একটু বাড়াবাড়িই শুরু করেছিল। ফলে, গ্রামের সবাই একত্রিত হয়ে, গ্রামের ইজ্জত রক্ষায় পুলিশ ও সেনাদের ধাক্কাধাক্কি শুরু করেছিল।

অসুরাগড় এককালে নেপালের দখলে ছিল। তখন সেখানে গড় অর্থাৎ নেপালি সেনা ছাউনি গড়ে তোলা হয়েছিল। কাদামাটি ও ইটের সাহায্যে ছাউনির চারপাশে গড়ের কিছু ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। ওই গড়ের পাশেই ব্রিটিশ সেনার ছাউনি করা হয়েছিল। অসুরাগড়ের প্রধান ফসল ধান ও নীল।

কলকাতা থেকে কমান্ডার-ইন-চিফ এ সময়ে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। সেটি সেদিন অসুরাগড়ে এসে পৌঁছেছিল। ওই টেলিগ্রামে বলা হয়েছিল যে, ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এরপর এমন স্থানে শিবির স্থাপন করবে, যেখানে সূর্যাস্তের পূর্বে সকলে পৌঁছাতে পারে, ওই সংবাদটি ৯ মার্চ সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর ওই জন্যে সেদিনই রাত্রি দুটোর সময়ে নতুন পথে যাত্রা শুরু করে সেনাবাহিনী। সকালবেলা দেখা গেল যে, বাহিনী সম্পূর্ণ সমতলে হালকা অরণ্যবেষ্টিত অঞ্চল দিয়ে চলছে। সকাল সাড়ে সাতটার সময়ে সেনাবাহিনী এসে পৌঁছাল কিষাণগঞ্জে। রাজা কিষেণ সিং-য়ের নামেই স্থান নাম।

সেখানকার মাটি ভেজা, কিন্তু দিনের রৌদ্রতাপ প্রখর। রাতে কুয়াশা পড়েছিল সেদিন। এদিকে টেলিগ্রামের নির্দেশবলে মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে লোকজনদের চলতে বলায় একটা অসন্তোষ দানা বেঁধেছে অনেকের মনে। তিনি মনে করেন, যদি সন্ধ্যার আগে তাঁবু গুটিয়ে রাতভর হেঁটে চলা যায়, তাহলে দিনের বেলা ঘুমিয়ে কাটানো যায়।

এবার সৈন্যদল এসে পৌঁছাল গাজোল-এ। কিষাণগঞ্জ থেকে গাজোলের দূরত্ব ১০ মাইল। যে তিনটি বাঘের উপদ্রবের কথা শোনা গিয়েছিল, তারাও কাছাকাছি ছিল। মাত্র দু'রাত আগে দুজন স্থানীয় লোককে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেই দুটি বাঘ।

গাড়ি কিছু দেরি করে পৌঁছালেও সমস্যা হবে না। সারাদিন সময় পেলে ঘুড়ি ওড়ানো, কাপড় কাচা ইত্যাদি কাজকর্মও সেরে ফেলা যাবে। কিষেণগঞ্জে সেটাই দেখা গেল। সবাই খুশি মনে বিকেলবেলা কুচকাওয়াজে যোগদান করল। তাছাড়া দিনের বেলা প্রচণ্ড রৌদ্রতলে হাঁটাও অস্বস্তিকর তো বটেই, শরীরও খারাপ হয়। সর্দিগর্মি ও কলেরা হতে পারে। চিনে ও জাপানে গরমকাল কাটিয়ে এ উপলব্ধি হয়েছিল সার্জেন রেনীর। তাঁর মতে সূর্যতাপ মাথার চাইতেও পিঠে বেশি বিপত্তি ঘটায়। সেনাদের 'সান স্ট্রোক' থেকে বাঁচতে মাথায় টুপি ও পিঠ ভালভাবে ঢেকে পথ চলা উচিত। পিঠ ঢাকার কাপড় কমপক্ষে ১৮ ইঞ্চি লম্বা ও ৩ ইঞ্চি চওড়া হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া গলা ও বুক ঢেকেও পথ চলা দরকার। পেটে অর্থাৎ কলেরা সৃষ্টিকারী অঞ্চলে ফানেলের কাপড় জড়ানো ভাল। যারা দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে এবং রোদে বেশি ঘোরাঘুরি করে, তাদের সর্দিগর্মি ও সানস্ট্রোক হবার সম্ভাবনা বেশি হয়।

কিষেণগঞ্জের রাজবাড়ির কাছেই শিবির স্থাপন করা হয়েছিল। সেনাবাহিনীর কয়েকজন আধিকারিক রাজার সঙ্গে দেখাও করেছিলেন এবং হাতি ধার চেয়েছিলেন। কারণ, তাঁরা শুনেছিলেন যে, পরবর্তী তাঁবু গাজোল-এ যাওয়ার পথে দু' তিনটি বাঘ মাঝে মাঝেই উপদ্রব করে।

রাজার হাতিগুলি ওই সময়ে রাজবাড়িতে ছিল না। কিন্তু তিনি পরের দিন একটি হাতি পাঠাতে রাজি হয়েছিলেন। দেখা করে ফেরার সময়ে রাজামশাই সাহেবদের প্রচুর ফল উপহার দিয়েছিলেন। ওই ফলের মধ্যে ছিল বিচি ছাড়া কিসমিস, আখরোট, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি।

কিষেণগঞ্জ একটি দেশীয় শহর। এখানে একটি ডাকবাংলো আছে। ওই ডাকবাংলোয় একটি নোটিশবোর্ডে স্থানীয় প্রশাসন বিজ্ঞাপিত করেছেন যে, কোনও অতিথি যেন নির্দিষ্ট ভাড়া, প্রাপ্য মজুরী না দিয়ে ওই স্থান পরিত্যাগ না করেন।

১০ মার্চ রাত দুটোর সময়ে তাঁবু গুটিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল। আকাশ ঝলমলে থাকায় কারাগোলার পর আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল সুস্পষ্ট হিমালয়রাজি। এবার সৈন্যদল এসে পৌঁছাল গাজোল-এ। কিষাণগঞ্জ থেকে গাজোলের দূরত্ব ১০ মাইল। যে তিনটি বাঘের উপদ্রবের কথা শোনা গিয়েছিল, তারাও কাছাকাছি ছিল। মাত্র দু'রাত আগে দুজন স্থানীয় লোককে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেই দুটি বাঘ।

কিষাণগঞ্জের রাজা যে হাতিটি পাঠিয়েছিলেন, ক্যাপ্টেন টাকার ওই হাতিটি নিয়ে জঙ্গলে বাঘ খুঁজতে গেলেও জ্বর আসায় তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। হাতিটি ছিল এতই পোষা যে, নতুন ও অচেনা মাহুতের নির্দেশমত সে সব কাজ করেছিল। এরূপ বনপথে কত মাহুতই তো কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতেন। হাতিকে ধরতে বা বশ মানাতে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি হতে হত তাদের।

পরের দিন ক্যাম্প গুটিয়ে আবার পথ চলা। এবার যেতে হবে ইলুয়াবাড়ি (ইলুয়া নামক কাশ থেকে ইলুয়াবাড়ি নাম)। আলুয়াবাড়ি বা ইসলমপুর পরবর্তীকালের নাম। এই প্রথম জঙ্গল থেকে দূরে খোলা স্থানে তাঁবু টাঙানো হল। গঙ্গার পরে এই প্রথম ভাগ্য বিড়ম্বিত দরিদ্র জনবসতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অবস্থা ভাল না হলেও অবশ্য লোকজনদের চেহারা ছবি ভালই, স্বাস্থ্যবান।

শিবিরে একজন সৈনিক 'জঙ্গল ফিভার'-এ অনেকটাই অর্ধচেতন অবস্থায়। সার্জেন রেনী

সৈনিকটির চিকিৎসা করে, তাকে নজরে রাখবার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করেছিলেন। প্রহরীটিকে বলা হয়েছিল, আশপাশের অনেক বাড়িতে বেড়া না দেওয়া পাতকুয়ো আছে। রাতে যেন রোগীটি ছুটে ওদিকে না যায়। কুয়োতে পরে যেতে পারে। সাবধান করা সত্ত্বেও ওই রোগীটি একটি পাল্কি আসতে দেখেছিল ও নিশির ডাকে সেদিকে ছুটে গিয়েছিল। প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, পাল্কির বেহারা কোন দিকে গিয়েছে? তাঁবুর পাহারাদারদের কথা শুনে রোগীটি এগিয়ে যায় এবং এক কুয়োতে পড়ে যায়। ব্যাপারটি জানা গেলে এবং কুয়োটি অগভীর হওয়ায় শেষপর্যন্ত রোগীটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল।

১২ মার্চ সেনাদল এসে পৌঁছায় চোপরায়। এখানে ডাহুক নদী। কাঠের সেতু দিয়ে নদী পার হয়ে তাঁবু টাঙানো হয়েছিল। নদীর স্রোত বেশি ছিল না। সাদা বালুচরে নদীর তীর ছিল পরিচ্ছন্ন। সৈন্যরা ওই নদীতে মনের আনন্দে স্নান করেছিলেন। পূর্ণিয়া ছাড়ার পর এই প্রথম সেনাদের মনে আর আনন্দ বাঁধ মানে না। ক্লান্তিমুক্ত সকলেই। তবে, এখানেও ঘন জঙ্গল ছিল অদূরেই।

এরপরের শিবির যেহেতু তেঁতুলিয়াতে এবং সেখানে পাঁচ কোম্পানি সেনা বিচ্ছিন্ন হয়ে ডুয়ার্সে যাবে, তাই সব সেনাই তাদের বন্দুকগুলি পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টিতে ভিজে ওইগুলো ঠিক কী অবস্থায় আছে, তা তো সবারই জানার দরকার ছিল। ভেজা ও প্রচণ্ড তাপে মরচেও জমেছে সেগুলোতে। জলনিরোধক খাপে সেগুলো থাকলে ভাল হত। এনফিল্ড রাইফেলগুলো তৈরি হয়েছে উত্তর-চিনে এবং কভারগুলো তৈরি হয়েছে সিন্ধে। অস্ত্রশস্ত্রের বাক্সগুলো ভারতের। পরীক্ষা করে সবাই সন্তুষ্ট হলেও, ইংল্যান্ড থেকে অস্ত্র এলে যে ভাল হত, সেটা অনেকেরই অভিমত।

তেঁতুলিয়া:

সার্জেন রেনী সদলবলে তেঁতুলিয়াতে এসে পৌঁছেছিলেন ১৩ মার্চ। পূর্ণিয়া জেলার সীমানা অতিক্রম করে রংপুর জেলায় এসে পৌঁছালেন তাঁরা। ওই রাস্তাটি শক্ত হলেও গাড়ির চাকার আঘাতে দু'পাশে গভীর গর্ত এবং মাঝখান দিয়ে হাঁটা পথ। রাস্তার পাশে মাঠের উপর দিয়েও হাঁটা পথ আশপাশেই চলেছে। দু' মাইল অতিক্রম করতে না করতেই একটা টেলিগ্রাফ অফিস দেখা গেল। সেখান থেকে ডানদিকে ঘুরে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে দিনাজপুরের দিকে। সোজা রাস্তাটি চলে গিয়েছে কোচবিহারে। এখানে দুটো টেলিগ্রাম পাওয়া গেল। একটি আগের পাঠানো টেলিগ্রামেরই পুনর্নির্দেশ এবং দ্বিতীয়টি কলেরা রোগাক্রান্ত রোগীদের বিষয়ে খোঁজখবর।

এখানে লেঃ ও কনোরের নেতৃত্বে ৪০ জনের একটি সৈন্যদল ময়নাগুড়ি যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। সম সংখ্যক অসুস্থ ও দুর্বল সেনাদের দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাদের উপর।

তেঁতুলিয়ার মেলা:

তেঁতুলিয়ার জনবসতি আহামরি নয়। কুড়ে ঘর, স্থানীয় লোকজন— কোনওটাই আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু এখানকার সবচেয়ে বড় হল তেঁতুলিয়ার মেলা। সার্জেন রেনী ওই অপূর্ব মেলাটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এ মেলা বছরে একবারই বসে। বাংলার নিম্নাঞ্চল থেকে মেলার জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য নিয়ে আসা হয়। যে সময়ে সার্জেন রেনী সেখানে গিয়েছিলেন, সেই চৈত্রমাসেই ওই মেলা বসেছিল। সুতির কাপড় দিয়ে ছাউনি করা ছোট ছোট দোকানে স্থানটি তৈরি হয়েছে অস্থায়ী শহরের রূপ। রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য দোকান। ভেতরে আড়াআড়ি ভাবে রাস্তাগুলি পরস্পরকে অতিক্রম করেছে। রাস্তার দু'ধারের মাঠেরও একই চিত্র। দেশিয় ও ইউরোপীয় হরেক রকমের দ্রব্যসম্ভারে সজ্জিত হয়েছে দোকানগুলি।

এ মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বিভিন্ন ধরনের পশু কেনাবেচা। দ্বিতীয় আকর্ষণ হল কলকাতার বাইরে সবচেয়ে বড় চিনা বাজার। সাহেব, দেশীয় সাহেব, জমিদার থেকে সাধারণ প্রজা সবার

এখানকার চিনা বাজারে ভিড় কলকাতার মতই লেগে থাকত। ক্রেতারা যাতে তাদের পছন্দমত জিনিস না কিনেই চলে না যান, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর থাকত। অনেক সময়ে বিক্রেতারা খুব কম দামেও তাদের সম্ভার গছিয়ে দিতেন। যে দাম চাওয়া হয়েছিল, অনেক সময়ে দেখা যায়, ওই দামের চেয়ে অনেক কম দামে জিনিস বিক্রি হয়ে যেত।

প্রয়োজন মেটায় এ মেলা।

এটা ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, কত বিজ্ঞ লোকজনের চিন্তাধারায় এ স্থানটি নির্বাচিত করা হয়েছিল। যদিও এ মেলাটি স্থাপন করেছিলেন ডা. ক্যাম্বেল। কিন্তু, বহু দেশীয় মানুষ এ মেলা প্রতিষ্ঠায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরাও উপস্থিত থাকতেন মেলার সময়ে। ডা. ক্যাম্বেল ছিলেন দার্জিলিং-এর সুপারিনটেনডেন্ট এবং ব্রিটিশ সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দেখভালের অধিকর্তা। তিনি কেনাবেচার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এ স্থানটিকে বেছে নিয়েছিলেন। সার্জেন রেনী যখন মেলায় গিয়েছিলেন, ওই সময়ে ভুটান সীমান্তে গোলমাল (ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধ) চলছিল বলে মেলায় ধনাঢ্য লোকের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল কম।

সেনাবাহিনীর আধিকারিকেরা ওই মেলা থেকে বহু জিনিসপত্র কিনেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, বিক্রেতারা তাদের পণ্যসম্ভার কেনার জন্য জোরজুলুম বা পীড়াপীড়ি করেননি। এমনকি স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে ব্যবসাদারের যেমন দরদাম নিয়ে ঝুলোঝুলি করতেন, তেমন কিছু করেননি।

এখানকার চিনা বাজারে ভিড় কলকাতার মতই লেগে থাকত। ক্রেতারা যাতে তাদের পছন্দমত জিনিস না কিনেই চলে না যান, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর থাকত। অনেক সময়ে বিক্রেতারা খুব কম দামেও তাদের সম্ভার গছিয়ে দিতেন। যে দাম চাওয়া হয়েছিল, অনেক সময়ে দেখা যায়, ওই দামের চেয়ে অনেক কম দামে জিনিস বিক্রি হয়ে যেত।

সার্জেন রেনী তেঁতুলিয়ায় দু'দিন ছিলেন। ওই সময়ের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র, কাপড়-চোপড়, বাক্স-প্যাটরা যেমন সবকিছু পরীক্ষা করা হয়েছিল, তেমনই সেনাদের শরীর স্বাস্থ্য বিষয়েও অনুসন্ধান করা হয়েছিল।

সিনিয়ার অ্যাসিস্টেন্ট সার্জেন ইঙ্কসনকে চিকিৎসা বিভাগের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। সেনা আধিকারিকেরা তেঁতুলিয়া ডাকঘরে স্বদেশে স্বজনদের কাছে চিঠিপত্র পাঠিয়েছিলেন। ডাকবাংলোর কাছে ওই ডাকঘরটি তখন ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। একটি মাত্র সরু শেকল দিয়ে দরজায় তালা ঝুলিয়ে রাখা হত। অন্যান্য সেনারাও চিঠিপত্র ওই গুরুত্বহীন ডাকবাক্সে ফেলে অন্তরে একটা স্বস্তি অনুভব করতে পেরেছিলেন।

সন্ন্যাসীকাটা:

১৫ মার্চ ভোর তিনটের সময়ে সৈন্যদলের যে অংশ হেডকোয়ার্টারে যাবে, তাদের বিচ্ছিন্ন করা হল। ওই সৈন্যরা যাবেন সন্ন্যাসীকাটায় এবং তারপর দার্জিলিঙের বাকি সৈন্যরা যাবেন জলপাইগুড়ি হয়ে তিস্তা নদী পেরিয়ে ময়নাগুড়িতে।

সার্জেন রেনী প্রথম বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী সন্ন্যাসীকাটায় পৌঁছাল বিকেল পাঁচটায়। আর এক ঘণ্টা পরে সন্ধ্যা নামবে। প্রচণ্ড কুয়াশা, বৃষ্টি; মালবাহী গাড়িগুলোর কোনও খবর নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুয়াশায় ভিজতে লাগল সবাই। সেনা ছাউনির জন্য নির্ধারিত মাঠও জলে ভরা।

রাতে ঘুমের প্রচণ্ড ব্যাঘাত ঘটেছিল। বাহিনীর তাঁবুর কাছাকাছি শেয়ালের একটা বড় দল খুব চিৎকার ও উপদ্রব করছিল। পরদিন ভোর তিনটে নাগাদ সার্জেন রেনী শিলিগুড়ি অভিমুখে যাত্রা করলেন। রাস্তা প্রচণ্ড খারাপ। ঝোপঝাড়ে ভর্তি, অনেকটা অস্ট্রেলিয়ার ঝোপের মত ঘন।

(ক্রমশ)

গান্ধী না চাইলেও দেশভাগ হল কোন পরিস্থিতিতে?

সুমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবরাম চক্রবর্তীর একটা গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র গোবিন্দবাবু এক আপিসের উচ্চপদস্থ করণিক, যাঁর আসল নামটা হয়ত অন্য। গোবিন্দবাবুর জীবনে বিশেষ কৃতিত্ব এই যে— গোখলের মত সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কলকাতায় থাকাকালীন, গোবিন্দবাবু তাঁকে বসবাসের চমৎকার বাড়িভাড়ার সন্ধান দিয়েছিলেন। এই ঘটনার পরে যখনই গোখলের প্রদেশ থেকে কলকাতায় কাজে অথবা কলকাতা দর্শন করতে কেউ আসতেন, সেই ব্যক্তিকে কলকাতা দেখানোর দায়িত্ব পড়ত গোবিন্দবাবুর ওপর।

একবার এরকমই একজন দর্শনার্থীকে কলকাতায় স্বাগত জানাতে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে গোবিন্দবাবু বেজায় আশাহত হলেন। আগন্তুক গোখলের অন্য পরিচিতদের মত বেশ ভব্যিযুক্ত মানুষ মোটেই নন। এসেছেন ট্রেনের থার্ড ক্লাসে চেপে, পায়ে চটি নেই, গায়ে সাধারণ চাদর তাও আধময়লা। পরদিন, কলকাতা ঘোরাতে নিয়ে গিয়ে গোবিন্দ দেখলেন, আগন্তুক হিন্দিতে কথা বলেন, ইংরেজিতে কিছু বলেন না, বলার থেকে অন্যের কথা শোনেন বেশি মন দিয়ে।

হেঁটে-হেঁটে কলকাতায় ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ট্রামে চেপে অতিথিকে নিয়ে যাওয়ার সময় গোবিন্দ মুখোমুখি হলেন এক হোঁৎকা মত গোরা সাহেবের অভব্যতার। উল্টোদিকের সিটে বসে সাহেব পা-টা সটান ছড়িয়ে দিল গোবিন্দ আর আগন্তুকের মাঝখানে। ফিরিঙ্গির এই আচরণের প্রতিবাদ করার ইচ্ছে হলেও সাহসে কুলোচ্ছিল না গোবিন্দর। এই সময় আগন্তুক গোবিন্দকে অবাক করে দিয়ে পা তুলে দিল ফিরিঙ্গির গায়ের পাশে। উত্তেজিত ফিরিঙ্গি বাদানুবাদ করে আগন্তুককে আক্রমণে উদ্যত হলে আগন্তুক শুধু মিটিমিটি হাসে, সাহেবের ভয় দেখানোকে যেন পাত্তাই দেয় না। এরপরে ট্রামের সমবেত জনতা সাহেবকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, শীর্ণদেহ, আপাত নিস্প্রভ আগন্তুকই কিন্তু জনতাকে প্রতিহত করে, সাহেবকে প্রতি আক্রমণ করা, হিংসার আশ্রয় নেওয়া থেকে সবাইকে বিরত রাখে। সেইসঙ্গে গোবিন্দ আরও চমকে যায় যখন দেখে সাহেবের সঙ্গে কথোপকথনে আগন্তুক চমৎকার ইংরেজিতে বাক্য বিনিময় করছে। এখন পাঠককে বলার প্রয়োজন নেই যে সেই আগন্তুকের নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা এই গল্পের বা ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যাসত্য বিচারের সুযোগ আজ আর নেই, প্রয়োজনীয়তাও নেই বলে মনে হয়। কালজয়ী স্রষ্টা শিবরাম খানিকটা বিদ্রুপের সুরেই সাধারণ বাঙালির গান্ধী সম্পর্কে মনোভাব ব্যক্ত বা বিশ্লেষণ বা করেছেন। মনে রাখতে

হবে, ইংরেজ ও ইংরেজিয়ানা ভারতে সবচেয়ে আগে অনুপ্রবেশ করেছিল বাঙালিদের মধ্যেই। কংগ্রেসের রাজনীতিতে প্রাক গান্ধী যুগের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন বা প্রতিবাদে যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁদের জীবনযাত্রার মধ্যে ছত্রে-ছত্রে ছিল ইংরেজিয়ানা। বাঙালির কাছে সেই যুগে সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও চৈতন্যই ছিল গ্রহণযোগ্য, হয়ত আজও তাই আছে। এই অবস্থায় গান্ধীর মত ছকভাঙ্গা নেতৃত্ব, যিনি পরবর্তীকালে আজীবন নিজের জীবনচর্যায় ভারতীয়ত্বকে ধারণ করতে চাইবেন— তাঁকে আপন করে নিতে প্রথম থেকেই সমস্যা ছিল বিরাট সংখ্যক বাঙালির মধ্যে। সেইসঙ্গে বাংলার মানুষের সহজাত বিপ্লবী প্রবণতার কাছে, অহিংসার ধারণাটাও ছিল যেন ভিন্ন গ্রহ থেকে আমদানি করা।

মনে রাখা দরকার, প্রশাসনিক অজুহাতে বা বলা ভাল বিরাট আয়তনের প্রদেশকে সুশাসনের অজুহাতে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার বা বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের (১৯০৫) কারণ কিন্তু শুধু প্রশাসনিক ছিল না। এই বাংলায় তার আগে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিত হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে চাইছে বিপ্লবী বাঙালি জাতিসত্তা। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে বাঙালি বিপ্লবীকূল এটা আন্দাজ করতে পেরেই বাংলাকে পূর্ব ও পশ্চিমে ভাগের ভাবনা মাথায় আসে ইংরেজদের।

ব্যাপক গণ-আন্দোলনের ফলে সে যাত্রায় বঙ্গভঙ্গ রোধ করা যায় ঠিকই কিন্তু সুকৌশলে ইংরেজরা যেটা করতে সক্ষম হয় সেটা হল বাঙালি বিপ্লবী জাতিসত্তাকে হিন্দু-মুসলমানে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতে। মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণাকে বদ্ধমূল করতে যে, পূর্ববঙ্গ তৈরি হলে সেখানে তারা সংখ্যায় বেশি হবে এবং হিন্দু আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে পারবে। রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট ব্যক্তিত্বরা সক্রিয়ভাবে বঙ্গভঙ্গরোধে আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় ও জনমত গঠনে সমর্থ হওয়ায় সেবারের মতো আটকে দিলেও আটকানো যায় নি মুসলিম জাতিসত্তার ক্ষমতালাভের আকাঙ্খার জন্ম নেওয়া, যে আকাঙ্খায় পরবর্তী দশকগুলোতে টালমাটাল হবে দেশভাগের রাজনীতি, দেশ খণ্ডিত হওয়ার আগে এবং হয়ত বা পরেও। যে সময় বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব আসছে, সেই সময় কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর ভূমিকা তৈরি হয় নি। এমনকী দেশের রাজনীতিতে তখনও তাঁর প্রবেশই হয় নি। অথচ আজও আমরা অদ্ভুতভাবে দেশভাগের জন্য তাকেই দায়ী করে থাকি। কিন্তু প্রকৃত সত্য অন্য!

রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট ব্যক্তিত্বরা সক্রিয়ভাবে বঙ্গভঙ্গরোধে আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় ও জনমত গঠনে সমর্থ হওয়ায় সেবারের মতো আটকে দিলেও আটকানো যায় নি মুসলিম জাতিসত্তার ক্ষমতালাভের আকাঙ্খার জন্ম নেওয়া, যে আকাঙ্খায় পরবর্তী দশকগুলোতে টালমাটাল হবে দেশভাগের রাজনীতি, দেশ খণ্ডিত হওয়ার আগে এবং হয়ত বা পরেও। যে সময় বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব আসছে, সেই সময় কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর ভূমিকা তৈরি হয় নি।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গর প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার পরের বছরই ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় -'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৫ তে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কংগ্রেস, যা কিনা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ব্রিটিশ বিরোধিতার এবং বিভিন্ন দাবীতে দেশীয় নেতৃবৃন্দের আবেদন-নিবেদনের সংগঠন বলে পরিচিত ছিল, সেই সংগঠনের সঙ্গে, তার দাবীর ও নেতৃত্বের সঙ্গে যে মুসলিম সমাজ একাত্ম হতে পারেন নি, মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা সেই ধারণারই বার্তা বহন করে। এই বিযুক্তি, এই দূরত্বই চালিত করে পরবর্তী

দশকগুলোয় উপমহাদেশের মুসলিম তথা ভারতীয় রাজনীতির গতিপথকে, সেখানে গান্ধী একজন মুখ্য ঐতিহাসিক চরিত্র মাত্র, ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক নন।

পরবর্তী কয়েক দশকে অবশ্য ভারতবাসীর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সার্বিক নেতৃত্ব ছিল গান্ধীরই হাতে এবং মুসলিম লীগের সার্বিক কোনও বিস্তার বা বিকাশ ঘটে নি,সদস্য সংখ্যাও ছিল সীমিত। জাতীয়তাবাদী সংবাদ মাধ্যম ও ব্যক্তিদের মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল, মুসলিম লীগ অচিরেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। ১৯২০র পরে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন হিন্দু-মুসলমানকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসায়, অনেকেরই ধারণা হয়েছিল লীগ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে, সেই দলে

মুসলিম ব্যবসায়ীদের একটা অংশ সমর্থন জুগিয়েছেন মুসলিম লীগকে। কারণটাও খুব পরিস্কার, হিন্দু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাধারণভাবে টক্কর দেওয়া ছিল মুসলমান ব্যবসায়ীদের পক্ষে অসম্ভব, যদি না নিজেদের আলাদা রাষ্ট্র তৈরি করা যায়।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন। ছবিটা হঠাৎ করে বদলে গেল বিলেত থেকে জিন্নাহ এসে মুসলিম লীগের সভাপতি হওয়ার পরে।

গরীব মুসলিম কৃষক বা সাধারণ শ্রমিকের দুরবস্থার সঙ্গে হিন্দু কৃষক-শ্রমিকের দুরবস্থার কোনও ফারাক না থাকলেও ইংরেজ দেশ থেকে চলে যাওয়ার পরে হিন্দু প্রভুর পদানত হয়ে মুসলমানদের থাকতে হবে এমন ধারণা তাদের মধ্যে সফলভাবে সংক্রমিত করতে পেরেছিলেন মুসলিম নেতৃত্ব। মুসলিম ব্যবসায়ীদের একটা অংশ সমর্থন জুগিয়েছেন মুসলিম লীগকে। কারণটাও খুব পরিষ্কার, হিন্দু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সাধারণভাবে টক্কর দেওয়া ছিল মুসলমান ব্যবসায়ীদের পক্ষে অসম্ভব, যদি না নিজেদের আলাদা রাষ্ট্র তৈরি করা যায়। পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পরে, অনেক ব্যবসায়ী নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াতে সক্ষমও হয়েছিলেন। উল্টোদিকে বিড়লা, গোয়েঙ্কা বা অন্যান্য শিল্পপতিরা ছিলেন কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক। তাই জিন্নাহ মুসলিম লীগের দায়িত্ব নিয়েই শত্রু হিসেবে আক্রমণের টার্গেট করলেন কংগ্রেসকে। ফলও পেলেন হাতে-নাতে। কয়েক বছরের মধ্যে মুসলিম লীগের সমর্থক ও সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকল অবিশ্বাস্য গতিতে,আজকের দিনের করোনা ভাইরাসের গোষ্ঠী সংক্রমণের থেকেও অনেক দ্রুত হারে।

আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তিনের দশক থেকে ব্যবসায়ীদের একটা অংশ হিন্দু মহাসভা ও আরএসএসের পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করেন। কংগ্রেসের মধ্যে নেহেরু-সুভাষদের মত সমাজবাদী চিন্তাভাবনায় বিশ্বাসীরা নেতৃত্বে সামনে আসার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবসায়ীদের একটা অংশ নিজেদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নিয়ে সংশয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারা তাই নিজেদের বাণিজ্য ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে একটা অন্য রাজনৈতিক ভাবধারাকে অর্থাৎ কংগ্রেসের ভেতরের রক্ষণশীল অংশকে এবং বাইরের হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের শ্রেয় মনে করছিল। সমাজে এত পরস্পর বিরোধী স্বার্থসংঘাত, রাজনীতি-অর্থনীতির দোলাচলের কেন্দ্রে থেকে, হিংসার পথকে পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করার মতো কঠিন কাজ করছিলেন মোহনদাস গান্ধী। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ের পাশাপাশি দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখতে হলে প্রয়োজন ছিল সাম্প্রদায়িক ঐক্যের, যেখানে ক্রমাগত ফাটল দেখা দিতে শুরু করে এবং জিন্নাহর মত নেতার মুসলিম লীগে আবির্ভাব ও ১৯৩৭-এর নির্বাচন থেকে লীগের উত্তরোত্তর সাফল্য হিন্দু-মুসলিম বিভেদের বিষবৃক্ষে ক্রমাগত পুষ্টিসাধন করতে শুরু করে। ১৯৪০-এর পরে, বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয়, অর্থনৈতিক মন্দার মুখোমুখি হওয়া এবং কংগ্রেস

নেতৃত্বের বয়োবৃদ্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি মুসলীম লীগ রাজনীতির বিচ্ছিন্নতাবাদকে ঠেকিয়ে রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

এই সময়ের পরবর্তী কালে ভারতের মুসলমান সমাজে দু'ধরণের প্রবণতা দেখা যায়। একদল যারা পাকিস্তানপন্থী অর্থাৎ লীগ রাজনীতিতে বিশ্বাসী, আর অপরদল ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মুসলিম, যারা দেশভাগের দাবী মানতে চাইছিলেন না। ভারতীয় উপমহাদেশে এই দুই ঘরানার মুসলিম রাজনৈতিক বিশ্বাস এখনও বর্তমান। দু'টো লেখা দেশভাগের সময়কার গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য দলিল বলে মনে করে চর্চা হতে পারে। এক, মৌলানা আজাদের লেখা আত্মজীবনী, যা থেকে সেই সময়ে কংগ্রেসের নেতারা কীভাবে দেশভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং গান্ধীকেও তা মেনে নিতে হয়েছিল সেই ঘটনার একটা চিত্র ফুটে ওঠে এবং অপরদিকে স্বাধীন বাংলাদেশের জনক, শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী। মুজিব সেই সময় ছিলেন ছাত্রনেতা, কলকাতায় পড়াশোনা করছেন, লীগ সমর্থক ও লীগের নেতা সোহরাওয়ার্দীর অনুগামী। মুজিবুরের আত্মজীবনীতে যে ছবিটা উঠে আসছে তা থেকে বোঝা যায় কলকাতাকে বাদ দিয়ে বাংলাকে খণ্ডিত করে পূর্ব পাকিস্তান হবে এটা তাঁদের কল্পনাতেও আসে নি। কলকাতাই হবে পাকিস্তানের রাজধানী এমনটা তাঁরা মনে করতেন, এবং পূর্ব পাকিস্তান হবে অখণ্ড বাংলাদেশকে নিয়ে, খণ্ডিত বাংলায় নয়। সেইসঙ্গে মুজিবুর আরও উল্লেখ করছেন যে সোহরাওয়ার্দীর মত জনপ্রিয় এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতাকে ভয় পেতে শুরু করছিলেব স্বয়ং জিন্নাহও। ভবিষ্যতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবীদার হয়ে উঠতে পারেন সোহরাওয়ার্দী আর সেই দাবী জোরালো হবে যদি কলকাতা হয় পাকিস্তানের রাজধানী। কাজেই বাংলা ভাগ করাটা লীগের দিল্লির নেতাদের কাছেও জরুরি ছিল। দিল্লিতে বসে, ইংরেজদের সঙ্গে বৈঠক করে বাংলা ভাগের পরিকল্পনা লীগের দিল্লির নেতারা সবটাই জানতেন,অথচ বাংলার নেতাদের রেখেছিলেন অন্ধকারে।

কংগ্রেসের ভেতরেও গান্ধীর নেতৃত্বের মুঠো অনিবার্যভাবেই আলগা হতে শুরু করেছিল। একসময় তিনি বলেছিলেন দেশভাগের আগে তাঁকে কেটে টুকরো করতে হবে, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি সেই প্রস্তাবে নীরব থাকলেন সম্ভবত এই কারণে যে, কংগ্রেসের নেতৃবর্গ স্বাধীনতার আগে লীগের সঙ্গে যৌথভাবে সরকার চালানোর সমস্যা ও তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলো তাঁকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে সর্দার প্যাটেলের অভিজ্ঞতা স্মরণ করার মত। অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর ছিল প্যাটেল-এর অধীনে, কিন্তু অর্থদপ্তর ছিল লীগের হাতে। স্বরাষ্ট্র দফতরের সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচি শেষপর্যন্ত অর্থের অনুমোদনের অভাবে আটকে যাচ্ছিল। কংগ্রেস বুঝতে পারছিল অর্থ দপ্তর লীগের হাতে ছেড়ে দেওয়া কী ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্যাটেল তাই বারে বারে চাইছিলেন দেশভাগ। নেহরু দ্বিধায় ছিলেন। দেশভাগ ঠেকাতে, জিন্নাহকে প্রধানমন্ত্রী করে কংগ্রেসের সরকারের বাইরে থেকে সমর্থন করার গান্ধীর প্রস্তাব কংগ্রেসের নেতারা মানলেন না, প্যাটেলের বক্তব্য ছিল, গান্ধী চাপ দিলে এই প্রস্তাব তাঁরা মনের সায় না থাকলেও মানবেন কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে 'সিভিল ওয়ার' বা গৃহযুদ্ধ।

দেশভাগ ও স্বাধীনতার যে বিস্তৃত প্রেক্ষাপট, যে প্রেক্ষাপটে আমরা অনেকেই গান্ধীকে খলনায়ক বানিয়ে বসে থাকি, তথ্য ও সত্যের আশ্রয় না নিয়ে বা বিকৃত করেই হয়ত। সেই ইতিহাস চর্চা করতে হলে, গান্ধীকে বোঝার চেষ্টা করতে চাইলে, এই পর্যন্ত যা লেখা হল তা ভূমিকা হিসেবেও যথেষ্ট নয়। একটা প্রশ্ন তাই ফিরে ফিরে আসে, নানা জাতি গোষ্ঠী ও ব্যক্তির বহুবিধ উদ্দেশ্য ও স্বার্থের কেন্দ্রে, ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে-হতে, জটিল পরিস্থিতিতে দেশভাগ স্বীকার করে না নিয়ে গান্ধীর কাছে বিকল্প পথ কী কী খোলা ছিল?

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

বাংলাদেশ স্বাধীন হতেই বামেদের শরিকি সংঘর্ষে পর্যদুস্ত কোচবিহারে কংগ্রেসকে ফিরিয়ে আনল ইন্দিরার ইমেজ

রাজনগরের রাজনীতি

(৫)

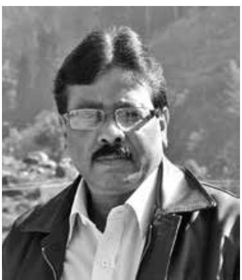

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ তখন এ পারের মানুষের উন্মাদনা, অহঙ্কার। তখনও সীমান্ত নেই, ভিসা পাসপোর্টের বলাই নেই, দুই বাংলা এক! দিনহাটা গীতালদহ হয়ে তখন দলে দলে মানুষ চলেছেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ দেখতে। আমি তখন কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে। শুনলাম রেড ক্রসের ট্রাক মাঝে মাঝেই ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছে লালমনির হাট। সকাল বেলা আমি আর আমার এক বন্ধু প্রণব হাজির হয়ে গেলাম কালী ডাক্তারের বাড়িতে। মহারাজার আর্মির ডাক্তার ক্যাপটেন অজিত (কালী) রায় চৌধুরী তখন ছিলেন রেডক্রসের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। বললাম কাকু, আমরা স্বেচ্ছাসেবি হয়ে ত্রাণের গাড়িতে লালমনির হাটে যাব। উনি বললেন, সে কী! না না এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। চারদিকে মাইন টাইন ছড়িয়ে আছে, এর মধ্যে তোমাদের যাওয়া হবে না। আমরা দুই বন্ধু হাতে পায়ে ধরে বললাম, কাকু আমরা এনসিসি করি। আমাদের ট্রেনিং আছে। আপনার অনুমতি পেলেই আমরা যেতে পারি। উনি একটু ভেবে বললেন, আচ্ছা যা, বাবার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে আয়। প্রণব থাকত হোস্টেলে। দুজন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম ওর ঘরে। বাবার জবানিতে নিজেরাই লিখে ফেললাম চিঠি। খামে ভরে আঠা মেরে বিকেলের দিকে

সেই চিঠি নিয়ে পৌঁছে গেলাম ওনার কাছে। চিঠি পড়ে সরল বিশ্বাসে উনি বললেন, আচ্ছা বেশ, ইউনিসেফের গাড়ি কাল যাচ্ছে। আমি রিলিফ অফিসার গুপ্ত সাহেবকে ফোন করে দিচ্ছি, তোরা গিয়ে ওনার সাথে দেখা কর, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দুজনে ছুটলাম গুপ্ত সাহেবের কাছে। উনি আমাদের পরিচয়পত্র বানিয়ে দিয়ে বললেন, কাল সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে এখানে চলে আসবে। আনন্দে নাচতে নাচতে দুই বন্ধু বাড়ি-হোস্টেল ছুটলাম। বাড়িতে বললাম এনসিসি থেকে সতীশদা আমাদের লালমনিরহাটে নিয়ে যাচ্ছেন রিলিফ দিতে। ওই বয়সে এমন নির্জলা মিথ্যা বলতে আমার ঠোঁট একবিন্দুও কাঁপে নি। আসলে থ্রিলটাই ছিল বেশি! সারা রাত আনন্দে ঘুম হল না। পরদিন ঠিক সাড়ে সাতটায় জল খাবার খেয়ে একটা কিট ব্যাগ নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম রিলিফ অফিসে। গুপ্ত সাহেব আমাদের হাতে ত্রিশ টাকা করে দিয়ে বললেন, যাও গাড়িতে উঠে বসো। আরও কয়েকজন সরকারি কর্মী ইউনিসেফের লোগো দেওয়া পেল্লাই সাদা রঙের মাল বোঝাই "ইসুজু" ট্রাকে উঠে বসলেন। পর পর দুটো ট্রাক ছেড়ে দিল ঠিক আটটায়।

তখন গোটা যোগাযোগটাই ছিল ভুরুঙ্গামারি হয়ে। দিনহাটা থেকে একটা পুলিশের জিপ সাহেবগঞ্জ রোড ধরে আমাদের গাড়ির আগে আগে চলতে শুরু করলো। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পৌছে গেলাম ভুরুঙ্গামারি। ভুরুঙ্গামারিতে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ক্যাম্পে রিপোর্ট করে আমরা রাঙালিরবস নাগেশ্বরী ফুলবাড়ি হয়ে পৌঁছে গেলাম ধরলার ঘাটে। মারের নৌকোয় শীতের শীর্ণকায়া নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে আবার ট্রাক চলতে শুরু করলো। সামরিক বাহিনীর গাড়িগুলো যাতায়াত করছে, খুব ধীর গতিতে। কাঁচা রাস্তায় মাইনের ভয়ে আগের গাড়ির ট্র্যাক ধরে ধরে খুব আস্তে চলল গাড়ি। কুলাঘাট হয়ে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম লালমনিরহাটে। গোটা শহর যুদ্ধবিধ্বস্ত। খুব ঝড় বা বন্যার পর যেমন হয়, অনেকটা তেমনি। চার দিকে পোড়া গন্ধ। লোকজন নেই। বেশির ভাগই ঘরবাড়ি ছেড়ে গ্রামের দিকে পালিয়ে গেছে। রাস্তার পাশের বাড়িগুলোর দেওয়ালে বা টিনের বেড়ায় গুলির চিহ্ন, বড় বড় গর্ত। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়ি শহরময় ঘুরে ব্যারাচ্ছে। আমরা সোজা চলে গেলাম মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্প অফিসে। একটা বন্ধ স্কুলের মধ্যে খোলা হয়েছে ওই অফিস। ওরাই লোকজন দিয়ে মাল পত্র নামানো শুরু করলেন। প্রচুর শিশু খাদ্য, মাইলো, ভোজ্য তেল, কনডেন্সড মিল্ক, বস্তা বন্দী ইরানী খেজুর আর প্রচুর জামা কাপড়। আমরাও হাত লাগলাম। পরিতোষিক! হিসেবে একটা করে মরিনাগা মিল্ক ফুড, বেশ কয় প্যাকেট খেজুর, কয়েকটা কনডেন্সড মিল্কের কৌটো আমি আর প্রণব লুকিয়ে রাখলাম আমাদের বসার সিটের নিচে।

মূলত রেলকেন্দ্রিক ছোট্ট শহর লালমনির হাট। আমাদের হাতে সময় কম। বিকেল পাঁচটা নাগাদ গাড়ি ছেড়ে দেবে। দুপুরে মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্পে ডিমের ঝোল ভাত খেয়ে আমরা দুই বন্ধু পুলিশের জিপে করে বেরিয়ে পড়লাম বিধ্বস্ত শহর দেখতে। প্রথমেই গেলাম রেল স্টেশনে। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে স্টেশনের বেশ কিছু অংশ। রেললাইন তুলে ফেলা হয়েছে। জানালা দরজার ভাঙা কাঁচ কাঠ স্তূপ হয়ে পড়ে আছে চারদিকে। কিছুক্ষণ ওখানে থেকে এবার চললাম এয়ারপোর্ট দেখতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্মিত ছোট্ট লালমনিরহাট বিমানবন্দর। গোটা রানওয়ে জুড়ে বড় বড় গর্ত। টার্মিনাল ভবনটি ভেঙেচুরে শেষ। পুলিশের কাকুরা বললেন, শত্রুপক্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে দিতে, হাসিমারার বায়ু সেনা ঘাঁটি থেকে ভারতীয় যুদ্ধ বিমান উড়ে এসে এখানে কার্পেট বোম্বিং করেছে।

পাঁচটার আগেই আমরা ফিরে এলাম মুক্তি বাহিনীর শিবিরে। এবার ফেরার পালা। ভারতীয় সেনার বীরত্ব আর শৌর্যে আপ্লুত মুক্তি বাহিনীর যোদ্ধারা আমাদের জনে জনে উষ্ণ আলিঙ্গনে

বিদায় জানালেন। ইন্দিরা-মুজিব জিন্দাবাদ, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে দিয়ে বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের লাল আলোকে সঙ্গী করে আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল। আবার ওই পথেই ভুরুঙ্গামারি, দিনহাটা হয়ে রাত ১০টা নাগাদ আমরা ফিরে এলাম কোচবিহারে।

১৯৬৭-৬৮ সালের পর থেকে নকশাল আন্দোলনের সাথে সাথে এ জেলায় বামপন্থীদের, বিশেষ করে সিপিএম আর ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে ক্ষমতা দখলের শরিকি সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে। মাঝে মাঝে সিপিএমের সাথে সিপিআই এর লড়াইতেও জেলার মাটি তপ্ত হয়ে ওঠে। এমনকি জেলার প্রথম সারির সিপিআই নেতা দেবী নিয়োগীও রেহাই পেলেন না। সাত মাইলের কাছে তাঁব কাটা হাতের উপর আবার তরোয়ালের কোপ চালালো সিপিএমের জঙ্গি বাহিনী। গুরুতর আহত দেবীবাবুকে চিকিৎসার জন্য দলের পক্ষ থেকে মস্কো নিয়ে যাওয়া হল। রাম দা, টাঙ্গি বল্লম আর তরোয়ালের ঢক্কা নিনাদে শান্ত স্নিগ্ধ প্রান্তিক জেলা কোচবিহারের মাটি উত্তপ্ত হয়ে উঠল একটু একটু করে। ওসমান গনি, হ্যাদলা বর্মন, ফজিমুল্লা, ছোট বাবু, বড় বাবু— বামপন্থীদের অ্যাকশন স্কোয়াডের

প্রথমেই গেলাম রেল স্টেশনে। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে স্টেশনের বেশ কিছু অংশ। রেললাইন তুলে ফেলা হয়েছে। জানালা দরজার ভাঙা কাঁচ কাঠ স্তূপ হয়ে পড়ে আছে চারদিকে। কিছুক্ষণ ওখানে থেকে এবার চললাম এয়ারপোর্ট দেখতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্মিত ছোট্ট লালমনিরহাট বিমানবন্দর। গোটা রানওয়ে জুড়ে বড় বড় গর্ত। টার্মিনাল ভবনটি ভেঙেচুরে শেষ।

এই সব বীর সৈনিকদের নামে গোটা জেলায় তখন থরহরি কম্প। এলাকা দখলেব এই অনভিপ্রেত লড়াইতে অসংখ্য বামপন্থী গরীব মানুষের রক্তে জেলার মাটি লাল হয়ে গেছে। শুধু শরিকি সংঘর্ষ নয়, শ্রেণী সংগ্রামের নামে চোরাগোপ্তা আক্রমণে নিহত হয়েছেন অনেক সাধারণ বাম বিরোধী মানুষ। এদের অধিকাংশই ছিলেন গরীব মানুষ।

১৯৭০ এর ১৯ মার্চ অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়ে গেল। এর প্রতিবাদে পরদিন সিপিএমের ডাকা বন্ধে বল্লমের ঘায়ে খুন হয়ে গেলেন কোচবিহার বাজারের হনুমান স্টোরের এক নিরীহ দোকান কর্মচারি। খোদ শহরের বুকে প্রকাশ্যে দিবালোকে তীর ধনুক টাঙ্গি বল্লম রামদা আর ব্যাগ ভর্তি বোমা নিয়ে মিছিলের লাল আতঙ্কে শান্তিপ্রিয় মানুষজন তখন ঘরবন্দী। বাম দলগুলির ক্রমবর্ধমান হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ এ জেলার মানুষ ১৯৭১-এর সাধারণ নির্বাচনে একমাত্র মেখলিগঞ্জ বাদে বাকি সাতটি আসনেই কংগ্রেস প্রার্থীদের বিপুল ভোটে নির্বাচিত করলেন। এবার কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে ২ এপ্রিল রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হল। কিন্তু সে সরকারও টিকলো না, ৮৭ দিনের মাথায় রাজ্যে আবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়ে গেল।

১৯৭২ এর মার্চে আবার রাজ্যে নতুন করে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল।পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধজয়ের ফলশ্রুতিতে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টির মূল কাণ্ডারী এশিয়ার মুক্তিসূর্য ইন্দিরা গান্ধী তখন আন্তর্জাতিক খ্যাতির মধ্যগগনে। এই আবেগের জোয়ারে সেই নির্বাচনে রাজ্যের অনেক জেলার মত এই জেলাতেও বামেরা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বে গঠিত হল কংগ্রেস সরকার। সিদ্ধার্থ মন্ত্রী সভায় এ জেলা থেকে পূর্ণমন্ত্রী (ত্রাণ ও পুনর্বাসন) হলেন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সন্তোষ কুমার রায় আর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন দিনহাটার কংগ্রেস নেতা মহক্ষ্ম ফজলে হক।

পাঁচের দশক থেকে এ জেলায় কংগ্রেসের অবিসম্বাদিত নেতা ছিলেন সন্তোষ (কালী) রায় আর সুধীর (বিশু) নিয়োগী। কালী শিষ্য আর বিশু তার গুরু। দুজনেই ছিলেন অতুল্য ঘোষ আর প্রফুল্ল সেনের অনুগামী। ১৯৬৯-এ কংগ্রেস ভাগের পর সুধীর নিয়োগী থেকে যান মোরারজি দেশাই-এর আদি কংগ্রেসে আর সন্তোষ রায় যোগ দেন ইন্দিরা কংগ্রেসে। মোরারজির আদি কংগ্রেস ডুবে গেল। কিছুদিন পর সুধীর (বিশু) নিয়োগী আবার ফিরে এলেন ইন্দিরা কংগ্রেসে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন এটা ছিল গুরু শিষ্যের একটা কৌশল মাত্র। সে সময় এই দুই নেতা ছিলেন জেলা কংগ্রেসের প্রথম এবং শেষ কথা।

ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ১৯৬৭-র বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহার উত্তর (শহর) আসনে প্রার্থী হলেন উদ্বাস্তু নেতা মতিরঞ্জন তর। বামপন্থীরা শহরে স্লোগান তুললেন, "কালী বিশু মতি তর কংগ্রেসের তিন ইতর"। পালটা স্লোগানে মুখর হলেন কংগ্রেসীরা— "পাখির মধ্যে কবুতর, মাছের মধ্যে পুঁটিতর, মাইনষের মধ্যে মতি তর — ভোট ফর মতি তর"। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীকে বিপুল ভোটে হারিয়ে সেবার জয়ী হলেন কংগ্রেস প্রার্থী মতিরঞ্জন তর।

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লকের টিকিটে কোচবিহার লোকসভা আসনে জয়লাভ করেন তফসিলী (উদ্বাস্তু) প্রার্থী বিনয় কৃষ্ণ দাশ চৌধুরী। তাঁর জন্ম বাংলাদেশে। বিনয়বাবু ছিলেন উচ্চশিক্ষিত আইনজীবি এবং সুবক্তা। দিল্লিতে গিয়ে সরাসরি তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করে নিলেন। পরে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ১৯৭১-এর নির্বাচনে আবার লোকসভায় নির্বাচিত হন। সন্তোষ রায়কে তিনি কখনোই নেতা হিসেবে মেনে নিতে চান নি। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সাথে সন্তোষ রায়ের ব্যক্তিত্বের সংঘাত শুরু হয়ে গেল। জেলা কংগ্রেসে শুরু তুমুল গোষ্ঠী কোন্দল। ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে কংগ্রেসে আসা উদ্বাস্তু নেতা বিধায়ক সুনীল কর, বিধায়ক মহ. ফজলে হক, ছাত্র পরিষদ সভাপতি শ্যামল চৌধুরী, রামকৃষ্ণ পাল, জ্যোতি শংকর (বাবু) ভট্টাচার্য, বীরেন কুণ্ডু প্রমুখ বিনয়বাবুর শিবিরে যোগ দিলেন। বর্ষীয়ান আইনজীবি অরুণ ভট্টাচার্যকে বিনয়কৃষ্ণ শিবির আইনি উপদেষ্টা হিসেবে পেয়ে গেলেন।

এদিকে সুধীর (বিশু) নিয়োগী ছাড়াও সন্তোষ রায়ের সাথে থেকে গেলেন প্রাক্তন বিধায়ক ও আইনজীবি প্রসেনজিৎ বর্মন ও বাকি বিধায়করা। যুব ছাত্র নেতাদের মধ্যে অলোক নন্দী, চন্দন ভদ্র, যুব কংগ্রেস সভাপতি সন্তোষ মুখার্জি, ছাত্র পরিষদ নেতা মিহির গোস্বামী, মৃণাল ভদ্র, সুভাষ কুণ্ডুরা সবাই থেকে গেলেন সন্তোষ রায়ের সাথে। বলাবাহুল্য জেলা রাজনীতিতে সন্তোষ রায়ের পাল্লা অনেক ভারী ছিল। দু দশকের পোড় খাওয়া এই কংগ্রেস নেতার শিকড়বাকড় ছিল গোটা জেলা জুড়ে, এমন কি প্রদেশ কংগ্রেসের গভীরে।

সুইডিশ মিশনের কোচবিহার জেলার কর্ণধার ওলভ হুডনি সে সময় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ করতেন। তাঁর মূল কর্মকান্ড ছিল প্রধানত জোড়াই রামপুরে। আন্তর্জাতিক ত্রাণের টাকায় তিনি ওই এলাকায় উদ্বাস্তুদের জন্য অসংখ্য বাড়িঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও জেলার বহু জায়গায় তিনি পুনর্বাসনের কাজ করতেন। স্বভাবতই ত্রাণমন্ত্রী সন্তোষ রায়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল মধুর। মূলত গোলমালটা শুরু করা হল সেই হুডনি সাহেবকে কেন্দ্র করেই। বিনয় শিবির থেকে দেয়ালে দেয়ালে লেখা হলো "হুডনি সাহেবের দালালরা সব হুঁশিয়ার"। এরপর শুরু হয়ে গেল দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারপিট। প্রদেশ কংগ্রেসেও তখন একটু একটু করে গোষ্ঠী কোন্দল মাথা চাড়া দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় তাঁর ইমেজ ভাল রেখে ক্ষমতায় একাধিপত্য বজায় রাখতে প্রথম থেকেই এই গোষ্ঠী কোন্দলকে প্রশ্রয় দিতে থাকেন। বিরোধী গোষ্ঠীর নেতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন বিনয়কৃষ্ণ শিবির।

(চলবে)

আসামের চিঠি

করোনা-বন্যা-বেরোজগারির ত্রিফলা আক্রমণে আসাম

সমর দেব

আসামে করোনা পরিস্থিতি ক্রমেই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই সওয়া তিন কোটি জনসংখ্যার এই রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৩ হাজার ৯৯৯। সুস্থ হয়ে উঠেছেন মোট ১৬ হাজার ২৩ জন। এখনও অসুস্থ ৭ হাজার ৯১৬ জন। মত্যু হয়েছে ৫৭ জনের। এই তথ্য সরকারির সূত্রের। অসমের চা-বাগিচাগুলি নিয়ে সব মহলেই গভীর আশঙ্কা থাকেলও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে রাজধানী শহর গুয়াহাটি সহ কামরূপ মেট্রো জেলা সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। তুলনায় বাগিচা এলাকা অনেকাংশেই নিরুদ্বেগ। প্রাথমিক পর্যায় পেরিয়ে চা বাগানগুলি চালু করা হয়েছে। তবে, সমস্ত শ্রমিক একইসঙ্গে কাজ করছেন না। বরং, দফায় দফায় কাজ হচ্ছে, একই সময়ে খুব বেশি শ্রমিক কাজে নামছেন না। এটা বেশ কাজে দিয়েছে। এমনিতেই চা বাগিচা অঞ্চলগুলি অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া। শিক্ষার তেমন প্রসার ঘটে নি। ফলে, অনুমান করা গিয়েছিল যে, শ্রমিকরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত বলেই অসচেতন এবং এই অসচেতনতা করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সফল হবে না। সংক্রমণ ও তার পরিণতি নিয়ে সচেতনতার অভাবে চা-বাগিচা অঞ্চলে ভয়াবহ বিপদ অপেক্ষা করছে। কিন্তু, বাস্তব চিত্রটি সম্পূর্ণ উল্টো। দেখা যাচ্ছে, শহুরে তথাকথিত শিক্ষিত মানুষই বরং বিপদের কারণ হয়ে উঠেছেন।

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. হিমন্তবিশ্ব শর্মা লাগাতার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বাস্তবিকই দিনের ক-ঘণ্টা তিনি ঘুমোচ্ছেন সেটাও সংশয়ের। রাজ্য জুড়েই তিনি ছুটে বেড়াচ্ছেন। নিয়মিত ট্যুইট করছেন, সাংবাদিক বৈঠকে সর্বশেষ তথ্য পেশ করছেন। মানুষকে আশ্বাস দিচ্ছেন শুধু নয়, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে অসংখ্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। হাসপাতালে বেডের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। অসংখ্য কোয়ারেন্টিন সেন্টার চালু করেছেন। সেসব কোয়ারেন্টিন সেন্টারে রোগীদের চমৎকার খাদ্য ও পথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। তাঁর এই তৎপরতায় রাজ্যের অধিকাংশ মানুষই ভীষণ রকমের খুশি। খুশি হবারই কথা। করোনার মত ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগের মোকাবিলায় তিনি নির্ভীকভাবে যেন একক লড়াইয়ে নেমেছেন। রাজ্যের মানুষ তাঁকে ধন্য ধন্য করছে। বহু মানুষ এতটাই আপ্লুত যে, এক ব্যক্তি প্রয়োজনে নিজের দুটো কিডনিই হিমন্তকে স্বেচ্ছাদানের প্রস্তাব করেছেন। সেকথা হিমন্ত নিজেই ট্যুইট করেছেন।

কিন্তু তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ মানুষের বাঁচার লড়াই তো একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। এই চরম সত্যটা অনেকেই বুঝতে চাইছেন না। মূলত অসতর্কতার জেরেই অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি করোনা সংক্রমণের কবলে পড়েছেন। চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী, করোনার চিকিৎসা ও শনাক্তকরণের কাজে নিয়োজিত যাঁরা তাঁদের সংক্রমণের স্বাভাবিক সম্ভাবনা থাকছেই। যে কারণে অনেক ডাক্তার, নার্স আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু এমন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির দেহে সংক্রমণ ঘটেছে, যাঁদের সঙ্গে

আসামে বন্যার প্রকোপে বহু এলাকা জলের তলায়

গণসংযোগের স্বাভাবিক সম্ভাবনা থাকার কথা নয়। একাধিক বিধায়কও করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন, যেটা তাঁদের অসচেতনতারই প্রমাণ। এমনিতে রাজনৈতিক সমস্ত ব্যক্তিত্ব অন্য সকলের মতই গৃহবন্দি রয়েছেন। তা সত্ত্বেও কেউ কেউ আক্রান্ত হয়েছেন।

এদিকে, রাজ্যের কারাগারগুলো বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় কারাগারে শতাধিক বন্দির শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। এই কারাগারেই বন্দি রয়েছেন রাজ্যের শ-খানেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বন্দি রয়েছেন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের উজ্জ্বল মুখ, কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির শীর্ষ নেতা অখিল গগৈও। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির কারাবন্দি নেতাদের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। সম্প্রতি অখিল গগৈ সহ কয়েকজন নেতাকে আদালতে তোলা হলে অখিল জানান যে, তিনি খুব কষ্টে আছেন। সেটা তাঁর শরীরেও স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে। দুদিন আগে অন্য দুই আটক নেতাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মুক্তি পেয়েই দুই নেতা সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে আন্দোলনের জেরে কারাগারে বন্দি নেতাদের মেরে ফেলার চেষ্টা চলছে। অভিযোগের সত্যতা আছে কিনা সেটা সময়ই বলবে। তবে, কারাগারে ব্যাপক করোনা সংক্রমণের ঘটনাটি সাংঘাতিক। ফলে, সংশ্লিষ্ট বন্দিদের মুক্তির দাবি উঠেছে।

তবে করোনা সংক্রমণ ও তা নিয়ে আতঙ্ক এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে, এই মুহূর্তে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ প্রদর্শনে রাস্তায় নামার প্রশ্নই নেই। কারাগারের অভ্যন্তরে সত্যিই যদি কোনও অঘটন ঘটে যায় তার পরিণাম মারাত্মক হয়ে উঠতে বাধ্য। বিশেষ করে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সঙ্গে আসামের ভূমিপুত্রদের স্বার্থের প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। কয়েক মাস আগে এই আইনের প্রতিবাদে আন্দোলনে অনেক মানুষকে ময়দানে সক্রিয়ভাবে নামতে দেখা গেলেও অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিতে দেখা যায় নি। এই বাহ্যিক লক্ষণ যদি সরকার বা সরকারি দলকে প্ররোচিত করে থাকে তাহলে তাদের ভয়ানক পরিস্থিতির জন্য হয়ত অপেক্ষা করতে হবে। কারণ, কারাবন্দি নেতাদের শারীরিক ক্ষতি হলে সেটা শুধু ভূমিপুত্র কেন, রাজ্যের কারও পক্ষেই

হয়তো সহ্য করা সম্ভব হবে না। ওরকম ভয়ানক ঘটনায় কজন নির্বিকার থাকবেন সন্দেহ রয়েছে এবং সেটাই স্বাভাবিক।

আবার, আরেক বিপদ বাঁধিয়েছে ব্যাপক কর্মহীনতার সঙ্কট। আগে থেকেই রাজ্যে ব্যাপক কর্মহীনতার সমস্যা ছিল। করোনা সেখানে নতুন ভাবে জটিল করে তুলেছে মানুষের কর্মহীনতার বিষয়টি। কয়েক লক্ষ মানুষ ভিনরাজ্য থেকে ঘরে ফিরে এসেছেন। রাজ্যের অভ্যন্তেরও নিজ এলাকার বাইরে যারা নানা কাজেকম্মে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরাও ঘরে ফিরেছেন। এই বিপুল জনসমষ্টি এখন সম্পূর্ণ বেকার। ঘরে ঘরে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। রাজ্যে রেশনিং ব্যবস্থা মোটেই ব্যাপক বিস্তৃত নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ, গরিব, নিম্নবিত্ত

দুদিন আগে অন্য দুই আটক নেতাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মুক্তি পেয়েই দুই নেতা সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে আন্দোলনের জেরে কারাগারে বন্দি নেতাদের মেরে ফেলার চেষ্টা চলছে।

ও মধ্যবিত্ত মানুষ গণবণ্টন ব্যবস্থার বাইরে রয়েছেন। ফলে, সরকারি খাদ্য সামগ্রীর সুবিধা তাদের হাতে পৌঁছয় না। গত কয়েক মাস ধরে কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়া এই জনসমষ্টির সামনে অনাহারের আশঙ্কা উঁকি দিচ্ছে। লকডাউন উঠে গেলেও এদের অধিকাংশই ফের কাজ জোটাতে পারবেন না। কারণ, যে ধরনের ছোটখাটো উদ্যোগে এরা কাজে নিয়োজিত ছিলেন সেসব স্থানে ডাউন সাইজিং করা হয়েছে, হচ্ছে। এই আশঙ্কাই কিছুদিন আগে ব্যক্ত করা হয়েছে এক সমীক্ষায়।

ওই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, রাজ্যের অর্ধেক মানুষ অনাহারে পড়তে চলেছে শীঘ্রই। কারণ, একেবারেই ভেঙে পড়েছে অর্থনীতির পরিকাঠামো। হুহু করে বাড়ছে বেকারত্ব। দৈনন্দিন কাজকর্ম, লেনদেন প্রায় বন্ধ হয়ে পড়েছে এবং তার জেরে শ্রমজীবী মানুষ এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা, ব্যাপক বন্যায় চাষের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতির এখনও তেমন উন্নতির আভাস মেলে নি। চলতি শ্রাবণ মাসে আরও প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে, বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াল হয়ে উঠতে পারে।

গুয়াহাটির ওমিয় কুমার দাস ইনস্টিটিউট অব সোসাল চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর সহযোগিতায় স্টেট ইনোভেশন অ্যান্ড ট্রান্সফর্মেশন আয়োগ (এসআইটিএ) রাজ্যের অর্থনীতির ওপরে এই সমীক্ষা চালায়। তাতে বলা হয়, করোনার জেরে ৬৭ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। করোনার জেরে নতুন করে এত মানুষের জীবিকা হারানোর পরিণামে রাজ্যে দেড় কোটির বেশি মানুষ অনাহারের মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। সমীক্ষার রিপোর্ট পেয়ে রাজ্য সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে বা এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কোনও পরিকল্পনা আদৌ আছে কিনা তা এখনও পরিষ্কার নয়।

শুধু করোনার জেরে রাজ্যে নতুন ২৭.১ লক্ষ মানুষ কাজ হারাবে নির্ঘাত। তার পরিণামে রাজ্যে বেকারত্ব বাড়তে পারে ১৬ থেকে ২৭ শতাংশ। এই বিপুল কর্মহীনতায় মোট জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁছতে পারে। ইতিমধ্যেই কর্মহীনতার এই বিপদের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্যের নানা স্থানে ইতিমধ্যেই অভাবের তাড়নায় বেশ কিছু আত্মহননের ঘটনা ঘটেছে। ফলে, সামনে যে আরও ভয়াবহ দিন অপেক্ষা করছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। করোনা, বন্যা আর বেকারত্বের ত্রিফলা আক্রমণের এই বিশাল হা-মুখ থেকে আসাম কী করে বাঁচবে সে এক কঠিন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

এ নদী কেমন নদী

করলা ও তিস্তার দিকে আর কবে নজর দেব ?

তুহিন শুভ্র মন্ডল

করলা প্রিয় নদী। হ্যাঁ প্রিয়ই বললাম সমস্ত জলপাইগুড়ি বাসী আর নদী সন্তানদের পক্ষ থেকে। কেন না তাদের সাথে কথা বলে বুঝেছি অসংখ্য মানুষ করলাকে ভালবেসে বুকে ধারণ করেছে। তাই করলার যন্ত্রণায় তারা ক্লিষ্ট। এই নদীর দুর্দশা দেখে কষ্ট হয় তাদের। এই করলা নদী তাদের কাছে আবেগের ‘টেমস’।

জলপাইগুড়ির ‘জীবন রেখা’ করলা। এই নদী কথা ও কথকতার মেলবন্ধন, সৃজনের অবিসংবাদি উপজীব্য। শুধু কি তাই! পরিবহণ এবং জলপাইগুড়ির অর্থনীতির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত। অথচ সেই নদী আজ মৃতপ্রায়। ধুঁকছে...

করলার উৎসমুখে যেমন জল স্পর্শহীনা, তেমনই শহরের অংশেও দীর্ণ। বর্ষার সময় ছাড়া জলপাইগুড়িবাসীর এই প্রিয় নদীর কী হাল হয় তা নতুন করে উল্লেখ করার কিছু নেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে আজ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেও এই নদীতে জল থাকত। অথচ এখন? জলপাইগুড়ি শহরে ঢোকার মুখে, মাসকালাইবাড়ি, দিনবাজার, ইঞ্জিনিয়ারিং মোড়ের মত এলাকায় হাসপাতাল, বিভিন্ন নার্সিংহোমের বর্জ্য, বাজারের বর্জ্য নদীতে মিশছে। শহরের সমস্ত আবর্জনা মিশছে জলপাইগুড়িবাসীর প্রিয় করলা নদীতে। যারা নদীতে এসব ফেলছে তারা কি নদীকে ভালবাসে না?

কিছুদিন আগে ডুয়ার্সের সাহিত্য উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে (আয়োজক: এখন ডুয়ার্স পত্রিকা) সমাজপাড়ায় করলা নদীর অংশকে আরও একবার কাছ থেকে দেখলাম। কালো জল, প্লাস্টিক, অন্য

আবর্জনায় ভরা করলা নদী

আবর্জনা ইত্যাদিতে ভর্তি। রবীন্দ্রভবনের উল্টো দিকের ঘাটেই দেখা পেলাম জলপাইগুড়ির বাসিন্দা সঞ্চয় ঘোষের। তার কথায় "মানুষ যত জাগবে নদী তত শুকোবে"। আপনমনেই বলছিলেন কথাটি। গভীর অর্থবাহী কথাটি শোনার পর নিজে থেকেই আলাপ করলাম। বুঝলাম করলা নদীর কষ্টে তিনিও ব্যথিত। প্রিয় করলার যন্ত্রনা মুক্তি চান তিনি। এই করলার প্রাণান্তকর কষ্টের মুক্তি চান রায়কতপাড়ার বাসিন্দা রিঙ্কু মূখার্জী, অন্তর্লীনা মুখার্জি, পি ডি উইমেন্স কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীপর্ণা সরকার, জলপাইগুড়ি এ সি কলেজের অধ্যাপক বিপুল চন্দ্র সরকারও। তাঁদের কথায়— "করলা জলপাইগুড়ির জীবনরেখা। তাকে যে কোনও ভাবে বাঁচানো দরকার।"

জলপাইগুড়ি পৌরসভা এলাকার মধ্য দিয়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ি বাসীর প্রিয় টেমস। অসংখ্য মানুষ নদীটার জন্য ভাবছেন। তাদের আকুতি যেন একটাই। করলা নদীকে বাঁচাতে হবে। কিছু একটা করতে হবে। আসলে করলা তাদের বুকে। বুকের ভিতর অহরহ তাদের নদী যাপন চলে।

এর আগে করলার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন নদী, সমাজ, ভূগোল ও পরিবেশপ্রেমী সংগঠন এবং সচেতন মানুষ।

জলপাইগুড়ি পৌরসভা এলাকার মধ্য দিয়ে গিয়েছে জলপাইগুড়ি বাসীর প্রিয় টেমস। অসংখ্য মানুষ নদীটার জন্য ভাবছেন। তাদের আকুতি যেন একটাই। করলা নদীকে বাঁচাতে হবে। কিছু একটা করতে হবে। আসলে করলা তাদের বুকে। বুকের ভিতর অহরহ তাদের নদী যাপন চলে। আরও অনেকে করলার ভাল দেখতে চান। করলার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে তাদের যাবতীয় আবেগ নিয়োজিত। কী বলছেন পৌরসভার চেয়ারম্যান? কথা বলেছি তাঁর সাথে। পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মোহন বসুর কথায় "করলা নদীকে বাঁচানোর জন্য কিছুদিনের মধ্যেই আমরা নিকাশি নালার মুখগুলোতে নেটিং করব। তার টেন্ডার প্রক্রিয়া প্রায় শেষ। এছাড়া পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে করলা অ্যাকশন প্ল্যান জমা দেওয়া আছে। করলা নদী পাড়ের বাসিন্দাদের বুঝতে হবে যে নদীটাকে কী কী ভাবে ভাল রাখা যায়।"

রাজ্য নদী বাঁচাও কমিটির কনভেনর হিসাবে বলতে পারি, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সাথে নিয়ে জলপাইগুড়ির সমস্ত সংগঠন, সমস্ত স্তরের মানুষদের সাথে আমরা জলপাইগুড়ির টেমস করলা নদীর জন্য কিছু করতে চাই। এক্ষেত্রে তিস্তা নদীর কথাও বলা দরকার। কেন না এই নদী উত্ত রবঙ্গের প্রধান নদী।

এত মানুষের মনের আহ্বান, করলার প্রতি ভালবাসা, প্রার্থনাকে বৃথা যেতে দেওয়া যায় না। আগামীতে দেখতে পাচ্ছি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে, প্রশাসন ও সরকারের উপযুক্ত পদক্ষেপে এবং মানুষের ভালবাসার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করছে প্রিয় করলা। করলার 'জীবন ও জীববৈচিত্র্য' বাঁচাতে একমুখী ভাবনাই এখন সর্বাগ্রে জরুরি।

আর তিস্তা? শুধু সিকিম নয়, উত্তরবঙ্গেরও জীবনরেখা। অথচ কী অবস্থা তার? জলের প্রবাহ ক্রমশ কমছে। তিস্তার উৎসস্থলে এই সমস্যা? নাকি উজানে একের পর এক ড্যাম তৈরি? অথবা জলবায়ু পরিবর্তন— কী কারণে সেই জলপ্রবাহ কমছে সেটা নিয়ে চর্চা চলছে বিস্তর।

তিস্তা নদীর ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় আছে। কেন না নদীটি আন্তঃসীমান্তে। আন্তঃসীমান্ত এই নদীটিকে নিয়ে টানাপোড়েন তাই আন্তর্জাতিক। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে জলবন্টনের সমস্যা এখনও মেটে নি। মাঝখানে আছে পশ্চিমবঙ্গ। ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিজেপি সরকার এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে। কেন না বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির একটি ভরকেন্দ্র তিস্তার

তিস্তা নদীর জল নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান হয়নি আজও

জলবন্টনের এই সমাধান। বর্তমান বাংলাদেশ সরকারও তাদের জনগণের জন্য এই সমস্যার সমাধান করতে বদ্ধপরিকর।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখার পরে প্রশ্নোত্তর পর্বে নদীর প্রশ্নে অবধারিত ভাবেই উঠে এল তিস্তার প্রসঙ্গ। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যে তিস্তা প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকায় একেবারেই খুশি নয় তা সেদিন জোরালো ভাবে বুঝিয়েছিলেন বাংলাদেশ সরকার পুনর্বার। ক্ষমতায় এসেছিল যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার মধ্যে অন্যতম যে ভারত সরকারের কাছ থেকে তারা সমাধান আদায় করে আনবে।

কিন্তু তা হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার তিস্তার জলবন্টনের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটির উল্লেখ করেছে তা কিন্তু সঙ্গত। বিভিন্ন ঋতুতে বর্ষার সময় ছাড়া তিস্তা নদীর জলের পরিমাণ কিন্তু রীতিমত উদ্বেগ তৈরি করে। বিভিন্ন ঋতুতে নিজের চোখে দেখা তিস্তার রূপ দেখেও একথা বলতে পারি। এখান থেকেও উঠে আসছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তা হল এর সমাধান কোথায়? এবং তা নিয়ে প্রশাসনিক ও সরকারী ভাবে কী ভাবা হচ্ছে?

ঠিক এই জায়গায় উঠে আসছে উদাসীনতার কথা। আশঙ্কার কথা। সত্যিই তো নদীগুলোকে নিয়ে ভাবা হচ্ছে না। কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও নেই।এই যে তিস্তা নদীতে অন্য সময় ছাড়া জল থাকে না তাই বলে কি তিস্তা নদীতে বন্যা হয় না? আর বন্যা হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাপনা ছাড়া কী করা হয়?

করলা ও তিস্তা ছাড়াও শহর ও জেলা জলপাইগুড়ির অন্য যে নদীগুলো আছে তার প্রতিও তো সীমাহীন উদাসীনতা দেখা যায়। প্রশাসন ও সরকারের এই মনোভাবের বদল দরকার। বদল দরকার জলপাইগুড়ির নদীপ্রেমী মানুষের চিন্তাভাবনারও দরকার। দরকার একটা জোরদার নদী ও পরিবেশ আন্দোলনের। গুটিকয়েক নয় অনেকের অংশগ্রহণ দরকার। নদীর জন্য যে প্রশ্নাতীত আবেগ আছে জলপাইগুড়িবাসীর তা বুকের ভিতর থেকে বাইরে আনার প্রয়োজন। এই লকডাউন নদীগুলির একটু ভাল করলেও নদীর ও নিজেদের চিরস্থায়ী ভাল করতে নদীর অধিকারকে সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। করতেই হবে। কোনও বিকল্প নেই।

এমনি বরষা ছিল সেদিন

দেবায়ন চৌধুরী

আমাদের পাড়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বৃষ্টি হবেই। সে রবীন্দ্রজয়ন্তী হোক কিংবা বিজয়া সম্মিলনী। এমনিতে অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম ডিসেম্বরের শেষেই হয়। একবার ধানবাড়ির মাঠে ইয়াব্বড়ো স্টেজ করা হয়েছে। চারদিন ধরে চলছে সমস্ত প্রতিযোগিতা। বসে আঁকো, আবৃত্তি, আচ্ছা বলোতো, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, ছড়ার গান, নজরুল নৃত্য আরো কত কিছু। শেষের দিন পাড়ার বড়োদের নাটক। পুরস্কার বিতরণী শেষ হতেই কথা নেই বার্তা নেই কোত্থেকে মেঘের দল হুড়মুড় করে শুরু করে দিল জলঝারি। আনন্দ ধরে না। মাইকম্যান তার খুলছে, ত্রিপল ফুটো হয়ে জল পড়ছে অস্থায়ি গ্রীনরুমের ভেতর। চিত্রগুপ্তের মেকআপ ধুয়ে জল। এদিকে সব দেখেশুনে বিধাতার পার্ট করা বুড়োদা সাইডে গিয়ে বিড়িতে সুখটান দিচ্ছে। দর্শকদের নাজেহাল অবস্থা। নরম মাটি ভিজে পুরো কাদা। শাড়ি তুলতে গেলে বাচ্চা কোল থেকে ছেঁচড়ে নেমে যাচ্ছে, ড্রেন পার হতে গিয়ে আদুরে তনুদি ধপাস করে পড়ে গেল। আর তাকে তুলতে গিয়ে যেই না পচাকাকা

উদ্যত হয়েছে, উদ্ধারকর্তাই স্বয়ং নেপাল চপ্পল পিছলে হাফশয্যা নিল রাস্তায়। টর্চের কী যে হল, মনিবের হাত আলগা হতেই সে ভেসে গেল জলের তোড়ে। এদিকে ড্রেন ক্রমশ ভরে উঠছে জলে। নয়ানজুলিরও নদী হতে সাধ হয়...

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কেসি পালই ভরসা। পাড়ায় সংস্কৃতিপ্রবণ মানুষেরা সেবার ঠিক করল বৃষ্টি যখন আস্য হয়ে গেছেই, তখন এবারের প্রোগ্রাম বর্ষাকালেই হবে। তবে তাই হোক। একটা রিস্ক নিলে ক্ষতি কি? না হয় ছ-মাস পরে আবার কিছু করা যাবে। শীতের হাওয়ায় নাচন লাগবে যখন।

আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ বলে মাইকিং করে চলি এপাড়া ওপাড়া। ফেরার পথে কালীপদ জেঠুর দোকান থেকে পরোটা ও শুকনো তরকারি। তারপর রাতের দিকে নাটকের রিহার্সাল, গীতি-আলেখ্য। আচ্ছা, এবার একটু কলেজের কথায় আসি।

(২)

সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছি সবে। রাজার আমলে প্রতিষ্ঠিত কলেজটি ছবির মতো সুন্দর। টিনের চাল দেওয়া পুরনো ঘরগুলিতে আমাদের ক্লাস হয়। ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা ভালো হয়েছে। রেজাল্ট আউট হয় নি। এদিকে জুনিয়ররা আসতে চলেছে। কাজকর্ম নেই কিছু। কলেজে ঘুরে আসি নিয়মিত। ফর্ম ফিলাপের দিনগুলিতে হেল্প ডেস্কের ব্যবস্থা করা হয়েছে ছাত্রসংসদের পক্ষ থেকে। তার একটি টেবিলের দায়িত্বে আমি। বেশ ইয়ো ইয়ো ব্যাপার। হাসি আনন্দে দিন কেটে যায়। সময় অগাধ, জীবনের সাধও নেহাত মন্দ নয়।

কবিতা ভালবাসি। তবলা বাজাই। আমাদের গানের দল ইদানীং বেশ নামডাক করেছে শহরে। একটু আধটু ব্যস্ততা থাকেই। অর্ক নতুন গান লিখলেই স্বপ্নিলদা ক্যান্টিনে চলে আসে। চা আর চপের ধোঁয়ার মধ্যেই টুংটাং ব্যস্ততা। সুর ওঠে। টেবিলের বেঞ্চি ড্রাম হয়ে যায়। এইসব দৃশ্যে যা হয় অবধারিতভাবে নায়িকার প্রবেশ।

আমার জীবনেও প্রেম এসেছিল বইকি। তবে নিঃশব্দ চরণে নয়। অভাবিত জনসমক্ষে।

আমাদের পাশের পাড়া ইংরেজির। ডিপার্টমেন্টগুলোকে আমরা নিজেদের মধ্যে পাড়াই বলতাম। বসে আছি মাঠে। একটি মেয়েকে বেশ মনে ধরল। পাসের ক্লাসে দু-একদিন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বুঝলাম ক্লাস মিথ্যা, ক্রাশ সত্য। কী আশ্চর্য মেয়েরা যে কিছু না দেখেই সব বুঝে যায় তা জানতাম নাকি? ভয়ের চোটে যে আমি কথা বলতে পারি না, তাকে কিনা প্রেম প্রস্তাব দিল মেয়েটি। এও সম্ভব? কলেজ সোস্যালে একটি ইভেন্টের শেষ পর্বে প্রোপোজপর্ব ছিল। আমি বেশ দর্শকাসনে বসে আছি। আকস্মিকের খেলায় হৃদি আঙুল দিয়ে দেখাল— আমি ওকে ডাকতে চাই। আমার ঘোর কাটছিল না কিছুতেই। আশপাশে তাকালাম। দেখি সবাই আমার দিকে চেয়ে হাততালি দিচ্ছে। আমার ভেতর ততক্ষণে ফাঁকা হয়ে গেছে। জলপিপাসা পাচ্ছে। বন্ধুরা প্রায় ঠেলেই স্টেজে তুলে দিল আমায়। আমি ভ্যাবলার মতো গোলাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছি। আর মাইকে ঘোষণা হচ্ছে এই ইভেন্টে প্রথম হয়েছে...

(৩)

হৃদি বসু স্টেজ থেকে নেমেই আমাকে বলেছিল, অত ঘাবড়ে গেলে হবে? লুকিয়ে দেখার সময় মনে ছিল না? আমি না আর হ্যাঁ-র মাঝে উত্তর দেওয়ার বৃথা চেষ্টার মধ্যেই আবার কথার ফুলঝুরি, আমি তুমি তুমি করতে পারি না। তুই চলবে? আমার মাথা আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল না বলাই চলে। সারাজীবন বয়েজ স্কুলে কাটানো আমি ঘটনার ঘনঘটায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কানের পাশে চুল আটকে রাখতে রাখতে হৃদি বলল আমার খিদে পেয়েছে। চল খেতে যাই। কলেজ থেকে বেরোনোর সময় নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করছিলাম। কনে দেখা আলোয় দেখলাম মেয়েটি আমার সাইকেলে হাত রেখেছে!

এই শান্ত মফস্‌সলের ধুলোর মধ্যে আনন্দ

আছে। আর হাওয়ার মধ্যে মনকেমন। আমরা কেউই পাসের সব ক্লাস করতাম না। বেলা একটার মধ্যে অনার্সের ক্লাস শেষ করেই আড্ডা। কখনো কাছের নির্জন মন্দিরের চাতাল। আবার কখনো দিঘির সিঁড়িতে। আমি শুধু দেখেই যেতাম। হৃদি কথা বলতে খুব ভালবাসত। জলের দিকে ঢিল ছুঁড়ে দিয়ে ব্যাগটা নিয়ে পড়িমরি করে বলে উঠত চললাম। প্রেমে পড়লে মানুষ শুধু অন্ধ নয়, বধিরও হয়ে যায়। আমি শুনতে পাই নি ভেবে একদিন কান মুলে দিয়েছিল আমায়। সেই প্রথম স্পর্শ। ভালোবাসার মধ্যে শাসন টের পেতাম প্রতি মুহূর্তেই। মেয়েদের মধ্যে যে একটি সংশোধন প্রকল্প থাকে সেই বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল দীপঙ্করদা। অবশ্য ততদিনে একটি ঘটনা ঘটে গেছে।

(৪)

প্রিয় বন্ধু,

এই চিঠিটা যখন পড়বি, আমি তখন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে চড়ে কলকাতা পৌঁছে গেছি। ওখানে একটা কলেজে ভূগোল নিয়ে পড়ব। আগাম জানিয়ে দেব বৃষ্টি কবে আসবে। এই কয়েকটা দিন স্বপ্নের মতো কেটে গেল রে। নিজের খেয়াল রাখিস। আর হ্যাঁ, গীতবিতানের যে পৃষ্ঠা খুলবি সেখানেই দেখবি তোর মনখারাপের সমস্ত উত্তর...

হৃদি

ঝুলনের হাতে চিঠিটা পেয়ে যখন পড়ছিলাম, মাথা ঘুরছিল। মনের সঙ্গে মগজের সম্পর্ক এই প্রথম বুঝলাম জীবনে। ওর মোবাইল নট রিচেবল। অনন্তবার চেষ্টা করে বিফল আমি নিজেও বদলে ফেলেছিলাম দশ সংখ্যা। যোগাযোগ করতে চাই নি আর। যে দূরে যেতে চায়, তাকে পিছু ডাকতে নেই।

(৫)

গল্প গুটিয়ে নেওয়া যাক এবারে। বছর ঘুরেছে প্রায়। মনকে লাগাম পরিয়েছি কিছুটা। পড়াশুনো, বন্ধুমহল সব মিলে উড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। ক্লাবে বর্ষামঙ্গলের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। আমাদের ক্লাবের সংস্কৃতিচর্চার ধারাটিকে টিকিয়ে রাখতে প্রাণপাত করছি।

নীহারকাকু একদিন ডেকে বলল আমি একজনকে আসতে বলেছি কাল। তুই থাকবি। তোকে দরকার। আমি যথারীতি কাকুদের বড়ো ঘরে অপেক্ষা করছি। নীলের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি। এমন সময় দেখি...

যদি চোখ থেকে নামে জল/ মিশে যায় তুলোট বালিশে/ আমার ওষ্ঠ রুমাল তো ছিল/ চোখে চোখ স্নেহের নালিশে... ডায়ারির পাতাগুলো হৃদিকে এগিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। যেখানে লিখেছিলাম কীভাবে আগলে রাখি বৃষ্টিদিন/ মনে যখন মেঘ করেছে ঝড়বাদল/ ছুঁতে চাইছি তোর বুকেরই সেফটিপিন/ রক্তপাতে খেলব হোলি সঙ্গে চল।

রিহার্সালে কী হয়েছিল মনে রাখি নি। যন্ত্রের মতো পড়ে গিয়েছিলাম ভাষ্য। খোলের আওয়াজের ভেতর দিয়ে শুনতে পাচ্ছিলাম মেঘের ডাক।

আলেখ্য শেষ। সবাই উঠি উঠি করছে। হঠাৎ কাকু বলল— তুই ওকে এগিয়ে দিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি। বৃষ্টি নামতে পারে।

আমরা হেঁটে যাচ্ছিলাম। হৃদি বলছিল ওর ফিরে আসার কাহিনি। আবার এই শহরের কলেজে বাংলা নিয়ে ভর্তির খবর। আমি ওর চলে যাওয়া নিয়ে একটি কথাও বলি নি। কেবল শুনছিলাম। এমন সময় সমস্ত অভিমানের মেঘ যেন ভেঙে পড়ল মাথার ওপর। হৃদি চটজলদি ছাতা বের করে আমাকেও টেনে নিল এক আকাশের নিচে। চেপে ধরল হাত। ওর গায়ের গন্ধে মিশে যাচ্ছিল জলের মন। বৃষ্টিভেজা রাস্তায় পথচলতি গাড়ির আলোয় লেখা হচ্ছিল ফিরে আসার গান। ব্যাগের ভেতর গীতবিতান তখন বুঝি মুচকি হাসছে!

পুনশ্চ: আমাদের ক্লাবের অনুষ্ঠানে সেই থেকে আজ অব্দি আর কোনোবার বৃষ্টি হয় নি।

একমুঠো বকুল

দেবপ্রিয়া সরকার

"Heard melodies are sweet– but those unheard / Are sweeter."

গমগমে কণ্ঠস্বরে জন কিটসের বিখ্যাত লাইনটা উচ্চারণ করতেই প্রচণ্ড শব্দ করে বাজ পড়ল একটা।

আজ সকাল থেকে মেঘে ঢেকে আছে চারপাশ। মাঝে মাঝেই হচ্ছে বৃষ্টি। কখনো হালকা, কখনো একটু ভারি। দুপুরের দিকে বৃষ্টিটা একটু ধরায় পদ্মপর্ণা ছুটে এসেছে কলেজে। এস কে এম স্যারের কিটসের ওপর লেকচার মিস করা যাবে না

কোনোভাবেই। শ্যামলকান্তি মিত্র ইউনিভার্সিটির রিটায়ার্ড প্রফেসর। ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর অগাধ জ্ঞান। প্রিন্সিপ্যাল স্যারের অনুরোধে সপ্তাহে দু'দিন করে গেস্ট লেকচারার হিসেবে ক্লাস নিতে আসেন পদ্মপর্ণাদের কলেজে। তাই আজ কলেজ কামাই করা জাস্ট ইম্পসিবল।

সাড়ে তিনটের একটু পরপরই শুরু হয়েছিল ক্লাস। ততক্ষণে মেঘ আরও ঘন হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে শহরটার মাথার ওপর কেউ যেন উল্টে দিয়েছে একটা কালির দোয়াত। দূরের ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি চলে গিয়েছে অনেকেই। কলেজ বেশ ফাঁকা ফাঁকা। শুধু পদ্মপর্ণাদের ঘরেই একটু যা ভিড়।

বাজের শব্দে চমকে উঠল সকলে। একটু থমকালেন শ্যামলকান্তিও। জানালের বাইরে তেড়েফুঁড়ে নেমেছে আষাঢ়। মাঝ বিকেলেই গোধূলির অন্ধকারে ঢেকেছে চারদিক। অভিজ্ঞ চোখে ছাত্রছাত্রীদের খানিক জরিপ করলেন শ্যামলকান্তি। উশখুশ করছে প্রত্যেকে। চোখেমুখে অস্থিরতা। হয়তো ভাবলেন এমন দামাল আবহাওয়ায় এই টগবগে তরুণদের কিটসের কাব্য প্রতিভার বিশ্লেষণ শোনান একেবারেই অযৌক্তিক। এই বয়স তাঁরও ছিল একদিন। মুখে একটা স্মিত ভাব এনে স্যার বললেন,

—বাইরে আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। আজ থাক, পরের ক্লাসে আমরা আবার আলোচনা করব কিটস নিয়ে।

স্যার বেরিয়ে যেতেই সকলে এসে দাঁড়াল করিডোরে। খাঁ খাঁ করছে পুরো ক্যাম্পাস। শুধু তাদের ক্লাসের জনা তিরিশেক ছেলেমেয়ে জটলা পাকিয়ে আছে রুমের বাইরে। এই বৃষ্টির মধ্যেই কেউ কেউ ছাতা নিয়ে, রেনকোট পরে রওনা দিল অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়।

—এই পর্ণা বেরবি এখন?

মনমিতা পাশ থেকে জিজ্ঞেস করল।

—এখন! দাঁড়া বৃষ্টিটা ধরুক একটু। পুরো ভিজে যাব তো।

—ধুস! তুই না একদম বোরিং। এই বৃষ্টিতেই তো মজা। ভিজতে ভাল লাগে না তোর?

মনমিতার দিকে বড়বড় চোখে তাকাল পদ্মপর্ণা। বলল,

—না রে আমার ঠান্ডার ধাত। এই বৃষ্টিতে ভিজলে আর দেখতে হবে না। মা-ও রাগ করবে ভীষণ।

—তুই তাহলে বসে বসে বৃষ্টি থামার অপেক্ষা কর, আমরা চলি।

পদ্মপর্ণার দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই হৈ হৈ করতে করতে ছাতা নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে নেমে গেল মনমিতা সহ পাঁচ ছ'জন। ধীরে ধীরে কমে আসছে বন্ধুদের সংখ্যা। এদিকে বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণই নেই। জল জমেছে ক্যাম্পাসের চাতালে। বৃষ্টির ছাটে ভিজে যাচ্ছে করিডোর।

অঝোর বৃষ্টির দিকে একমনে তাকিয়ে আছে পদ্মপর্ণা। সবুজ মাঠ, ছোটবড় গাছপালা, ঘোলাটে হয়ে আছে সবকিছু। একটা অবুঝ মনখারাপ দলা পাকিয়ে উঠছিল গলার কাছটায়। বাবা-মা-ভাই, সুন্দর গোছানো বাড়ি, অজস্র বন্ধুবান্ধব সবই আছে পদ্মপর্ণার। তবুও কী একটা যেন নেই। সেই অজানা, অদেখা জিনিসটার জন্যে মাঝে মাঝেই মনটা অস্থির হয়ে ওঠে তার। বিশেষ করে বৃষ্টি,

অঝোর বৃষ্টির দিকে একমনে তাকিয়ে আছে পদ্মপর্ণা। সবুজ মাঠ, ছোটবড় গাছপালা, ঘোলাটে হয়ে আছে সবকিছু। একটা অবুঝ মনখারাপ দলা পাকিয়ে উঠছিল গলার কাছটায়। বাবা-মা-ভাই, সুন্দর গোছানো বাড়ি, অজস্র বন্ধুবান্ধব সবই আছে পদ্মপর্ণার। তবুও কী একটা যেন নেই। সেই অজানা, অদেখা জিনিসটার জন্যে মাঝে মাঝেই মনটা অস্থির হয়ে ওঠে তার।

কুয়াশা, একলা পড়ে থাকা নদী এসব দেখলেই মনের ভেতর ঢেউ তোলে সেই অভাববোধ। আজও ঝাপসা হয়ে আসছিল চোখের দৃষ্টি। মনে হচ্ছিল তার বুকের ভেতর জমাট বাঁধা মনখারাপই বোধ হয় ঝরে পড়ছে বৃষ্টি হয়ে।

—কী ভাবছিস তখন থেকে? পাক্কা তিন মিনিট হল তোর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু ম্যাডামের কোনও হুঁশই নেই!

আচমকা মায়াঙ্ককে দেখে থতমত খেয়ে গেল পদ্মপর্ণা। কালো ট্রাউজারের ওপর হালকা হলুদ চেক শার্ট পরেছে মায়াঙ্ক। উসকোখুসকো চুলে লেগে আছে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি। দু' হাতের অঞ্জলিতে কতগুলো বকুলফুল।

—তুমি কলেজে!

—আর বলিস না! অন্য ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে গেলে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দরকার। সেটার বিষয়েই খোঁজ নিতে এসেছিলাম।

—তুমি চান্স পেয়ে গেলে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে?

—হ্যাঁ রে। পেয়েই গেলাম লাকিলি। দেখি কতদূর টানতে পারি। জানিসই তো আমাদের পারিবারিক ব্যবসা আছে। একদিন না একদিন সেটার হাল আমাকেই ধরতে হবে। তবুও চেষ্টা করছি পড়াশুনাটা চালিয়ে যাওয়ার।

—বাহ! খুব ভাল। কিন্তু তোমার হাতে এগুলো কী?

—সাইকেল স্ট্যান্ডের পাশে বকুল গাছটায় এই বর্ষাতেও ঝেঁপে ফুল ফুটেছে। বৃষ্টির থেকে বাঁচার জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বকুল আমার খুব পছন্দের। তাই কুড়িয়ে ফেললাম।

—আমারও বকুল খুব ভাল লাগে। কী সুন্দর গন্ধ না?

—তুই নিবি এগুলো?

—দেবে?

হাত বাড়িয়ে মায়াঙ্কের কাছ থেকে ফুলগুলো নিয়ে নাকের কাছে আনল পদ্মপর্ণা। বকুলের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে মিশেছিল মায়াঙ্কের হাতের পুরুষালি ঘ্রাণ। দমকা হাওয়ার সঙ্গে ছুটে আসা বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজে যাচ্ছিল ওরা। তাই একটা ফাঁকা ক্লাসরুমের ভেতর ঢুকে পড়ল দু'জনে। ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ, মেঘের দ্রিমিদ্রিমি গর্জন আর ব্যাঙের উদাত্ত কণ্ঠ মিলেমিশে তৈরি হয়েছে এক মায়াবী সিম্ফনি।

পদ্মপর্ণার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে সুঠাম চেহারার মায়াঙ্ক। তার বুকের ভেতরে যেন হাতুড়ি পিটছে কেউ। চুপি চুপি দেখছে মায়াঙ্ককে। কেবলই মনে হচ্ছে আজ আর নিস্তার নেই। মায়াঙ্কের ওই গভীর চোখদুটোতে এক্ষুনি ডুবে যাবে সে। লুটিয়ে পড়বে তার প্রশস্ত বুকে। একঝাঁক রঙিন প্রজাপতি যেন উড়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে।

বারান্দায় দাঁড়ান পদ্মপর্ণার অস্থির দুটো চোখ ঘুরপাক খাচ্ছে নীরবে ভিজতে থাকা গন্ধরাজ, কৃষ্ণচূড়া, জারুল, বকুলের ওপর। তার শ্বশুরমশাই নিজে হাতে লাগিয়ে ছিলেন এদের। বিকেলের মেঘলা আলোয় একটা দুধ সাদা রঙের দামি গাড়িকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখে ঘরে চলে গেল পদ্মপর্ণা। একটু পরে বিহানের ডাকে বৈঠকখানায় এসে হকচকিয়ে গেল একদম। মায়াঙ্ককে এতদিন পর এভাবে দেখবে একটুও আশা করে নি সে। শুনেছিল মায়াঙ্ক এখন বড় বিজনেসম্যান। বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে চেহারায়।

এইমাত্র একটা বাঁধ ভেঙেছে মায়াঙ্কের মনের ভেতরেও। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া থেকে প্রাণপণ বাঁচাবার চেষ্টা করছে নিজেকে। দৃষ্টি স্থির দূরের কদমগাছটার ওপর। পদ্মপর্ণার দিকে না তাকিয়েও তাকেই দেখছে মায়াঙ্ক।

****

—মা, আগরওয়ালের সঙ্গে ডিলটা কমপ্লিট করে ফেললাম। ছ'লাখ ক্যাশ আর একটা থ্রি বিএইচকে ফ্ল্যাট দেবে আমাদের। খারাপ হবে না, কী বলো? এতবড় বাড়ির মেইনটেন্যান্স ভীষণ শক্ত আজকের দিনে।

খোলা জানালার বাইরে মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে ছিল পদ্মপর্ণা। বলল,

—তোরা যেটা ভাল বুঝিস কর। আমার আপত্তির কিছু নেই। শুধু খারাপ লাগছে এটা ভেবে যে তোর দাদাই, ঠাম্মি, বাবা সকলের স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই বাড়ির সঙ্গে।

—সে ঠিক আছে। কিন্তু একটু প্র্যাক্টিক্যালি ভাবো মা। এতগুলো টাকা একসঙ্গে পেলে খুব উপকার হবে। মাথা গোঁজার জায়গারও অভাব থাকবে না। জাগৃতি, কুট্টুস, তুমি, আমি সকলেই হাত পা ছড়িয়ে থাকতে পারব। সিকিউরিটিরও ব্যাপার আছে।

—আমার ভাবনা নিয়ে তোর অতো মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। যেটা করলে সকলের মঙ্গল সেটাই করবি।

প্রসন্ন মুখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বিহান বলল,

—মিস্টার আগরওয়াল আজ একবার আসবেন এখানে। নিজে চোখে দেখে যাবেন বাড়ির হাল হকিকত। একটু আপ্যায়নের ব্যবস্থা রেখো। জাগৃতি থাকছে না, কোথায় যেন নেমন্তন্ন আছে।

একটা শ্বাস গোপন করে মাথা নাড়ল পদ্মপর্ণা।

দুপুরের পর থেকেই গাঢ় হয়ে এসেছে মেঘ। বৃষ্টিও হচ্ছে টুকটাক। বারান্দায় দাঁড়ান পদ্মপর্ণার অস্থির দুটো চোখ ঘুরপাক খাচ্ছে নীরবে ভিজতে থাকা গন্ধরাজ, কৃষ্ণচূড়া, জারুল, বকুলের ওপর। তার শ্বশুরমশাই নিজে হাতে লাগিয়ে ছিলেন এদের। বিকেলের মেঘলা আলোয় একটা দুধ সাদা রঙের দামি গাড়িকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখে ঘরে চলে গেল পদ্মপর্ণা। একটু পরে বিহানের ডাকে বৈঠকখানায় এসে হকচকিয়ে গেল একদম। মায়াঙ্ককে এতদিন পর এভাবে দেখবে একটুও আশা করে নি সে। শুনেছিল মায়াঙ্ক এখন বড় বিজনেসম্যান। বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে চেহারায়।

কলেজের সেই ছিপছিপে মেয়েটা, বন্ধু অর্জুনের বোন মনমিতার ক্লাসমেট পদ্মপর্ণাকে বরাবর ভাল লাগত মায়াঙ্কের। কিন্তু চক্রবর্তী আর আগরওয়ালের মধ্যে যে মুখ হাঁ করা গিরিখাতটা রয়েছে তাকে ডিঙিয়ে যাবার সাহস তার সেদিনও ছিল না, আজও নেই। বলল,

—এটা তোর বাড়ি? জানতাম না তো?

—তুমি! এত বছর পর? সেই যে মাইগ্রেশন নিয়ে পালালে আর তো দেখাই পেলাম না!

—অর্জুনের কাছে শুনেছিলাম কলেজে পড়তে পড়তেই খুব ভাল বিয়ে হয়েছে তোর। আমিও ব্যস্ত ছিলাম কাজে কম্মে তাই আর দেখা হয় নি।

মাড়োয়ারি মায়াঙ্কের মুখে বাংলাটা বড্ড মিষ্টি শোনায় আগাগোড়া। লাজুক হাসি ছড়িয়ে আছে দুজনের মুখে। বিহান অবাক চোখে দেখছে তাদের। বাইরে বৃষ্টির তেজ বাড়ল খানিকটা। ভেজা বাতাস হুড়হুড় করে ঢুকছে ঘরে। মায়াঙ্ক চেয়ার ছেড়ে পদ্মপর্ণার সামনে এসে দাঁড়াল। কৌতুক মাখা স্বরে বলল,

—বলতো আমার হাতে কী আছে?

—কী?

মুঠো খুলে হাতটা পদ্মপর্ণার দিকে এগিয়ে দিল মায়াঙ্ক।

—ও মা, বকুলফুল!

—তোর বাগান থেকে কুড়িয়ে আনলাম। মনে আছে কলেজের সেই দিনটার কথা? এমনই বর্ষা ছিল সেদিন আর বকুল এনেছিলাম হাতে করে। হিস্ট্রি রিপিটস ইট সেলফ! অদ্ভুত না? নিবি এগুলো?

—দেবে?

হাসিমুখে মায়াঙ্কের হাত থেকে ফুলগুলো নিয়ে নাকের কাছে ধরল পদ্মপর্ণা। সেই হাতুড়ি পেটার শব্দটা আচমকাই শুরু হল বুকের ভেতরে। পদ্মপর্ণার দিকে না তাকিয়েও আজও তাকেই দেখছে মায়াঙ্ক।

গল্প

কোনো একদিন

শাঁওলি দে

(১)

বিকেল থেকে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। মাঝেমাঝেই বিদ্যুতের চমক ও মেঘের গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠছে জানালাগুলো। পাহাড় অঞ্চলে আঁধার নামে তাড়াতাড়ি। সন্ধে সাতটাতেই মনে হচ্ছে মধ্যরাত।

দার্জিলিঙ থেকে কিছু দূরের এক পাহাড়ি গ্রাম মাঙ্গওয়া। শান্ত সমাহিত এক গ্রাম, নিরিবিলিও। এখনও সেভাবে ভ্রমণপিপাসুরা এখানে এসে পৌঁছায় নি। এখানকারই একমাত্র রিসর্টে উঠেছে ওরা। একপাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা তো অন্য পাশে নাথুলা রেঞ্জের অভিনব সহাবস্থান। এহান ও রৈনী নেট ঘেঁটে খুঁজে বের করেছিল এই অপূর্ব ‘ডেস্টিনেশন’। হানিমুনের জন্য এমন জায়গাই তো মনে মনে চাইছিল ওরা।

রিসর্টের ঘরে বসে বৃষ্টিপড়া দেখছিল সদ্যবিবাহিত দুই প্রেমিক ও প্রেমিকা। প্রচণ্ড জোরে মেঘের ডাক কানে আসতেই এহানের হাতটা শক্ত করে ধরল রৈনী। এহান হাসল। এই আলো আঁধারের খেলাতেই তা দিব্য টের পেল রৈনী। বলল, হাসলে যে?

এহান বলল, এখনো এত ভয়?

রৈনী বলল, ভয় পেলে কী করব বলো?

এহান আরও খানিকটা শক্ত করে রৈনীর হাতটা

ধরে বলল, ম্যায় হু না!

এবার রৈনী হেসে ফেলল। তারপর এহানের কাঁধের ওপর নিজের মাথাটা হেলান দিয়ে আরাম করে বসল। দুজনের মাঝে অদ্ভুত এক নীরবতা, অথচ কত কথাই না বলা হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি পলে অনুপলে। এহানের আঙুল জড়িয়ে ধরল রৈনীর আঙুলগুলোকে। দু'হাতের দশটা আঙুল পরস্পরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছিল গভীর আশ্লেষে। বৃষ্টির ঝরঝর শব্দে মনে হল যেন মুক্তো ঝরছে চতুর্দিকে। বিদ্যুতের চমকের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে নেমে আসছে অপরূপ এক মায়াবী আলো।

এই মায়াময় মুহূর্তের নৈঃশব্দ্যেকে ভেঙে দিয়ে এহান বলে উঠল, তোমার আমাদের প্রথম দেখা হওয়ার দিনটার কথা মনে পড়ে?

মনে আবার থাকবে না, আজও মনে হয় এইতো সেদিনের কথা! রৈনী বলল।

তখন আমি কলেজের ফার্স্ট ইয়ার আর তুমি উচ্চমাধ্যমিক দেবে। নোট জেরস্ক করতে গিয়েছিলে আমাদের পাড়ার টিপলুদার দোকানে। বিরাট এক পিঠব্যাগ থেকে ইয়ামোটা একখানা বই বের করেছিলে, এহান বলে।

হ্যাঁ, ফিজিক্সের বই, মল্লিকস্যার দিয়েছিলেন কয়েক ঘণ্টার জন্য, সেদিনই ফেরত দিতে হবে সেই শর্তে, রৈনী থামে, তারপর কয়েক মুহূর্ত পর বলে, সেদিনও এমন মুষলে বৃষ্টি হচ্ছিল, মনে আছে তোমার?

ওরে বাবা, মনে আছে আছে, আমরা বন্ধুরা ওখানে আড্ডা মারতাম। সবে সিগারেট খাওয়া শুরু করেছি তখন, যেই একটা ধরাতে যাব ওমনি দেখি ফ্রক পরা একটা বাচ্চা মেয়ে কাকভেজা অবস্থায় এসে দাঁড়ালো একদম আমার সামনে। পিঠের ব্যাগটাতো ওর চাইতেও বেশি ওজনের।

অন্ধকারেই মুখ ভেঙালো রৈনী, ইস মোটেও অত ভারি ছিল না, দুটো মোটামোটা বই ছিল এই যা। আর ওটাকে ফ্রক বলে না মশাই, স্কার্ট বলে। বুদ্ধুরাম! এহানের হাতে একটা চিমটি কাটে রৈনী।

আমি তো অবাক, অত বাচ্চা মেয়ে আবার ফিজিক্স পড়ে! এর তো সেভেন এইটে পড়ার কথা! এহানের গলায় ছদ্ম গাম্ভীর্য।

ও ও, সেজন্য বুঝি ওই বাচ্চা মেয়েটার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে ছিলে? রৈনী কাঁধে মাথা রেখেই এহানের বাহু জড়িয়ে ধরে বসে।

সে কি আর সাধে দেখছিলাম, মেয়েটা তো আর কাউকে প্রশ্ন না করে আমাকেই জিজ্ঞেস করে বসল, আপনার এখানে জেরক্স কত করে?

কী করতাম আর? এক্কেবারে দোকানের ভেতরে জেরক্স মেশিনের সামনে বসেছিলে তুমি, পরে তো শুনেছি তোমার বন্ধুরা তোমায় খুব খ্যাপাত, তাই না? রৈনী কথা শেষ করে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

হ্যাঁ, কারো জেরক্স করার দরকার পড়লেই বলত, আপনার এখানে জেরক্স কত করে? এবার দুজনেই সশব্দে হেসে ওঠে। বাইরে অবিরাম বৃষ্টির আওয়াজের সঙ্গে দুই প্রেমিক প্রেমিকার হাসিও মিলেমিশে গিয়ে এই পাহাড়ি গ্রামে অদ্ভুত এক অনুরণন তোলে।

হাসি থামলে জানালার পাশ থেকে উঠে গিয়ে ফ্লাস্ক থেকে গরম গরম কফি ঢালে রৈনী, তারপর একটা কাপ এগিয়ে দেয় এহানের দিকে। ঝমঝম বৃষ্টির দমক এখন অনেকটাই কমে এসেছে, ঝিরিঝিরি বৃষ্টির গুঁড়ো গুঁড়ো ফোঁটা কাচের জানালায় এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। হালকা নীলাভ আলো জ্বলছে ঘরে। এহান পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে গান চালিয়ে দেয়।

"রিমঝিম এই ধারাতে, চায় মন হারাতে", গানটা শুরু হতেই রৈনী বলে ওঠে, হিন্দী গান চালাও না, আওগে যব তুম সজনা, অঙ্গনা ফুলফিলেঙ্গে, বরষেগা শাবন... নিজেই গুনগুন করে ওঠে ও।

এহান ঘোর লাগা গলায় বলে, তুমিই গাও না, কী ভালো গাও! ওই যে তখন ড্রাইভ করে আসার পথে গাইছিলে, তোমার গলায় অদ্ভুত মাদকতা আছে। আমার মত বেসুরোরও গলা মেলাতে ইচ্ছে করে।

ধুত, ইচ্ছে করছে না। কেমন ভয়ভয় করছে আমার। রৈনী বলে ওঠে।

ভয়? আমি আছি তো। এখন শুধু প্রাণভরে বাঁচার পালা, বুঝলে? এহানের গলায় প্রতিশ্রুতি।

ওর কথা শুনে কেমন একটা স্বপ্নালু চোখে তাকায় রৈনী, তারপর বলে, এই স্বপ্নের মতো আমাদের বেঁচে থাকা সব মিথ্যে হয়ে যাবে না তো?

এহান সশব্দে হাসে, বলে ওঠে, আমি আছি তো, আমি করব তোমার সব স্বপ্নপূরণ।

জানি, তবু কেন এত ভয় করে কে জানে? রৈনী এহানের হাত দুটো খামচে ধরে বলে।

এহান মাথায় হাত বুলিয়ে ভরসা দেয় রৈনীকে, কিন্তু নিজে কি আশ্বস্ত হয় আদৌ?

(২)

গল্পে, আদরে, খুনসুটিতে কখন রাত বাড়তে থাকে টেরই পায় না এহান ও রৈনী। চমক ভাঙে দরজার কড়া নাড়ার শব্দে। এহান শশব্যস্ত হয়ে ওঠে, বেয়ারা এসেছে হয়ত রাতের খাবার দিয়ে যেতে, তেমনই কথা ছিল। মোবাইল জ্বেলে সময় বোঝার চেষ্টা করল ও। ন'টা বেজে গিয়েছে।

গরম গরম রুটি, মুরগীর পাতলা ঝোল আর কালো জিরে দিয়ে মোটামোটা আলুভাজা সহকারে ডিনারটা ভালোই হয় ওদের। এদিকে বৃষ্টি থামার নাম নেই। রৈনী আক্ষেপ করে, ভাবলাম একটু বের হব, রাতে পাহাড়ি অঞ্চলে হাঁটার মজাই আলাদা।

আগে খুব হেঁটেছ মনে হচ্ছে। সেই তো নাকি পাহাড়ে এসেছিল ক্লাস ফোরে পড়তে, নাক দিয়ে দুধ পড়ত তখন, এহান ব্যঙ্গ করে বলে।

হুহ্, আসি নি তো কী, কারো কাছে কি শুনিও নি? সবসময় আমাকে নিয়ে মজা না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। রৈনী ঘুষি মারার ইঙ্গিত করে এহানকে।

এহান পাত্তা না দিয়ে বলে, চিন্তা করো না, ঠিক পাহাড়ের রাস্তায় রাতের বেলা হেঁটে যাব আমরা, হাত ধরাধরি করে, ঠিক এমনিভাবে। রৈনীর হাত ধরে এহান।

রৈনী গভীরভাবে জড়িয়ে ধরে এহানকে। বলে, উফ! এত উত্তেজনা তোমার হাত ধরে চলে আসার সময়ও হয়নি।

এহান হেসে বলে, বলছ?

রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বৃষ্টির দমক। মনে হচ্ছে আকাশের সব জল বুঝি আজই শেষ হয়ে যাবে। তার সঙ্গে তো মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের ঝলকানি আছেই। এমন অদিনে এইরকম আবহাওয়ায় এহান আর রৈনীর মনে হয় ওরাই হয়ত এই পৃথিবীর শেষ নরনারী, আর কোথাও কেউ নেই।

আরও একবার ডাকার পরও যখন সাড়া মেলে না দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েন তারা। যা আশঙ্কা করছিলেন ঠিক তাই। বিছানার ওপর শুয়ে আছে গতকাল বিকেলে আসা কাপল। পাশে একটা খোলা ডায়েরির পাতাগুলো পতপত করে উড়ছে বাতাসে। একটু ঝুঁকে পড়ার চেষ্টা করলেন তিনি। বাঙলাটা ভালোই পড়তে পারেন বলে অসুবিধা হল না।

গল্পের মাঝে এহান বলে, তুমি একটু ঘরে থাকো, আমি একটা টান দিয়ে আসি, হাতে ধরা সিগারেটটা দেখায় ও, তোমার তো আবার গন্ধে সমস্যা হয়।

ছেড়েই দাও ওটা, কী এমন সুখ ওই টানে? রৈনী আবদারের গলায় বলে। ওর কথা শেষ হতে না হতেই নীল বাতিটা নিভে যায় হঠাৎ করে। চারিদিকে এখন মিশকালো অন্ধকার। যেন মনে হচ্ছে কে যেন এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর যাবতীয় আলো। এহান বলে, কী ব্যাপার ইনভার্টার

নেই নাকি!

বিরক্ত হয় রৈনীও, বলে কী জায়গা রে বাবা! এমন অন্ধকার আগে দেখি নি। উফ! পকেট থেকে লাইটারটা বের করে জ্বালায় এহান। আলোর শিখা দপ করে জ্বলে উঠতেই এহান চমকে ওঠে। রৈনী কোথায়? এই তো এতক্ষণ হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল ওর। লাইটারের লেলিহান শিখাটা এদিক ওদিক ঘুরিয়েও রৈনীকে খুঁজে পায় না ও, ভয়ে চিৎকার করে ওঠে এহান, রৈনী...

কিন্তু ওই মিশকালো অন্ধকারের একা ঘরে ওর আর্তি গুমরে গুমরে ওঠে।

(৩)

কলেজের বিরাট করিডোরের এক কোণায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল এহান। দূর থেকে রৈনীকে আসতে দেখেই জ্বলন্ত আগুনের কাঠিটা পা দিয়ে পিষে দিল ও। দেখতে পেলেই বকবক শুরু করবে। বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে আসছিল রৈনী। এহানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাসল একটু। তারপর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোরা এগো, আমি আসছি।

বন্ধুরা এগিয়ে যেতেই রৈনী এহানকে চাপাস্বরে বলল, কাল একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, জানো তো?

কী স্বপ্ন? এহান জানতে চায়। রৈনী একটু চুপ করে থেকে বলে, আমি আর তুমি হনিমুনে গেছি। কোথায় বলো তো? মাঙ্গওয়া রিসর্টে, যেটা সেদিন গুগলে দেখছিলাম। খুব বৃষ্টি পড়ছিল জানো, আমরা জানালার ধারে বসে বৃষ্টি দেখছিলাম। তুমি আমায় গান করতে বললে।

এহান অবাক গলায় প্রশ্ন করে, তারপর?

তারপর ডিনার শেষে তুমি যখন সিগারেট খেতে বাইরে যেতে চাইলে ওমনি কারেন্ট চলে গেল। আমি মোমবাতি জ্বালালাম। ব্যস, তারপর আর তুমি নেই কোথাও। আমি চিৎকার করে তোমায় ডাকলাম, জানো? কিন্তু...

আর আমায় পেলে না, তাই তো? এহান হাসে। কিন্তু গলার থেকে বিস্ময়ের ভাবটা যায় না।

বলে, যদি বলি আমিও এই একই স্বপ্ন দেখেছি কাল, বিশ্বাস করবে?

রৈনী একটু জোরেই বলে, মানে?

হ্যাঁ, একই স্বপ্ন। শুধু শেষটায় আমার বদলে তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে, আর আমি চিৎকার করে ডাকছিলাম তোমায়।

রৈনী বিরাট হা করে। অবাক গলায় বলে, এও সম্ভব?

(৪)

বার চারেক দরজার কড়া নাড়ে মনোজ থাপা, রিসর্টের মালিক। খাবার দিতে এসে ছেলেটি ঘুরে গেছে কয়েকবার। ওপাশ থেকে কেউ দরজা তো খোলেই নি, সাড়াও মেলে নি কোনো। এইজন্য এইসব কমবয়সী ছেলেমেয়েদের ঘর দিতে চান না তিনি, কিন্তু কী করবেন আর, ভ্যালিড কাগজপত্র থাকলে আর কিছুই করার থাকে না।

আরও একবার ডাকার পরও যখন সাড়া মেলে না দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েন তারা। যা আশঙ্কা করছিলেন ঠিক তাই। বিছানার ওপর শুয়ে আছে গতকাল বিকেলে আসা কাপল। পাশে একটা খোলা ডায়েরির পাতাগুলো পতপত করে উড়ছে বাতাসে। একটু ঝুঁকে পড়ার চেষ্টা করলেন তিনি। বাঙলাটা ভালোই পড়তে পারেন বলে অসুবিধা হল না।

সোফার ওপর ধপ করে বসে পড়লেন মনোজ থাপা। এমন প্রেমও হয়। এ যে স্বর্গীয়! ডায়েরির পাতাগুলো উল্টাতে লাগলেন তিনি, পড়ে ফেললেন এহান ও রৈনীর স্বপ্নের কথা। হঠাৎই মনে হল, কাল রাতটাও তো ছিল ওই স্বপ্নেরই মতো। তবে কি একে অন্যকে হারিয়ে ফেলার ভয়েই নিজেদের একসঙ্গে শেষ করে দিল ওরা?

এর উত্তর ওই ডায়েরির পাতায় নেই। মনোজ থাপা চোখ বন্ধ করলেন। বাইরে ঝমঝম করে আবার বৃষ্টি শুরু হল, মনোজের মন হল কারা যেন ওপর থেকে অসংখ্য পারিজাত ছড়িয়ে দিল এহান ও রৈনীর শরীরের ওপর।

গল্প

পেস্তা রঙের তোয়ালে

হিমি মিত্র রায়

বাইরের ঘরে ব্যস্ততার শেষ নেই। মা, মাসি মিনতিদি সবাই মিলে ইন্টেরিয়ার ডিজাইনার-এর ভূমিকা বিগত তিন চারদিন ধরে পালন করে আসছে। আজ বাবা হাত মিলিয়েছে। পেছনে হাত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত পায়চারি করছে আর ঘর গোছানোর বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকলেও ভুলভাল সাজেশন দিচ্ছে মা-দের।

মা 'তুমি চুপ করো না' আর 'তুমি এর মধ্যে নাক গলিও না' বলতে বলতে ক্লান্ত। কিন্তু বাবার হেলদোল নেই, তাও পায়চারি চলছে তো চলছেই।

মাসি মাকে বলল, "দিদিভাই তুই এদিকটা দেখ আমি বাকি রান্নাটা সেরে ফেলি। মিনতি তুমি আমার সঙ্গে এসো, এদিকটা ও দেখে নেবে।"

পাশের ঘরে রাইমা চুপ করে পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে চলছে বাইরের কান্ড। মুখের ভাবটা অদ্ভুত, না হাসি না দুঃখ। ওর নিজের ঘরে কোনার টেবিলে পাতাবাহারের গোছাটা ও নিজেই বাগান থেকে তুলে এনেছে আজ সকালে। বিছানার চাদরটা পাল্টেছে নিজেই। হলুদ-এর জায়গায় গোলাপি সাদা জয়পুরি প্রিন্টের পিওর কটন চাদরটা পেতেছে, সঙ্গে ম্যাচিং পিলো কভার। জানালার পর্দাগুলো সরিয়ে এক সাইডে বেঁধে রেখেছে গোল রিং দিয়ে। সকাল থেকেই ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, কখনো বাড়ছে কমছে। ওদের জানলার সঙ্গে লাগোয়া কমলা রঙের বোগেনভেলিয়া গাছটা ভিজে আরো সুন্দর হয়ে গেছে দেখতে, ঝকঝক করছে কমলা রং। তার থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে অনবরত। ভেজা মাটির গন্ধটাও ভুরভুর করে ঘরে ঢুকছে অনেকদিন পর।

তিন বছর পর আজ অরিত্র আসবে রাইমার কাছে। চাকরি নিয়ে জার্মানি চলে গেছিল তখন। বড় এক ওষুধ কোম্পানির সাইন্টিস্ট এখন অরিত্র। রাইমা একটা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে সদ্য চাকরি পেয়েছে। আদ্যোপান্ত বাঙালি রাইমা। ছোটবেলায় একসাথেই বড় হয়েছে অরিত্র আর রাইমা, একই পাড়ায়। একসঙ্গে খেলাধুলো, নাটক, পাড়ার ফাংশন। রাইমা ওর মনের কথাটা এখনও অরিত্রকে

বলে উঠতে পারে নি। তবে অরি-র মনে ওর জন্য ভাল লাগা দেখেছে ও। যদিও ও কিছুই বলেনি রাইমাকে।

সেকি। তুই এখনো বাড়ির ড্রেস-এই রয়েছিস! শিগগিরই রেডি হ, অরিত্রর মা ফোন করেছিল, ওরা রওনা দিয়েছে বাগডোগরা থেকে। ফোন করেছিল মাঝরাস্তায়।

আয়নায় নিজেকে দেখে রাইমা। বেগুনি রংয়ের একটা লিনেন পরেছে ও। হালকা গোলাপি লিপগ্লস আর কাজলের মৃদু ছোঁয়া। আয়নার সামনে টুলে বসে থাকে বেশ অনেকক্ষণ। কীসের ভয় যেন ঘিরে থাকে ওকে অবিরত। বাইরের আওয়াজে বুঝতে পারে যে ওরা চলে এসেছে।

হৃদপিন্ডের আওয়াজটা বড্ড দ্রুত হয়ে যায় রাইমার। চোখ বুজে ফেলে। শেষ ওকে দেখেছিল সেদিন, যেদিন ও জার্মানি চলে যায়। তারপর আর দেখে নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় নেই অরিত্র, হোয়াটসঅ্যাপে টুকটাক কথা। একটু শান্ত প্রকৃতির বরাবরই ছিল আগেও, খুব বেশি বহিঃপ্রকাশ ছিল না কখনোই।

দরজায় ঠক ঠক হয়, রাইমা ঘুরে তাকায়। শাড়ির আঁচল ঠিক করে নিয়ে দরজা খুলে দিল ও। হাসিমুখে দাঁড়ানো মাসি, আর পেছনে দাঁড়িয়ে অরিত্র।

হৃদপিন্ডের গতিটা ক্রমাগত কানে এসে বাজছে ওর।

—তোরা কথা বল নিজের মত, পরে আমরা কথা বলবো কেমন?

—যাও তো অরিত্র, আজকে ঘর থেকে বেরোয় নি একবারও মেয়ে। দেখো তুমি পারো কিনা বের করতে।

দরজাটা ভেজিয়ে একটা হাসি দিয়ে হুশ করে চলে গেল মাসি।

—মে আই?

বড্ড ফর্মাল, এখনও আগের মতোই।

রাইমাও ফর্মাল হয়ে বলল, প্লিজ কাম।

একটা গ্রে কালারের টি শার্ট আর ব্লু জিন্সে আগের অরিত্র একটু অন্যরকম। সবসময় ক্যাজুয়াল থাকা পাজামা পাঞ্জাবিতে স্বচ্ছন্দ কম কথা বলা অরিত্র অন্য রূপে। বিদেশি ছাপ পড়েছে। ঘরে ঢুকতেই বিদেশি পারফিউমের হালকা সুবাস নাকে এসে লাগলো। টি-শার্টের ঘাড়ের দিকে হালকা বৃষ্টির ছিটে। হয়ত গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে ভিজেছে। মাথার চুলেও ভেজা ভাব। চশমাটা হাতে ধরা, বৃষ্টির ছিটে লেগেছে ওটাতেও।

রাইমা ড্রয়ার খুলে একটা রুমাল বের করে দিল অরিত্রকে, চশমাটা মোছার জন্য।

হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে রুমালটা নিল ও। তারপর ধীরে ধীরে চশমার কাচ মুছতে মুছতে বলল, বসতে পারি?

বিরক্তিকর! এত ফরমালিটি কী আছে বুঝতে পারছে না ও।

—হ্যাঁ।

বাইরের বৃষ্টিটা আরো জোরে ঝাঁপিয়ে নামলো। দুজনেই জানলার দিকে একবার তাকালো তারপর চোখে চোখ পড়ায় রাইমা মুখ নামিয়ে নিল।

পরিবেশটা স্বাভাবিক করার জন্য রাইমা বললো, রাস্তায় কোনো অসুবিধা হয় নি তো?

মাথা দুদিকে ঝাঁকালো অরিত্র। এটুকু কথা খরচ করলে মনে হয় অনেক কষ্ট হত।

—কত দিনের জন্য আসা হল?

—টুয়েন্টি ফাইভ ডে'জ।

—গুড।

অরিত্রর ফোনে রিং হয়, ফোনটা ধরে ওকে ইশারায় বলে, ওয়ান মিনিট প্লিজ।

তারপর ফোন কানে দিয়ে জানালার পাশে চলে যায় ও। ইংরেজিতে গরগর করে অফিসের কথা বলতে থাকে। রাইমা কিছুক্ষণ ওর দিকে ঘুরে দেখতে দেখতে তারপর মুখ ঘুরিয়ে ফেলে।

বাইরের ঘরে হাসাহাসি পর্ব চলেই যাচ্ছে। ভেতরে কী হচ্ছে তা নিয়ে বোধহয় খুব রসালো আলোচনা চলছে দু-বাড়ির মধ্যে। হাসির দমকে সেটাই প্রমাণিত। এদিকে রাইমার ভেতরে কী হচ্ছে

সেটা কি কেউ জানে?

কত কথা মনে আসে পরপর রাইমার। একবার নাটক করতে গিয়ে স্টেজ ভেঙে পড়ে জঘন্য অবস্থা। রাইমা গিয়ে পড়েছিল একদম অরিত্রর ঘাড়ের উপর। সবাই খুব হাসাহাসি করেছিল দেখে। চোট লাগে নি কারোরই অবশ্য। ছোট থেকেই অরিত্র খুব চুপচাপ, এক্সপ্রেশন কম। যে কোনো কিছুতেই। পরীক্ষায় যখন খুব ভালো রেজাল্ট করতো তখনও কোনো উচ্ছ্বাস নেই, যেন এটা হওয়ারই ছিল। এই যে এত বছর দেখা-সাক্ষাৎ নেই তার জন্য সেই আর্জ টা দেখা যাচ্ছে না। জার্মান সুন্দরীদের দেখেও যে ওর খুব একটা হেলদোল হবে সেটা নিয়েও সন্দেহ আছে রাইমার। কেমন যেন একটা ছেলে!

—এটা একবার পরবি?

হকচকিয়ে যায় রাইমা, পেছনে ঘোরে। কখন কথা শেষ করে অরিত্র ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করে নি। উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে ও। খুব কাছে অরিত্র।

হাতে ধরে থাকা একটা টেরাকোটার কানের দুল এগিয়ে দেয় রাইমাকে।

রাইমা অবাক হয়ে যায়। হাতে নিয়ে বলে, এটা কী?

—ও দেশে একটা মেলায় এসেছিল। সেখানে শান্তিনিকেতনের থেকে একটি স্টল ছিল। খুব পছন্দ হল এটা তোর জন্য, পরবি? ন... না পছন্দ হলে থাক...

রাইমা হেসে ফেলে।

—এত ভয় আমাকে?

ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকে অরিত্র।

—ভয়? কী... কীসের?

—এত বড় একজন সাইন্টিস্ট সামান্য একটি সাধারণ মেয়ের কাছে এসে তোতলাচ্ছে? ও দেশে সুন্দরী জার্মান মেয়েদেরকে প্রপোজ করার সময় কি সে তোতলাতো?

আকাশ থেকে পড়ার মত অবাক হয় ও, কিছু বলার পায় না। হা করে থাকে মুখটা।

—বিশ্বাস কর আমার তেমন কিছু নেই

—তাই? প্রমাণ দে তবে!

—কীভাবে প্রমাণ দেব?

—আমি জানি না, তুই জানিস। তিন বছর পরে এসে কী করে বুঝবো যে তুই স্বচ্ছ আছিস?

খুব নার্ভাস হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে বেচারা।

—যদি প্রমাণ দিতে না পারি তবে কি আমাকে আমাকে...

—আমাকে কি?

মাথা নিচু করে অরিত্র।

—বল, আমাকে কি?

—আমাকে...

মাথা নীচু করে ফ্যালে অরিত্র।

—গাধাই রয়ে গেলি, মস্ত একটা গাধা।

ফিক করে হেসে দেয় রাইমা।

—আয়, এখানে বোস, ঠান্ডা লেগে যাবে।

বিছানায় বসিয়ে রাইমা ওর তোয়ালেটা দিয়ে অরিত্রর মাথাটা মুছতে থাকে বকবক করতে করতে।

অরিত্র চুপ করে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে, রাইমার পেস্তা রঙের তোয়ালেটা টেনে নিয়ে নাকের কাছে এনে চোখ বন্ধ করে বলে, "আমার সঙ্গে জার্মানি যাবি তো, রাই?"

—তুই জিজ্ঞেস করলি না তো আমি স্বচ্ছ আছি কিনা!

—অরিত্র হাসে, তাচ্ছিল্যের হাসি। যেন ওকে ছাড়া কাউকেই ভালবাসতে পারে না রাইমা।

রাইমার কোমর জড়িয়ে ধরতে যায় অরিত্র, দু হাত দিয়ে।

এক ঝটকায় সরে যায় রাইমা।

পেছনে যেতে যেতে বলে, "অনেক দেরি করে ফেলেছিস, আমি ট্রান্সপারেন্ট নেই... কেউ ছুঁয়ে দিয়েছে আমাকে, হৃদয়ের অনেক গভীরে... আর বের হওয়ার স্কোপ নেই...

কাছেই কোথাও একটা জোরে বাজ পড়ে... ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির শব্দ শোনা যায় শুধু, আর মাঝে মাঝে দুটো দ্রুত হৃৎস্পন্দন।

গল্প

রবীন্দ্রনাথের পাঞ্জাবি

রঙ্গন রায়

'তুই একটা ল্যাদারু!' রিতা আমার দিকে তাকিয়ে কথাটা বললো।

তিস্তার ধারে যে নতুন দোতলা চায়ের কেবিনটা খুলেছে আমরা, মানে আমি আর সুচরিতা এখন তারই একটা টেবিলে বসে আছি। বেচারির পিতৃদত্ত নামটা অনেক বড়। অত বড় নাম উচ্চারণ করতে করতে প্রেম করার সময় কমে আসে। আমি ওটা রিতা করে নিয়েছি। তাছাড়া ওকে দেখতেও রিতা হেওয়ার্থের মতই সুন্দর। যদিও আমি এখন ওরই শশাঙ্ক জেলে কয়েদ। রিডেম্পশনের খুব একটা ইচ্ছে নেই।

'ল্যাদারু মানে?'

আমার অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে রিতা বললো, 'যে মদ খায় সে মদারু আর যে ল্যাদ খায় সে ল্যাদারু।'

'আমি ল্যাদ খাই?' আমি আরও অবাক হয়ে গেলাম।

রিতার কাছে কোনো কথা মাটিতে পড়ে না। সে বললো, 'নয়তো কী! আমি এখানে সাড়ে পাঁচটায় এসে দাঁড়িয়ে আছি। আর বাবু এলেন পাক্কা

ছটায়! আর কালকে ফেলুদার মত বল্লি, আমার কাছে সাড়ে পাঁচটা মানে সাড়ে পাঁচটাই! হুহ্'

আমাকে ভেঙিয়ে যখন রিতা কথা বলে তখন আমার ভীষণ ভালো লাগে।

'বাজে কথা বলিস না। আমি মোটেই ফেলুদা নই। ফেলুদা হতেও চাই না।'

'ওমা! কেন? প্রত্যেকটা ছেলেকেই তো আজকাল ফেলুদা আর ব্যোমকেশের মত স্টাইল মারতে দেখি!

'ব্যোমকেশ ঠিক আছে, কিন্তু ফেলুদা—'

রিতা অধীর হয়ে বললো, 'কী ফেলুদা কী?'

'ফেলুদা সিঙ্গেল ছিল।'

ওয়েটার এসে দাঁড়িয়েছে। রিতা ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'দুটো বিগ টি আর এক প্লেট পকোড়া।'

বিগ টি মানে পঁচিশ টাকার চা। এখানে এটাই সবচেয়ে দামী চা। তবে খেতে সত্যিই বিগ বি!

চা আসতে আসতে রিতার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করাবো? রিতার সৌন্দর্যের ডিটেইল বর্ণনা কিন্তু রিতা হেওয়ার্থ নামের মধ্যেই আছে। এর বেশি কিছু বলা যাবে না। ওর সঙ্গে পরিচয়ের ঘটনাটা বলা যেতে পারে।

সেই যেদিন হেমন্তের দুখু বাতাস বয়ে যাচ্ছিলো শহরের ওপর দিয়ে, যেদিন আমি টিউশন ফাঁকি দিয়ে নাটক দেখতে চলে গিয়েছিলাম একাই, যেদিন রবীন্দ্র ভবনের সামনে করলা নদীর তীরে সুচরিতা ওর কান থেকে খুলে পড়া দুল খুঁজছিল, সেদিন। সেদিনই ব্যোমকেশের মত সত্যান্বেষণ থুরি স্বর্ণান্বেষণ করে ওর সাথে আলাপ করে ফেলেছিলাম। তারপর, যেভাবে গল্প এগোয় সেভাবেই এগিয়ে গেলো আমাদের গল্প।

ওয়েটার চা রেখে যাওয়া মাত্র রিতা ওর ভ্যানিটিব্যাগ থেকে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করে টেবিলে রাখলো। আমি রিতার দিকে তাকালাম। রিতার চোখে রহস্য ভরা হাসি। তারপর বললো, 'এটা খুলে দেখুন ল্যাদারু বক্সী।'

আমি ব্যাগটা খুলতেই বেরিয়ে এলো চমৎকার মেরুন রঙের একটা পাঞ্জাবি। তাতে ফেব্রিকের কাজ করা রবীন্দ্রনাথ।

'আজ তো আমার জন্মদিন না, এবং আমাদের সম্পর্কেরও জন্মদিন না! তাহলে—'

'তাহলে আমি এমনি দিতে পারি না?' ছদ্ম অভিমান নিয়ে রিতা বললো।

রিতার ছদ্ম অভিমানের দিকে তাকিয়ে আমার মুখে হাসি খেলে গেলো। আমি জানালা দিয়ে তিস্তার আকাশে তাকালাম। তুষারের মত নরম সন্ধ্যা নামছে জলপাইগুড়িতে। রিতা আমার দিকে তাকিয়ে এবার আলতো ভাবে বললো, 'পছন্দ হয়েছে?'

আমি জানতাম ও কিছুদিন আগে বোলপুর গেছিলো। দুদিন আগেই ফিরেছে। কিন্তু আমার পাঞ্জাবির সাইজ ও জানলো কী করে? কোনোদিন তো জানতে চায় নি?

'যদি বলি হয় নি?'

রিতা সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত থেকে প্যাকেটটা কেড়ে নিয়ে সূচের মত বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বললো, 'তা হবে কেন? আমার তো কোনো কিছুই তোর ভালো লাগে না।'

আমি জানি আমাদের চা জুড়িয়ে যাচ্ছে কথায় কথায়।

তবুও কাব্যি করে বললাম, 'রাগিয়ে দিয়ে রাগ ভাঙালে জলপাইগুড়ি সুইজারল্যান্ড হয়ে যায়!'

'থাক!' ঝাঁঝিয়ে উঠলো রিতা। 'সুইজারল্যান্ড দরকার নেই। তাছাড়া ওটা এখন পলিটিক্যাল শব্দ।'

'উফ, রাজনীতির জ্বালায় দেখছি শান্তি মত প্রেম কবিতা কোনোটাই করতে দেবে না এরা!'

আমার বিরক্তিতে খিল খিল করে হঠাৎ হেসে উঠলো রিতা। ওর এই বেশিক্ষণ রেগে থাকতে না পারার জন্যই তো ওকে রাগাই।

'এই পাঞ্জাবিতে তোকে ভীষণ মানাবে। আমি এইজন্যই কিনেছি। এটা আমার এক ঝলক দেখেই পছন্দ হয়ে গেছিল। আমি মনে মনে দেখতে পাচ্ছিলাম এটা তুই পরে আছিস।'

২

রেডটা কাকার বেসে আছে এখন। কাকা ভালোবেসে স্ট্রাইক করলো।

'এরাম!!!!'

কাকা এমনভাবে আর্তনাদ করে উঠলো যেন এনআরসি-তে কাকার নাম বাদ পড়ে গেছে।

'কাকা! এটা কী করলি তুই? ফেলতে তো পারলিই না উল্টে ওটা বক্সীর হাতেও দিয়ে দিলি!' ম্যাঙ্গোর চিৎকারটা জায়েজ। আমার দলে কাকা থাকলে আমিও এটাই করতাম। তবে এখন আমার খুশি হওয়া দরকার। রেডটা এবার আমার বেসে

রিতা হেওয়ার্থ আমাকে যা অভিজ্ঞতা দিয়ে গেছে তাতে এই গল্পটাকে আর মিষ্টি প্রেমের গল্প বলা যায় না। আমার মতে প্রেম জিনিসটা মোটেই মিষ্টি নয়। যাদের সুগার আছে তারা সবাই প্রেম করতে শুরু করলে আমি শিওর ডাক্তারদের ভাত মারা যাবে। কাজেই এই গল্পটাকে এখন তেতো প্রেমের গল্প বা ঝাল প্রেমের গল্প পাঠক বলতেই পারে।

চলে এসেছে। এখন আমার ভালোবাসার সময়।

ছুটির দিনগুলোয় আমরা ক্যারাম খেলি। ম্যাঙ্গো আমি কাকা আর বাতু। কাকা আসলে কারোর কাকা নয়। বরং ভাস্তা। তবে ওর ডাকনাম কেন কাকা হল তা গড নোজ। আর বাতু নামটা বাতকর্ম থেকে যে আসেনি সেটা জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। ওর ভালো নাম বাৎসায়ন। তবে ও কোনোওদিন কামসূত্র পড়ে নি।

আমাদের সবার বাড়িই একই পাড়ায়। এখন আমরা বাতুর বাড়ির ছাদে আছি। এখান থেকে অনুর বাড়ির ছাদ দেখা যায়। ম্যাঙ্গো এইজন্যই বাতুর বাড়ি তাড়াতাড়ি চলে আসে। যদিও অনু জানে না ম্যাঙ্গো তার পেছনে ইট পেতেছে। আবার জানতেও পারে। মেয়েরা নাকি এসব খুব তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলতে পারে। ওদের সিক্সথ সেন্স ভালো। রিতা এগুলো বলতো।

রিতা!

কতদিন দেখি নি তাকে! তার দেওয়া পাঞ্জাবিটাও পরা হয়নি আমার। রিতা হেওয়ার্থ আমাকে শশাঙ্ক থেকে রিডেম্পশন দিয়ে চলে গেছে। চলে গেছে পৃথিবীর অন্য পারে। হ্যাঁ অন্য পারেই।

ও চাকরি পেয়েছে ব্যাঙ্গালোরের একটা কলেজে। মাস কমিউনিকেশনের লেকচারার। যেদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলো সেদিন আমার চেয়ে বেশি খুশি কেউ হয় নি। আমার বরাবরের ইচ্ছে ছিল ওর মত বিদূষী মেয়ের বড় চাকরি হওয়া প্রয়োজন। এবং সেটাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। আমি ওকে সবসময় ইয়ার্কি মেরে বলতাম এই যুগে যেখানে ছেলেরা চাকরি পাচ্ছে না, সেখানে তোদের মেয়েদেরই উচিৎ ছেলেদের দায়িত্ব নেওয়া। তবেই না জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি! সবসময় ছেলেরা চাকরি করবে আর মেয়েরা হাউজ ওয়াইফ থাকবে এই কনসেপ্টকে বদলানো দরকার। আমি আর তুই এটা বদলাতে পারি!

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়ার দিনও এটাই বলেছিলাম মজা করে।

কিন্তু সেদিন প্রথম রিতা বড় হয়ে গেছিলো। চাকরি পেলে সবাই বড় হয়ে যায়। সেদিন প্রথম ওর মত প্রাণবন্ত মেয়ের মুখে এই কথার প্রতিবাদ শুনেছিলাম।

'তার মানে তুই বলতে চাইছিস যে আমি চাকরি পেলাম মানে তোর আর চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে না? আমার ঘাড়ে বসে গিলবি বিয়ে করে!'

আমার বুকে ধক করে লেগেছিল কথাটা। আমি এটা ওকে মজা করেই তো বলেছি। এত সিরিয়াসলি নেওয়ার কী আছে?

'রিতা, ইয়ার্কি কেও তুই আজকাল—'

‘এটা ইয়ার্কি নয়। আমাদের ব্রেন ইয়ার্কি বোঝে না। সে যা চায় তাইই বলে দেয়। কথাটাকে ইয়ার্কি দিয়ে মেকআপ করার চেষ্টা করিস না পুচু!’

আমি স্তব্ধ হয়ে গেছিলাম। ভীষণ ভীষণ অপমানে আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিলো।

‘আমি ব্যাঙ্গালোর চলে যাচ্ছি। আমাদের মাঝে অনেক দূরত্ব তৈরি হয়ে যাবে এখন। আর দূরত্ব বাড়লে যোগাযোগ কমে আসে আস্তে আস্তে। অনেক দেখেছি এরকম। তোর সাথে আর এই সম্পর্কটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আমি তোর মত ঘরজামাই মেন্টালিটির লোকের সাথে থাকতেও পারবো না।’

কথাগুলো সূচের মত আমার শরীরে গেঁথে গেছিলো সেদিন। ওর দেওয়া পাঞ্জাবিটা আমি এয়ারপোর্টে সি অফ করতে যাওয়ার দিন পরবো ঠিক করেছিলাম। পরা হলো না। আর একটাও কথা না বলে ফিরে এসেছিলাম আমি।

‘আরে হাতের রেডটা মিস করলি তুইও? কাকা এত বড় একটা সুযোগ দিলো আর তুহ—’

বাতু রেগে গেছে আমার ওপর। লাল গুটি ফেলে বেশি পয়েন্ট একবারে পেতে গিয়ে দেখেছি অন্য গুটিও ফেলা হয় না।

আমার আর খেলতে ইচ্ছা করছিলো না। রিতার কথা মনে পড়ে সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম ও হয়তো পরে ফোনে বা হোয়াটস অ্যাপে আমাকে বলবে কথাগুলো রাগের মাথায় বলে ফেলেছিল। কিন্তু ও চলে যাওয়ার পর একটাও ফোন বা মেসেজ আসে নি আমার কাছে।

সত্যিই কি দূরত্ব বাড়ে যোগাযোগ নিভে যায়?

৩

রবীন্দ্রনাথের পাঞ্জাবিটা আজ পরে গেলাম। পরতে তো হবেই জিনিসটা। ফেলে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া আজকের দিনটার সঙ্গে পাঞ্জাবিটা যায়ও ভালো। কারণ আজ ২৫শে বৈশাখ। বেশ একটা নজর কাড়া যাবে কলেজে।

কলেজে কেন যাচ্ছি সেটা বলে নেওয়া দরকার। বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র এবং তরুণ কবি হিসেবে কবিতা পাঠের জন্য ডাক পেয়েছি। পেমেন্ট পাবো শুনেই রাজি হয়েছিলাম।

রিতা হেওয়ার্থ আমাকে যা অভিজ্ঞতা দিয়ে গেছে তাতে এই গল্পটাকে আর মিষ্টি প্রেমের গল্প বলা যায় না। আমার মতে প্রেম জিনিসটা মোটেই মিষ্টি নয়। যাদের সুগার আছে তারা সবাই প্রেম করতে শুরু করলে আমি শিওর ডাক্তারদের ভাত মারা যাবে। কাজেই এই গল্পটাকে এখন তেতো প্রেমের গল্প বা ঝাল প্রেমের গল্প পাঠক বলতেই পারে।

আমি যখন কবিতা পড়তে উঠলাম তখন দেখি ম্যাঙ্গোও এসে দর্শকাসনে বসে আছে। পাশে অনু। তার মানে ওদের প্রেম বেশ চুটিয়ে এগোচ্ছে। ম্যাঙ্গো আমার দিকে থামস আপ দেখালো। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কবিতা পড়তে শুরু করে দিলাম আমি।

আমার কবিতায় দেখেছি ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি আকৃষ্ট হয়। আর এখানে বছরের নির্দিষ্ট কয়েকটা দিন শাড়ি পরা মেয়েরাই ভর্তি। হাত তালির ঝড় উঠতেই নিজেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ মনে হতে লাগলো।

স্টেজ থেকে নেমে যখন নিজের বসার আসনে ফিরবো তখনই দেখা হয়ে গেলো ওর সাথে। দেখা হলো ঠিক এক বছর পাঁচ মাস ছ'দিন পর।

৪

আমার দেওয়া পাঞ্জাবিটা ওকে দারুণ মানিয়েছে। আমি জানতাম। যখন দোকানে ঝুলতে দেখেছিলাম তখনই ওর শরীর ওতে ভেসে উঠেছিল।

এই এক বছরে পুচুর লেখা অনেক ম্যাচিউর হয়েছে। ও জানে না আমি এখানে ট্রান্সফার নিয়ে কালই এসেছি। ও জানবেই বা কী করে? আমি কি জানিয়েছি? আমি তো স্বার্থপর! ভীষণ ভীষণ স্বার্থপর। আমার ইগো আমাকে ধ্বংস করে দেবে। ধ্বংস করে দাও আমায় যদি চাও, আমার সন্ততি

সুস্থ থাক। হ্যাঁ, পুচুকে তো আমি সন্তানের মতই ভালোবাসতাম। ও তো ছোট আমার থেকে।

সব গল্প এক দিক থেকে পড়লে হয় না। দ্বিতীয় দিক থেকেও পড়া দরকার। সব গল্পের দুটো তিনটে দিক থাকে। এই গল্পেরও আছে। আমি সুচরিতা সান্যাল, প্রণয় বক্সী মানে আমার পুচুকে ডাম্প করেছি।

আমার বাড়ি থেকে ছোট একটা ছেলেকে আমার স্বামীর স্থানে মেনে নেবে না বলেই করেছি। আমার কিছু করার ছিল না। এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় আমার কি ইচ্ছে করে নি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই! সবাই প্রিয়ঙ্কা চোপড়া হতে পারে না। সবার ফ্যামিলি তা মেনে নেয়ও না। পুচুর সঙ্গে সম্পর্কটা আমার চাকরি পাওয়ার দিনই আমি বাড়িতে বলে দিই, আর তাতেই সব কিছুর সূত্রপাত।

জেন্ডার ইক্যুইলিটির তত্ত্ব নিয়ে ও যা মজা করে বলতো, আমি সেটাই করবো ভেবেছিলাম। পুচু হল ল্যাদারু বক্সী। ওকে কি আমি কাজ করতে দিতেও পারতাম! নাহ, কথাগুলো এখন ভীষণ আদেখলামোর মত মনে হচ্ছে না?

আমি আমার মা বাবার কথার অমান্য হতে পারি নি। অথচ এই যুক্তিতে ওকে জীবন থেকে সরালে সব দোষ আমার ঘাড়েই এসে পড়বে। কারণ আমিই ওকে প্রিয়ঙ্কা চোপড়া আর নিক জোনাসের উদাহরণ দিতাম। সৌভাগ্যবশত ও সেদিনই জেন্ডার ইকুয়ালিটির প্রসঙ্গটা তোলে। ওরও যে এই সম্পর্কটা ভাঙার পেছনে হাত আছে সেটাই প্রমাণ করাতে চাইলো আমার ইগো।

কিন্তু ও কি সত্যিই সরে গেছে? এই তো ও এখন আমার দিকেই হেঁটে আসছে। আমাকে দেখতেও পেয়েছে ও। সঞ্চালক কী প্রশংসা করছে ওর! কত বড় কবি হয়ে গেছে পুচুটা।

রবীন্দ্রনাথের পাঞ্জাবি গায়ে ধীরে ধীরে হেঁটে এসে আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই পেরিয়ে গেলো পাশ কাটিয়ে। ওই লম্বা মত শাড়ি পরা মেয়েটার পাশে গিয়ে বসলো। মেয়েটার চোখে মুখে কী অদ্ভুত আলো! দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা পুচুকে খুব পছন্দ করে। ওর পাশে বসাতে ও ধন্য হয়ে গেছে।

আমার বুকে ছোট্ট একটা পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। হিংসে হচ্ছে। খুব।

পুচু হঠাৎ উঠে এলো আবার। আমার কাছে এসে একটা কাগজের চিরকুট দিয়ে ফিরে গেলো নিজের জায়গায়।

চিরকুটটা খুললাম।

'রিতা হেওয়ার্থ, জেন্ডার ইকুয়ালিটি মানে দুজনেই সমান। তুই আমার সমান ছিলিস না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পাঞ্জাবিটা একদম আমার সমান হয়েছে। তাই পাঞ্জাবিটাই শুধু থাকলো।' পাশে একটা স্মাইলিও আঁকা।

চশমা পরা ফরসা একটা ছেলে গিটার নিয়ে স্টেজে গান গাইতে উঠলো। এই কলেজেই পড়ে নিশ্চয়ই। তার গিটারের প্রথম ঝঙ্কার আমার বুকে খামচে ধরা কষ্টের মত এসে ঠেকলো। রাগিয়ে রাগ ভাঙালে জলপাইগুড়ি সুইজারল্যান্ড হয়ে যায়। আর কোনোদিন জলপাইগুড়ি সুইজারল্যান্ড হতে পারবে না।

পুচুকে ভীষণ ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে আমার। ওকে আমি আর কোনোদিন জড়িয়ে ধরতে পারবো না। কারণ আমিই ওকে নিজের ছোট গন্ডির থেকে দূরে বের করে দিয়েছি। আমি ওকে রবীন্দ্রনাথের পাঞ্জাবি দিয়ে দিয়েছি। আমাকে তো কাদম্বরী হতেই হবে।

ছেলেটা রবীন্দ্রনাথের বদলে তার নিজের লেখা একটা গান গেয়ে উঠলো—

'যদি কখনো যাই ভেসে যাই, আমায় নিও তুলে
ভাসিয়ে দিও আবার যেমন, কুড়িয়ে নিয়েছিলে।'

(ফেব্রিকের কাজ করা রবীন্দ্রনাথের পাঞ্জাবি ও চশমা পরা ফরসা ছেলেটির গান বাদ দিয়ে বাকি সব কিছু কাল্পনিক)

* * * *

বীরপাড়া: এক টুকরো সবুজ ভারত

এই ডুয়ার্স কি তোমার চেনা?

শৌভিক রায়

বীরপিয়া কে? সে কি সত্যিই বীরের পিয়া? তাহলে সেই বীর-ই বা কে?

উত্তর খুঁজুক সন্ধানী গবেষক। ওসব থেকে থাকি দূরে।

শুনেছি এই ছোট্ট নদীর নামে জায়গাটির নাম হয়েছে বীরপাড়া। পিয়া থেকে 'পাড়া' হতেই পারে... সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকমুখে কত শব্দই তো পালটে যায়! তবে বীর যখন আগে আছে, তখন ভাবনা আসে যে, নির্ঘাৎ এমন কোনও চরিত্র ছিল যার নামটি ছিল বীর অথবা স্বভাবে ছিল বীরত্ব। হয়ত ছিল তার কোনও প্রেয়সী। রূপসী কোনও নারী। দু'জনে মিলেমিশে হয়েছিল তাই বীরপিয়া। আবার আলাদা আলাদাভাবে বীর ও পিয়া... দুটি সরল নদী একসাথে মিশে যদি হয়ে যায় বীরপিয়া, তবে তো কথাই নেই! কেননা নদী মানেই তো মিলন। নদী মানেই বয়ে চলার অনন্ত ইতিহাস। সেই ইতিহাসে রয়ে যায় ভাঙনের পাশাপাশি গড়ার কথা। আর সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে ডুয়ার্সের ছোট্ট শহর, বীরপাড়া। তবে আয়তনে ছোট হলে হবে কী, এই শহরের গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। অবশ্য নামকরণের ইতিহাস এখানেই থেমে নেই।

সাঁওতাল ভাষা বলছে যে, 'বীর' শব্দটির অর্থ অরণ্য। ডুয়ার্সের এই অঞ্চল যে জঙ্গলে পূর্ণ ছিল তা তো বলাই বাহুল্য। আর সেই বীর শব্দটির সঙ্গে পাড়া যোগ করে নামকরণের তত্ত্বটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যেমন অস্বীকার করা যায় না আদিবাসী নেতা বীরসা মুন্ডার নামে এই স্থানের নামকরণের অন্য ধারণাটিকে।

চা-শহর বলতে যা বোঝায় বীরপাড়া আসলে তা-ই। সেই কবে, কোন একসময়ে ইংরেজ সাহেবরা দলে দলে কালো কালো গরীব মানুষগুলোকে নিয়ে এসেছিল ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে! উদ্দেশ্য ছিল সহজ, সাদা। কাটতে হবে জঙ্গল। তৈরি করতে হবে চা-চাষের জন্য জমি। এই বিপুল অরণ্য তাই কেটে তৈরি হয়েছিল একের পর এক চা-বাগান।

তবে শুধু চা-বাগান হলে তো হবে না! আনুষাঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাও দরকার তো। আধুনিক জীবন যাপনে প্রয়োজন হয় যা আর কী! অথচ আলাদা আলাদা করে সব চা-বাগানে সেটা সম্ভব নয়। সব চা-বাগানের পকেটের রেস্ত সমান নয়। সবার ইচ্ছেও সমান নয়। তাই আশপাশের চা-বাগান নিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল এক একটি জনপদ, যেখানে পাওয়া যাবে নগর জীবনের ছন্দ। তবে বন কেটে বসত বানানো সেইসব জনপদ একদিনে গড়ে ওঠে নি। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে তারা। তাদের বুকে লেখা হয়েছে কত না ইতিহাস। আবার সেই ইতিহাসে সময়ের ধুলো জমলেও, সেখান থেকেই পাওয়া যায় প্রবাহমান জীবনের চিত্র।

আক্ষরিক অর্থেই ডুয়ার্সে যখন চা-বাগান তৈরির ধুম পড়েছিল, বীরপাড়ার চলা শুরুও তখন। তার আগে জায়গাটি ছিল ঘন অরণ্যে ঘেরা। আজকের বীরপাড়ার কাছে ভুটানের গুমটু থাকলেও, তুলনায় এই জায়গাটি নতুন। সিমেন্ট তৈরির কারখানার ধোঁওয়া আর বাতাসে ভেসে বেড়ানো ডলোমাইটের গুঁড়ো গুমটুর ট্রেডমার্ক হয়ে গেলেও, মানুষজনের টান কিন্তু ভারত সীমান্তের প্রখ্যাত কালীমন্দিরের জন্য। উঁচু টিলার ওপর বাহান্নটি সিঁড়ি ভেঙে এই মন্দিরের দেবী দর্শন আর আরও ওপরে পাহাড়ের গায়ে, ভুটান ভুখন্ডে বৌদ্ধ মঠ বেড়াতে যাওয়া, শুধু বীরপাড়া নয়, আশেপাশের একটা বৃহত্তর অংশের রীতি ও রেওয়াজ। নতুন গাড়ি কেনা হয়েছে কিংবা নতুন বিয়ে হয়েছে? মাকরাপাড়ার কালীমন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে এলে মনে করা হয় যে, শুভ হবে সবকিছু। এখানকার সৌন্দর্যও কিন্তু নজরকাড়া। অসমতল ভূমি, পাগলি নদীর ছিপছিপে রহস্যময়তা, চারপাশের অদ্ভুত নির্জনতা আর ঝিঁঝিঁপোকার ডাক... সব মিলে অসামান্য। আর অতি অবশ্যই রয়েছে মাকড়াপাড়া চা-বাগান।

তবে চা-বাগান তো সমস্ত বীরপাড়াকে ঘিরেই। আসলে ১৮৭৬ সালে গজলডোবায় ডুয়ার্সের প্রথম চা-বাগান পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, ডুয়ার্সে চা-চাষের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে একের পর এক চা-বাগান তৈরি করা শুরু হয়েছিল। আজকের বীরপাড়াকে ঘিরে রয়েছে হান্টাপাড়া, লঙ্কাপাড়া, ধুমচিপাড়া, রামঝোরা, সিংহানিয়া, গোপালপুর, তাসাটি, দলগাঁও, মুজনাই, ডিমডিমা ইত্যাদি-সহ প্রায় সতেরোটি চা-বাগান। আর এদের মালিকানা ডানকান, গুডরিক, অক্টোভিয়াস টি কোম্পানির পাশাপাশি কিছু বাঙালি প্রতিষ্ঠানেরও ছিল। তবে অতীতের সেই বাঙালি আধিপত্য আজ অনেকটাই অস্তমিত। এস পি রায়, বি সি ঘোষদের মতো মালিকদের আর দেখা যায় না। কিন্তু চা-বাগানের কমতি নেই। এরকমই চা-বাগান বান্দাপানিতে রয়েছে একশ কুড়ি বছর অতিক্রান্ত চা-গাছ। আজকের বীরপাড়ার এ এক অনন্য দ্রষ্টব্য। এই গাছ যেন বন্ধ চা-বাগান, আমৃত্যু সঙ্গী দারিদ্রকে নিয়ে বেঁচে থাকবার এক প্রত্যয়ী সংগ্রাম!

শুধু চা-বাগানের জন্যই বীরপাড়া ইংরেজদের চোখের মণি ছিল এমনটা ভাবা অবশ্য ঠিক নয়। আসলে বানিয়া ইংরেজদের ডুয়ার্স প্রীতির নেপথ্যে একটি বড় কারণ ছিল ব্যবসা। ভুটানের ভেতর দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসার জন্য তারা বেছে নিয়েছিল কালিম্পংকে। কেননা তিব্বত থেকে

রেল স্টেশন

নাথুলা-ছাঙ্গু-কারপোনাং-গ্যাংটক হয়ে পৌঁছানো যেত কালিম্পঙে এবং সেই সময়ে কালিম্পং ছিল ভুটানের অন্তর্গত। তাই ডুয়ার্সে প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত হত কালিম্পং। ইংরেজরা সেই পথের খানিকটা বিকল্প হিসেবে ভুটানে প্রবেশের জন্য বীরপাড়া থেকে লঙ্কাপাড়া, গুমটু-ভুটান পথটিকেও কাজে লাগাতে শুরু করে। চা-চাষের পাশাপাশি ভুটানে প্রবেশের আর একটি পথ পাওয়া ইংরেজদের কাছে ছিল সোনায় সোহাগা। ফলে বীরপাড়ার কদর বেড়েছিল তাদের কাছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতেও, ১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধ ডুয়ার্সের এই অঞ্চলকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে এবং খানিকটা সেই কারণেও বীরপাড়ার কাছে বিন্নাগুড়িতে উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ সেনাছাউনি গড়ে উঠেছে। এই সেনাছাউনি শেষ হয়েছে অরণ্যের প্রান্তে। ফলে ঘরে বসেই বন্যপ্রাণী দর্শনের সৌভাগ্য হয় অনেকের। তবে আম-জনতার জন্য নয় তা। অবশ্য সেনাছাউনিতে পরিচিতি বা আত্মীয় থাকলে দর্শন হতে পারে যূথবদ্ধ হাতি বা পেখম ছড়ানো ময়ূরের পাশাপাশি

বান্দাপানি চা-বাগান

জুবিলী ক্লাব, বীরপাড়া

বাইসন, চিতা ইত্যাদির। বন্যপ্রাণের কথা এল বলেই বোধহয় একথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে, বীরপাড়ার কাছেই রয়েছে গারোচিরা ইকো টুরিজম সেন্টার। আগেই উল্লেখ করেছি বান্দাপানি চা-বাগানের। সেই চা-বাগানের কাছেই রেতি ফরেস্টের ভিতরে কালাপানি বস্তি পার করে আরও উত্তরে গারোচিরার অসাধারণ সৌন্দর্য শিহরিত করে তোলে যে কোনও মানুষকে। এখানে পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাকদন্ডি পথে শুধু বনচরদের দেখাই মেলে না, ডুয়ার্সের মোহময়ী সৌন্দর্য পাগল করে দেয়। মনে হয়, সভ্যতা থেকে অনেকদূরে আদিম অরণ্যে আজও যেন পথ চলছে ভোটরাজা, বানিয়া ইংরেজ, বৌদ্ধ লামা আর অবশ্যই আবহমানকালের এক পথিক।

চা-বাগানকে কেন্দ্র করে বীরপাড়া গড়ে উঠলেও, এই জনপদের বিস্তার কিন্তু বাড়তে শুরু করে ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ ডুয়ার্স রেলওয়েজের মাদারিহাট পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের সময় থেকে। এই সময়েই বীরপাড়ার কাছে তৈরি হয় মুজনাই রেল স্টেশন। খুব সম্ভবত মুজনাই চা-বাগান থেকে চা-পাতা অন্যত্র পাঠানোর জন্য এই রেলস্টেশনটির সৃষ্টি এবং চা-বাগানের নামেই এই রেলস্টেশনের নাম দেওয়া হয় মুজনাই, যদিও জায়গাটি শিশুবাড়ি বলে পরিচিত। মুজনাই চা-বাগানের পাশে রাঙাবাড়ি ডিভিশনে থাকা তিনটি প্রস্রবণ, শিব-মন্দির ও টিলাময় ভূখন্ড এখন পর্যটকদের আকর্ষণ করছে। এমনিতেও মুজনাই রহস্যময় নদী বলে পরিচিত। এখান থেকে বল্লালগুড়ি পেরিয়ে টোটোপাড়া খুব কাছে। মুজনাই চা-বাগান ও টোটোপাড়া আসা যায় বান্দাপানি-লঙ্কাপাড়ার দিক থেকেও। টোটোপাড়া নিয়ে বিস্তারিত বলবার অবকাশ রয়ে যাচ্ছে। আপাতত শুধু এটাই বলবার যে, টোটোপাড়া নিঃসন্দেহে উত্তরের পর্যটনের অন্যতম সেরা ঠিকানা।

বীরপাড়ার রেলস্টেশনটিও কিন্তু দলগাঁও নামে পরিচিত। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, বীরপাড়া চা-বাগান লাগোয়া দলগাঁও চা-বাগানের বিশেষ অনুরোধে রেলস্টেশনটির নাম দলগাঁওয়ের নামে রাখা হয়। হয়ত ব্যাপারটি একদিকে ভাল হয়েছিল। কেননা আজকের বীরপাড়া গড়ে উঠবার পেছনে সব চা-বাগানেরই বিশেষ অবদান ছিল। মুজনাইয়ের মতো আর একটি চা-বাগানের এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে ডুয়ার্সে চা-বাগানের গুরুত্বকেই প্রমাণ করে। অবশ্য এটাও ঠিক যে, ডুয়ার্সের উন্নয়নে চা-বাগানগুলির ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। বীরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাই ধরা যাক। ১৯৫২ সালে স্থাপিত এই বিদ্যালয়ের পেছনে ছিল বীরপাড়া চা-বাগানের ম্যানেজার এফ

এম কার ও ডাঃ এস পি মুখার্জির প্রচেষ্টা। সেই সময়ে নাগরাকাটায় চ্যাংমারি হিন্দি হাই স্কুল থাকলেও এই চা-বলয়ে, রাঙালিবাজনার মোহনসিং উচ্চ বিদ্যালয় ছাড়া, বাংলা মাধ্যম স্কুল ছিল না। ১৯৬৪ সালে বীরপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, রোমান ক্যাথলিকদের পরিচালিত ডিমডিমা ফতেমা হিন্দি বিদ্যালয়, ১৯৭৫ সালে শ্রীমহাবীর হিন্দি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৮০ সালে বীরপাড়া নেপালি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করে যে, চা-বাগানের মানুষ-সহ এই এলাকার নানা বর্ণ-ভাষা-সংস্কৃতির মানুষের জন্য বীরপাড়া ডুয়ার্সের আদর্শ একটি জায়গা। রয়েছে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জুবিলী ক্লাব। অত্যন্ত প্রাচীন টি প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, যাতে রয়েছে ইউরোপিয়ান ঐতিহ্যের ছোঁওয়া। নিজের কসমোপলিটান চেহারা নিয়ে বীরপাড়া তাই নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সত্যিই কসমোপলিটান এই বীরপাড়া। ভারতের প্রায় সবপ্রান্তের মানুষকেই পাওয়া যায় এখানে। একসময় এখানে ইউরোপিয়ানদেরও আধিপত্য ছিল। অধ্যাপক অর্ণব সেন ও ডুয়ার্স-বিশেষজ্ঞ ব্রজগোপাল ঘোষের কাছে আজও শোনা যায় বীরপাড়ার কাছের নাংডালা চা-বাগানের সাহেব ম্যানেজারের ব্যক্তিগত হেলিকপ্টারের কথা কিংবা তাসাটি চা-বাগানের বড়বাবু অনাথবন্ধু ঘোষের সঙ্গে ডিমডিমা চা-বাগানের ফিডারবাবুর মাছ ধরতে যাওয়ার গল্প। অতীতের সেই বীরপাড়া আজ অনেক বদলে গেছে। একথা সত্যি। বীরপাড়া থেকে ফালাকাটা যেতে পথের পাশের সেই প্রাচীন মহীরুহেরা অদৃশ্য। এককালের কাঠের দেওয়াল-টিনের চালের বাড়ির বদলে কংক্রীটের জঙ্গল ঢেকে ফেলেছে বীরপাড়াকে। অতীতের খেলাধুলার সেই ঐতিহ্যও হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। শ্রদ্ধেয় তুষার বন্দোপাধ্যায়ের মতো কবি ও শিক্ষক, অভয়চরণ কুন্ডুর মতো দক্ষ শিক্ষা প্রশাসকের অভাব আজ পরিলক্ষিত। চা-বাগানের মাদলের শব্দ স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে মোবাইল ফোনের চটুল রিংটোনে। উন্নয়নের চাকায় চাপা পড়ে যাচ্ছে বৃক্ষদের আর্তনাদ। ধুঁকতে থাকা চা-বাগানকে গ্রাস করছে অপুষ্টি-অশিক্ষা-দারিদ্র। গত শতকের আশির দশকের মতো ঘনঘন ডাইনি-শিকারের কথা শোনা না গেলেও, সংস্কারের আলো আজও বহু মানুষের অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করতে পারেনি। নারীপাচার একটি বিরাট সমস্যা এখনও অবধি।

তবু সব কিছুর পরেও বীরপাড়া সবুজে ঘেরা প্রকৃতির মাঝে যেন 'সব পেয়েছি'র এক ছোট্ট মরুদ্যান যেখানে অনবরত হেঁটে চলেছে এক ছোট্ট ভারতবর্ষ তার সব আনন্দ, সব দুঃখকে সঙ্গী করে।

আদর্শ হাইস্কুল, বান্দাপানি

বৃষ্টিমুখর ডুয়ার্সের ডাকে করোনা যখন তুচ্ছ

জাহির রায়হান

আধুনিক নির্মাণশৈলীতে এখন ঢালাইয়ের চল, ফলে লকডাউনের বেকার শুয়ে শুয়ে যে কড়ি-বরগা গুনে গুনে দিন গুজরান করব তারও উপায় নেই। ঘর থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে ছাদ, ছাদ থেকে আবার ঘর। এই ঘনচক্কর আর একই মুখ দেখতে দেখতে জীবনখানি যখন প্রায় দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে তখনই শুরু হল আনলক-১। ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের কথায় ভরসা রাখা যায় না। আনলকটা যে আবার লকডাউনে পরিণত হবে না সেটা বুকে হাত দিয়ে দাবি করা মুশকিল। সুতরাং আপ্তবাক্য 'করোনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মানিয়ে নিন' স্মরণ করে প্ল্যান ভাঁজতে বসলাম ভোকাট্টার।

ইদানিং ডুয়ার্স বেড়াতে যাওয়া হরলিকসের সেই টিভি কমার্শিয়াল 'আমি তো এমনি এমনি খাই' এর মত। কেন না কারণে-অকারণে সুযোগ পেলেই উত্তরবঙ্গ যাই। এবারেও যে যাব, ধুপঝোরার 'অবসর'-এ থাকব সেটা চূড়ান্ত। বর্ষার ডুয়ার্স দেখার ইচ্ছে বহুদিনের, উপরি পাওনায় এখন ভিড় কম ওই চত্বরে, জনগণ সব বাধ্যতামূলক স্বেচ্ছা

নির্বাসনে করোনার করুণায়। সুতরাং ভিড় এড়িয়ে একা একা ঘোরার মোক্ষম সুযোগ সামনে। তবে ভাবনার বিষয় একটাই, যাব কীভাবে? ট্রেন তো বন্ধ, বাসেও চাপব না। তাহলে? দুর্জনের সঙ্গীর অভাব হয় না কখনো। আমারও হল না। মুশকিল আসান করল নুরুল ভাই ও তার বাহন স্করপিও, সে খবরে জুটে গেল আরও দু'জন, অভিজিৎ ও প্রলয়। দু'জনেরই বয়স কম, মরার ভয় আরও কম। সুতরাং চলো পালাই।

পয়লা জুলাই সাঙ্গপাঙ্গ সমেত যাত্রা শুরু। পথে গাড়ি বিগড়োল বার কয়েক, বিগড়োল নুরুল ভাইও। সে গাড়ি অন্তপ্রাণ, তাই বাহন গরম হলে নুরুল হাসানও গরম হয় ততধিক গতিতে, আর তার আঁচে সেদ্ধ হয় বাকি তিনজন। গর্তযুক্ত উন্নয়নের রাস্তা ও মুষলধারার বৃষ্টির সঙ্গে যুঝতে যুঝতে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ যখন ঢুকলাম 'অবসর'-এ তখনও লাবলু হরি ও ইমরান না খেয়ে বসে আছে আমাদের অপেক্ষায়।

'অবসর' আসলে এমনিই, আন্তরিক, ঘরোয়া, অতিথি বৎসল। আমাদের বহু স্বপ্নের ফসল 'অবসর'। তাই আসতে দেরি হলে মন ভার হয়, আর এসে পড়লেই চুঁইয়ে পড়ে ভাললাগা। তাছাড়া এখানে আসা মানেই বেড়ানোর পাশাপাশি কিছু সামাজিক কাজে অংশ নেওয়া। অনুপমদাও

কোভিড-১৯ স্পেশাল পদাতিক এক্সপ্রেসে চেপে এসে পড়লেন পরদিন সকালে, অবসরের তত্ত্বাবধায়ক স্বপন তাঁকে নিয়ে এল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন হতে। বিকালে ধুপঝোরা রিসর্ট অ্যাসোসিয়েশনের আলোচনা পর্ব। পরিবর্ত পরিস্থিতিতে ডুয়ার্সে আগত পর্যটকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে সরকারি নির্দেশানুযায়ী কি কী

সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার তা নিয়ে মতামতের আদানপ্রদান। তারপর স্থানীয় গ্রামবাসীদের করোনা সচেতনার পাঠ দেওয়া এবং তাদের মধ্যে সাবান ও মুখবন্ধনী বিতরণ। সামাজিক কাজে 'অবসর' অগ্রণী বরাবর, অতিথিরাও নানান সময়ে উক্ত কাজের অংশ হয়ে ওঠেন স্বেচ্ছায়, তাই ডুয়ার্সের পর্যটনে 'অবসর' সর্বদা অন্য পথের পথিক।

প্রতিটি রিসর্টের প্রবেশ পথের পাশেই রাখা হবে বেসিন ও সাবান সহযোগে হাত ধোওয়ার ব্যবস্থা। ঘর ও আসবাবপত্র স্যানিটাইজ করা হবে নিয়মিত। স্টাফেরা ব্যবহার করবে মাস্ক ও দস্তানা। ধাতু নির্মিত থালা-বাটি-গেলাসের পরিবর্তে কাগজের প্লেট ও কাপের ব্যবহার হবে অধিক। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার স্বার্থে রিসর্টের ২০-৩০ শতাংশ ঘর ফাঁকাই রাখা হবে আপাতত, সিদ্ধান্ত নেওয়া হল অ্যাসোসিয়েশনের আলোচনায়। তবে পর্যটকেরাও যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন ঠিকঠাক সেদিকেও খেয়াল রাখার বিষয়ে জোর দেওয়া হল বিশেষভাবে।

সন্ধেয় বৃষ্টি শুরু হল অঝোরে। গরুমারা অভয়ারণ্যের মাথায় তখন কালো মেঘের শামিয়ানা। আশেপাশের জমিগুলিতে জল থইথই জলছবি। আমার স্যাঙাতগুলো সেই বিকালেই লাবলুর বাইক নিয়ে মূর্তি পেরিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল নদী সংলগ্ন চাপড়ামারি বনাঞ্চলে। বৃষ্টিতে স্নান করে তারা ফিরে এল ঘরে। চোখেমুখে তাদের বন্দিত্ব মুক্তির সাবলীল উচ্ছ্বাস।

সারারাত ধরে একটানা কোরাস গেয়ে পরদিন সকালে ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নিল বৃষ্টি। ক্রমশ পরিস্কার হল আকাশ। দূরের উচ্চ-অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী একটু একটু পরিস্ফুট হল চোখের সামনে। বারান্দা থেকে পরিস্কার চোখে পড়ল ভুটান পাহাড়ের সম্পূর্ণ অবয়ব। হেসে উঠল যেন সে। স্ফটিক মেঘমালা খেলা করছে পাহাড়ের খাতে খাতে। 'অবসর'-এর বারান্দা থেকে পাহাড় দর্শনের অভিজ্ঞতাটি আমার কাছে নতুন। যেন চতুর্দিকে গিরিরাজি ঘেরা আমি বসে আছি কোনও আদিগন্ত সবুজের দুনিয়ায়, নির্লিপ্ত, নির্ভার, নিশ্চিন্ত।

প্রাতরাশ সেরে যাওয়া হল মূর্তি। কেউ কোত্থাও নেই সেখানে। পায়ের নিচে মূর্তির জলতরঙ্গ, বেগবান হার না মানা জলধারা হুটোপুটি করতে করতে ছুটে চলেছে অজানার সন্ধানে। বৃষ্টি নামল আবার ঝেঁপে প্রবহমান মূর্তির সারা শরীর জুড়ে, স্বভাব বাউন্ডুলেদের অভাবে অস্থায়ী দোকানগুলি এমনিই বন্ধ, বৃষ্টি আসায় স্থানীয় দু'একজন যারা ছিল ইতিউতি তারাও ঘরমুখী হল। আমরা আমাদের বাহনে চেপে জঙ্গল রাস্তা ধরে ধাবিত হলাম জলঢাকা নদীর দিকে। মাছ কিনতে চায় মৎস্য রসিকের দল। জঙ্গলের মাঝে নজর মিনারটি প্রস্তুত হয়ে দিন গুনছে পর্যটক ও ডুয়ার্সপ্রেমীদের প্রতীক্ষায়। জানি না কবে শেষ হবে সে অপেক্ষা! এক ময়ূর দম্পতি রাস্তার পাশেই প্রেমালাপ করছিল একমনে, আমাদের উপস্থিতিতে সচকিত হয়ে আড়াল করল নিজেদের। ডাঃ ভট্টাচার্য বলে উঠলেন, 'জাহির, কে বলে বর্ষায় শুধু মানব-মানবীরই পীরিত জেগে ওঠে?'।

আলিপুরদুয়ারগামী প্রশস্ত জাতীয় সড়কের পিঠে তখন বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ধারাপাত। জলঢাকায় উপচে পড়ছে জল, কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে তার ঘন বর্ষায়। সংলগ্ন নদী পাড়ে বর্ষাস্নাত সবুজের চোখ জুড়ানো মাখামাখি। দূরে এক জেলে মাছ ধরছে জাল ফেলে। আর তারই অন্য সাথী রাস্তার পাশে বসে আছে নানান মাছের পসরা বসিয়ে। মেছো বাঙালি হইহই করে নেমে পড়ল মাছ কিনতে, দাদাও যোগ দিলেন মহোৎসাহে। আমি গুটি গুটি পায়ে পুনর্বার এগিয়ে গেলাম জলঢাকার পানে যার কল-কল্লোলিত ভরাট বুকে আকাশ ঝরে পড়ছে বৃষ্টি হয়ে, যার শরীরে লুটোপুটি করছে জলদেবী, যে নদী নিজের সাথেই জলকেলিতে মগ্ন, সেই নদী, সেই ভালোবাসার সাথে আমার কিছু কথা আছে গোপনে।

সকালে মূর্তি, বিকালে সামসিং। চালসায় শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জংশন রেলপথটি পার হয়েই হঠাৎ খাড়া হয়ে যাওয়া একটা রাস্তার বাঁক

থেকে দেখা যায় সমগ্র চাপড়ামারি ও গরুমারা অভয়ারণ্যের ঘনসবুজ চাপাটি। যার ফাঁকফোঁকর থেকে চিকচিক করে জানান দেয় মূর্তি, কুর্তি, চেল, জলঢাকা প্রভৃতি নদীর জলযাত্রা। সামসিং চা বাগান চিরসবুজ, বৃষ্টির জলধারা পেয়ে সে সবুজ পুষ্ট হয়েছে আরও বর্ণে। সুনতালেখোলা যাওয়ার পথে উপর পাহাড় হতে চোখে পড়া বনবস্তিগুলি ছবি হয়ে ধরা দেয় চোখের আয়নায়, আর সেখান থেকেই সটান চিরস্থায়ী হয়ে যায় মনের ক্যানভাসে। রকি আইল্যান্ডে মূর্তির অবতরণ ভরিয়ে দেয় হৃদয়। ভিড় না থাকায় উপভোগ্য হয়ে ওঠে মূর্তির কলকাকলি। লালিগুরাসে ঐ মূর্তিই যেন তরুণী নারীর রূপালি কণ্ঠহার। দূর হতে চিকচিক করে জানান দেয় তার সগৌরব উপস্থিতি। অনেকটা সময় সেখানে কাটিয়ে, জং ধরা মনের মরচেগুলো খসিয়ে সিপচু হয়ে চাপড়ামারি বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে ফিরে এলাম আস্তানায়।

পরেরদিন গাড়ি এগোল লাভা'র পথে। মালবাজার হয়ে মালনদী ও মিনগ্লাস চা বাগিচার মাঝ বরাবর এগিয়ে চলল বাহন। বাগানজুড়ে তখন নিত্যদিনের ব্যস্ততা। চা পাতা তোলার কাজ চলছে বাগানে বাগানে। লাভা যাচ্ছি মানে শুধু লাভা-ই দেখতে হবে এমন কোনো পূর্বপরিকল্পিত ধারণা পোষণ করি না আমি। যাত্রাপথে ছোট খাটো দোকান, পাড়া-মহল্লা, প্রাইমারি স্কুলের ছাউনি, মায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বারান্দাটিও আমার চোখ টানল মনের খোরাক জোগাতে। গরুবাথান বাজার পেরিয়ে এবার চেল নদী। জলঢাকা, মূর্তি ও কূর্তি নদীর বর্ষার রূপ দেখেছি গত দু'দিন। আজ সামনে রূপবতী চেল। সেতুটি পার করিয়ে গাড়ি থামাল স্বপন। নুরুল ভাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সেলফিতে। বেড়াতে বেরোলে আমার ফোনটি নিশ্চিতভাবে দেহ রাখে, এবারেও তার অন্যথা হয় নি। ফলে প্রলয়ের ফোনটি চেয়ে নিয়ে আমি পাহাড়ের খাত বেয়ে নেমে আসা স্রোতস্বিনী চেলকে চিত্রবন্দি করলাম আঁশ মিটিয়ে।

যে রাস্তাটি ধরে লাভা যাচ্ছি আমরা, তা নির্মাণ করেছে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন সংক্ষেপে বিআরও। প্রশস্ত ও মসৃণ সড়কপথ। স্বপনের কাছে জানা গেল, রাস্তাটি নাথু লা অবধি যাবে। অর্থাৎ প্রতিবেশী চীন যত বেগড়বাই করবে ততই এই অঞ্চলের রাস্তাঘাটের উন্নতি হবে। তাও ভালো। তবে রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। করোনা মহামারির তাড়নায় পর্যটকের দল গৃহবন্দি। অনেকেই এখনও দোটানায়। তাই বেড়াতে আসে না কেউ। পাইন পরিবেষ্টিত সুন্দরী লাভাও কপাট এঁটেছে দ্বারে। মহামারির সতর্কতায় নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে পর্যটকের কাছ থেকে। প্রধান আকর্ষণ লাভা মনেষ্ট্রিরও দুয়ার বন্ধ তাই। কিছুক্ষণ কালক্ষেপ করে আমরা ধরলাম লোলেগাঁওয়ের পথ।

সমতলের বনাঞ্চল চষেছি এতদিন। লোলেগাঁওয়ের পথে পড়ল পাহাড়ি জঙ্গল, নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যান। মনোরম। দর্শনীয়। পুরোটাই পাইনের দঙ্গল। বর্ষার মেঘ উলম্বু গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরিতে মগ্ন। স্যাঁতসেঁতে জলীয় বাষ্প আর ফোঁটা ফোঁটা মেঘ জলবিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে গাড়ির বনেটে। বৃষ্টি সৃষ্টির আঁতুরঘরে চলে এসেছি বুঝি আমরা। দাঁড়িয়ে রয়েছি এমন এক পৃথিবীর অন্দরে যেখানে মানুষকে লকডাউন ঘোষণা করতে হয় না, প্রকৃতি নিজেই নিজেকে অন্তরীণ রেখে হাঁক দেয় বিবাগী হওয়ার। জলভরা মেঘ শরীরে মেখে নিতে অভি আর প্রলয় এগিয়ে গেল কিছুটা পায়ে হেঁটে। নুরুল ভাই বাড়িতে ভিডিও কল করে তার পরিবারের সাথে ভাগ করে নিল সেই জঙ্গল-বিলাস। নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে কয়েকখানি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আছে বলে পড়েছি খবরের কাগজে। বাঘমামা খেয়াল করছে কি না কে জানে! সাদা সাদা ঘন মেঘ আড়াল করে রেখেছে গোটা স্বর্গরাজ্য। প্রায় কিছুই ঠাহর করতে না পেরে হতাশ হলাম কিছুটা। তবে মহামারির আবহে জীবনের আনন্দ হারাতে বসা প্রাণপাখিটার পুনর্জন্ম হয়ে গেল ঘন বর্ষার এই ডুয়ার্স যাপনে। আমাকে আমিতে ফিরিয়ে দিল ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গ।

ধারাবাহিক উপন্যাস। ষষ্ঠ পর্ব

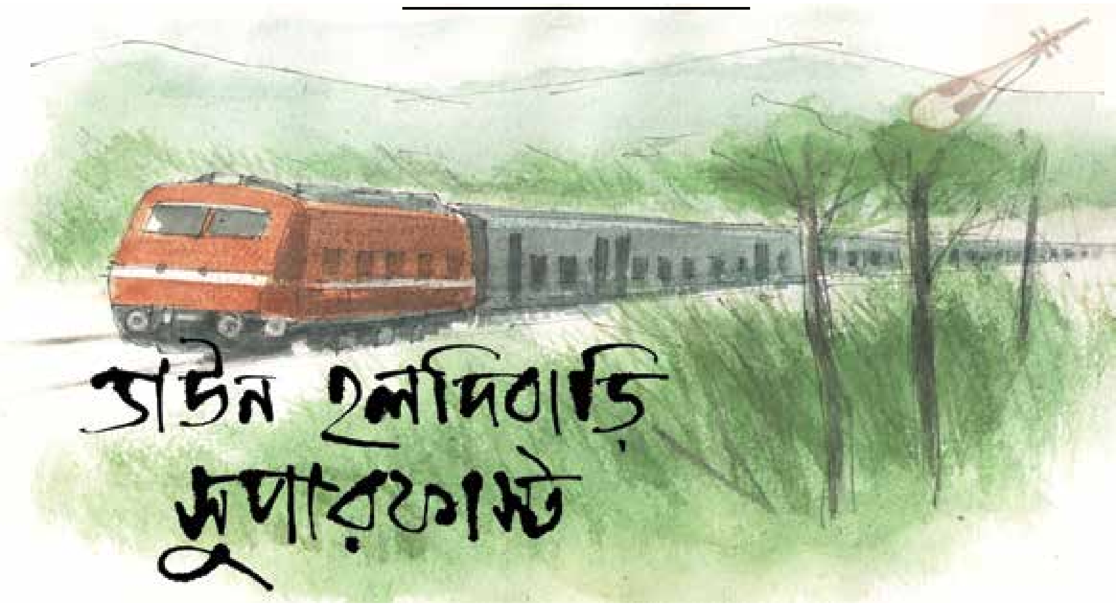

সুজিত দাস

রাঙাপানির গ্লোবাল কেমিক্যালস কে ঘিরে কোন এক রহস্যের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। বিরুদ্ধে নদী বাঁচাও কমিটির আন্দোলন। এসে বিপাসনা মুখার্জি। রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, লিপস্টিকের মধ্যে একটা ইনবিল্ড টাইমার! প্লাটফর্মে চরিত্র নেমেছে আরো। বাতাস বাংলা টিভির আরাত্রিকা— তাঁর উদ্দেশ্য ঠিক কী? জলসা থেকে ফেরার পথে অরণ্যের রাস্তায় মহাকাল মন্দিরের সামনে হঠাৎ ফেটে গেল আরাত্রিকাদের গাড়ির টায়ার। গাড়ি থেকে নেমে বলবিন্দার খুঁজে পেলেন বুলেট। রাতজাগা পাখির ডাকে নেমে এলো ষড়যন্ত্রের বাতাস। তারপর?

১১

জঙ্গলের একটা নিজস্ব আলো আছে। খানিক ভেতরে ঢুকলে, চোখে অন্ধকার সয়ে এলে, আশপাশের গাছ চেনা যায়। অনুভব করা যায় পাতার মর্মর, পোকামাকড়ের ডাক, সরীসৃপের চলাফেরা। আজকে পূর্ণিমা না হলেও আকাশে শুক্লপক্ষের প্রায় গোলপানা চাঁদ। হালকা একটা চাদরের মত আলো বিছিয়ে রাখা আছে অরণ্যের গভীরে। এমন আলোতে দূরের মাদি সম্বরকে চেনা যায় অনায়াসে। গাছগাছালির পাশ দিয়ে বয়ে

যাওয়া সরু ঝোরার ওপরে মালুম হয় আলোর ঝরনা। আপার চ্যাংমারি থেকে মাদারিহাট প্রায় পৌনে দু'ঘণ্টা। জিপে আসার সময় মোটামুটি ছকে নিয়েছে দুজনে। জঙ্গলের ঠিক কোন পয়েন্ট থেকে ওদের দলটার মুভমেন্ট দেখা যাবে, সেটাও বলবিন্দরকে এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে শুক্রা। একটা বিশেষ জায়গায় জঙ্গল ততটা ঘন নয়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কিছু লগ বিছিয়ে রাখা আছে। স্যাঁতসেঁতে ওই কাঠের টুকরোগুলোতে আজ খোঁজা হবে। কোন জায়গা থেকে ছবি তোলা সম্ভব তাও আয়নার মত বুঝিয়ে দিয়েছে এই ওঁরাও কিশোরটি। তারপরের ডেসটিনেশন সঙ্গম হোটেল। তারপর জিপে একা আপার চ্যাংমারি ফিরে যাবে বলবিন্দর। আর শুক্রা ফিরবে নিজের মত করে।

কম আলোয় হ্যান্ডহেল্ড ফটো তুললে ছবির কেঁপে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। ট্রাইপড খুব ভারি এবং নজরে পড়ার মত জিনিস। তাই একটা ফোল্ডেড মনোপড ব্যাগে রেখেছে বলবিন্দর। এই মুহূর্তে একটা ঢালু গড়ানে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে ও। এখান থেকে কাঠের লগগুলোকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ধীরে সুস্থে মনোপড বের করে ব্যাগ থেকে। প্রয়োজনে গেঁথে নেবে নরম মাটিতে। শুক্রার সঙ্গে কথা হয়েই আছে, যতটা সম্ভব দেরি করে এখানে নিয়ে আসবে গোটা দলটাকে। তাতে ভোরের আলোর সামান্য ছিটেফোঁটাও যদি পাওয়া যায়। প্রায় সোয়া ঘণ্টা ঠায় অপেক্ষার পর নিজের স্নায়ুকে নিজেই পাশ মার্ক দিচ্ছে বলবিন্দর। জঙ্গলের যে কতরকমের শব্দ! এমনকী বাতাসে ভেসে বেড়ানো হিমেরও একটা আলাদা গন্ধ। ট্যুরিস্ট জিপে, কনডাক্টেড ট্যুরে অরণ্যের কিছুই বোঝা যায় না। এই অন্ধকারে একটু দূরে জ্বলে ওঠা বনবিড়ালের চোখও হাড় হিম করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

আলো ফুটতে এখনও অনেক দেরি। তবু একটা হলদে আভাস ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। সারা রাতের জমে থাকা হিম বড় বড় ফোঁটা হয়ে টুপটুপ করে ঝরে পড়ছে প্রাচীন গাছগুলো থেকে। একটা দুটো পাখির ঘুম ভাঙছে ইতিউতি। আবছা একটা আওয়াজ ভেসে আসছে উল্টোদিকের ঘন জঙ্গল থেকে। বাইনোকুলারে চোখ রাখে বলবিন্দর। সাতজনের একটা দল জঙ্গল এবং মাঝের মাঠ পেরিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে কাঠের লগগুলোর দিকে। দু'জনের হাতে প্রজাপতি ধরার মত জাল, সকলের পিঠে স্লিং ব্যাগ। নিজের শরীরকে যতটুকু সম্ভব আড়াল করে পজিশন ঠিক করে বলবিন্দর। লেন্সের ফোকাস এবং ক্যামেরার মোড আরেকবার চেক করে। বেশ কিছু স্টিল ফটো তুলতে হবে। দু'তিনটে ভিডিও ক্লিপও। 'দ্য নিউ এজ ডেইলি'-র অনলাইন পোর্টালের জন্য। ওখানে ভিডিওই যাবে। আজকাল খবরের কাগজ পড়ার মানুষ কমে আসছে, সকলের হাতেই ছয় ইঞ্চির একটা মোবাইল। হাউস তাই স্টিল ছবির সঙ্গে ভিডিও ক্লিপের ওপরও জোর দিচ্ছে ইদানীং। ভিস্যুয়াল মিডিয়ার মাস অ্যাপিলটা এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

একটা দুটো পাখির ঘুম ভাঙছে ইতিউতি। আবছা একটা আওয়াজ ভেসে আসছে উল্টোদিকের ঘন জঙ্গল থেকে। বাইনোকুলারে চোখ রাখে বলবিন্দর। সাতজনের একটা দল জঙ্গল এবং মাঝের মাঠ পেরিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে কাঠের লগগুলোর দিকে। দু'জনের হাতে প্রজাপতি ধরার মত জাল, সকলের পিঠে স্লিং ব্যাগ। নিজের শরীরকে যতটুকু সম্ভব আড়াল করে পজিশন ঠিক করে বলবিন্দর।

দলটা আরও কাছে আসার পর রিফ্লেক্স অ্যাকশন কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে বলবিন্দরের। শুক্রা বেশিরভাগ সময়েই এমন পজিশনে থাকবে যাতে ওর মুখ না দেখা যায়।

বাকিদের থেকে কয়েক ফুট দূরে নিজেকে এনগেজ রাখার কথা ওর। বাকিটা বলবিন্দর ফ্রেম তৈরি করার সময় বুঝে নেবে। একজনের হাতে বড় শাবলের মত একটা লোহার ডান্ডা। লগগুলোকে গড়িয়ে সরানোর জন্য। গোটা অপারেশনটা ক্যামেরায় নিখুঁত ধরে রাখে বলবিন্দর। আলো যত ফুটছে ততটাই ঘেমে উঠছে ও। কভার হিসেবে একটা দন্ডকলস গাছের ঝোপ খুব কাজে দিচ্ছে কিন্তু তাও কতক্ষণ? এই পজিশনটা ক্রমশ রিস্কি হয়ে পড়ছে। ব্যাগটা এখানে রেখেই ক্রল করে ফুট দশেক দূরের একটা মেহগনি গাছের আড়াল নিল বলবিন্দর। ওখান থেকে পুরো ভিউটা না পাওয়া গেলেও আর একটু ক্লোজ শট পাওয়া যাবে। সাটার টেপার শব্দও যে এত ভারি হতে পারে, আগে কখনো অনুভব করতে পারে নি।
আইডেন্টিফিকেশনের জন্য দরকার কয়েকটা মোটামুটি পরিষ্কার ছবি। ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে এবারে নিজেই চমকে ওঠে বলবিন্দর। সেই ছেলেটা যাকে বাইক দিয়ে কুন্ডু বলেছিল হোমস্টেগুলো দেখিয়ে দিতে। এতক্ষণে বেশ পরিষ্কার ছবি উঠছে। খুব সাবধানে আরও কিছু স্টিল তোলে এবং একটা হাই ডেফিনিশন ভিডিও। এরপর নিজেকে পুরোটা আড়াল করে বলবিন্দর। আর ঝুঁকি নেওয়ার মানে হয় না। যা মনে হচ্ছে ভালই শট এসেছে। এখন এরা বেরিয়ে যাওয়ার পর মাদারিহাট থানা থেকে একটু দূরের একটা গ্যারাজে রাখা জিপ অবধি হেঁটে যেতে হবে শুঁড়িপথ দিয়ে।

এথেলবাড়িতে সঙ্গম ধাবায় এসে জিপ থামল। ড্রাইভারকে ভালই পাঠ পড়িয়ে রেখেছে শুক্রা। ধাবা না বলে বড় হোটেল বলাই ভাল। এত ভোরেও বেশ গমগম করছে। পাশেই একটা দিশি মদের বটলিং প্ল্যান্ট। সাতসকালেই মদ নিয়ে যাওয়ার জন্য আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, বানারহাট থেকে একটারপর একটা ট্রাক এসে দাঁড়াচ্ছে। মালাই চা-এর অর্ডার করে বাথরুমে যায় বলবিন্দর। ক্যামেরার খেলা এখন চলবে না। মোবাইল এবং স্পাই ক্যাম ঠিক মত গুছিয়ে নিতে হবে। মোবাইল তো পকেটেই থাকবে, সময়মত ক্যামেরা চালু করে উলটো করে পকেটে রেখে দিলেই হল। স্পাইক্যাম জামার বোতামে ফিট করে বলবিন্দর। বাথরুম থেকে বেরিয়ে চা-এর কাপে ঠোঁট ছোঁয়ায় এবং টের পায় নিজের ক্লান্তির বহরটা। তবে প্রথম চুমুকেই হাঁটু অবধি মিষ্টি হয়ে যাওয়ার উপক্রম। এত চিনি, এত চিনি! ভাতিন্ডার চা-ও সঙ্গম ধাবার এই মালাইমারা দুধ চা-র কাছে নিতান্তই শিশু।

খানিক বাদেই চারটে বাইক এসে থামে সঙ্গম ধাবায়। সাতজনের দলটা নেমে সামনের দুটো খাটিয়ায় বসে। স্লিং ব্যাগগুলোকে খাটিয়ার ওপরেই রাখে ওরা। একঝলক দেখলেই বোঝা যায় রাতভর কেউ ঘুমোয় নি এবং সবাই খুব টেনসড। শুক্রা বরং অনেক স্বাভাবিক, শান্ত। আফটার অল, মংরার 'পিক'। বাইক স্ট্যান্ড করার মুহূর্ত থেকেই মোবাইল এবং স্পাই ক্যাম দুটোকেই অন করে দিয়েছে বলবিন্দর। সেই কোন ছোটবেলায় গুরুদোয়ারাতে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সিগারেট না খাওয়ার। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে একটু এগিয়ে ধাবার সামনে পান-বিড়ির দোকান থেকে এক প্যাকেট নেভি কাট কিনে একটা খাটিয়ায় বসে ও। হাতের বালাটা খুব যত্নে আড়াল করে ফুলস্লিভের নীচে। পকেট হাতড়ে দেশলাই না খুঁজে পাওয়ার ভান করে পাশের খাটিয়ার দিকে এগোয়,

'মাচিস্ মিলেগা?' কুণ্ডুর ছেলেটাকেই জিজ্ঞেস করে সরাসরি।

'জি, জরুর', পাটকার ওপরে টুপি পরা বলবিন্দরকে চেনা মুশকিল। একটা টেক্কা মার্কা দিয়াশলাই এগিয়ে দেয় ছেলেটি। বলবিন্দর হেসে ওর পাশেই বসে পড়ে। অফার করে সিগারেট। টুকটাক কথাবার্তা বলে। এর ছবি সেইদিনও তুলেছে কুন্ডু হার্ডওয়্যারের লাগোয়া পার্টি অফিসে। এখন লুকনো ক্যামেরায় ছবি উঠছে নিজের মত। বলবিন্দর জানে খাটিয়ার ওপর রাখা স্লিং ব্যাগগুলোতে ছোট ছোট জারের ভেতরে কয়েকটা

নিরীহ তক্ষক। ক্লোজ শট আছে মেমোরি কার্ডে। মেহগনি বৃক্ষের আড়াল থেকে তোলা ছবি।

জিপে একাই আপার চ্যাংমারি ফিরে আসে বলবিন্দর। লেবু এবং কলাবাগানের মাঝের রাস্তা দিয়ে হেঁটে ঘরের দিকে এগোচ্ছে যখন রৌদ্র বেশ তেজি। সাবিত্রী চা নিয়ে আসে। জলও। আরাত্রিকা ঘুমোচ্ছে এখনও। বুড়ো সুরেশ তামাং অলস বসে আছে সামনের টিলায়। চুট্টা ফুঁকছে একমনে। পাশে রাখা ট্র্যানজিস্টরে আকাশবাণী শিলিগুড়ি, ফৌজি ভাইয়ো কে লিয়ে কারিওক্রম। হিন্দি গান বেজে চলেছে, মাঝেমধ্যে আমিন সাহানির গলা। ফ্রেশ হয়ে, স্নান সেরে আর কাজ করা সম্ভব নয়, জানে বলবিন্দর। ল্যাপটপ খুলে নিজের ডঙ্গল অন করে ও। মেমোরি কার্ড থেকে গুগল ড্রাইভে ছবি এবং ভিডিও ক্লিপগুলোকে সেভ করে রাখে। দু'সেট ছবি রাখতেই হবে। এই ধ্রুব সত্যটা মেনেছে বরাবর। এক সেট হার্ড ডিস্ক কিংবা মেমোরি কার্ডে অন্যটা আকাশে।

ক্লাউড অনেক নিরাপদ।

চা শেষ করে বলবিন্দর। ঘুম দরকার, টানা একটা ঘুম। কয়েক ঘণ্টার।

বাটাগলি থেকে একটা পাউডার ব্লু রঙের অডি গাড়ি খুব অলস গতিতে সেভোক মোড় পেরিয়ে, পানিট্যাঙ্কি মোড় ডজ করে শালুগাড়াতে এসে থামে। এত ভোরে শিলিগুড়ি শহরের ঘুম ভাঙে না। হিলকার্ট রোডের কয়েকটা চায়ের দোকান, খবরের কাগজওয়ালা আর মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনা বোঝাই ডাম্পার ছাড়া এই শহর এখন ঘুমিয়েই আছে। শালুগাড়া মনাস্টারির পাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে সুমন ইয়লমো-র ছোট্ট দোতলা বাড়ি। ছোট্ট কিন্তু প্যাগোডা স্টাইলের বাড়ি। নীচের গ্যারাজে গাড়ি পার্ক করে সুভাষ, বাটা সুভাষ। হিমালয়ানকার র‍্যালির আজ যে এত বোলবালা তার পেছনে সুমন ইয়লমো। ছেলেটা বাইক আর গাড়ি ছাড়া কিছু বোঝে না। কালরাতেই কথা হয়েছে ইয়লমো-র সঙ্গে। এখন ওর মধ্যরাত্রি। কথামত সাদা বোলেরো-টা স্টার্ট করে সুভাষ। ইগনিশন কী ড্যাশবোর্ডের ওপরেই ছিল। আপাতত মেল্লি চেকপোস্ট। ওখানে মিলন গোম্বু অপেক্ষা করবেন বাটা সুভাষের জন্য। মিলন-জীর সময় মানে সময়। অবশ্য গতির নেশা সুভাষের রক্তের অন্তর্গত। তাই এইটুকু পথ ঝড়ের গতিতেই চালায় ও। ইয়লমো-র গাড়িতে একফোঁটাও আওয়াজ নেই। নেই একবিন্দু ধুলো। একসময় কলকাতার এরিয়ান্স-এ খেলত সুমন। গায়ে মোষের মত শক্তি, মুখে হাসি। কয়েক পুরুষের বনেদি বড়লোক। সুমনের লাইফস্টাইলে

খানিক বাদেই চারটে বাইক এসে থামে সঙ্গম ধাবায়। সাতজনের দলটা নেমে সামনের দুটো খাটিয়ায় বসে। স্লিং ব্যাগগুলোকে খাটিয়ার ওপরেই রাখেওরা। একঝলক দেখলেই বোঝা যায় রাতভর কেউ ঘুমোয় নি এবং সবাই খুব টেনসড। শুক্রা বরং অনেক স্বাভাবিক, শান্ত। আফটার অল, মংরার 'পিক'। বাইক স্ট্যান্ড করার মুহূর্ত থেকেই মোবাইল এবং স্পাই ক্যাম দুটোকেই অন করে দিয়েছে বলবিন্দর।

কোথাও কোনও কম্প্রোমাইজ নেই। শালুগাড়ার এই ছোট্টবাড়িটা, ওর কথায় 'স্টুডিও' অথচ নীচে কয়েক হাজার স্কোয়ার ফুটের গ্যারাজ। আসলে বনেদিয়ানা ব্যাপারটা 'ক্যারি' করতে পারা সহজ নয়। সুমন ইয়লমো সেটা পারে এবং পয়সা ঝনঝন করে না। কার্তোক মনাস্টারির পাশে বিরাট এক অরফ্যানেজের ট্রাস্টি ওদের পরিবার। ইয়লমো-র ঠাকুর্দা এই জমি উইল করে গিয়েছিলেন নাতির নামে। শর্ত ছিল এখানে গড়ে তুলতে হবে অরফ্যানেজ এবং ডেস্টিচুট মেয়েদেরজন্য 'হোম'। সুমনের বাবা তাঁর জীবদ্দশায় দুটোই তৈরি করে

গিয়েছেন। আর গত সাত আট বছর ধরে সুমন ইয়লমো তার আধুনিকীকরণ করছে। ইউএন সারা পৃথিবীতে যে কয়েকটা অরফ্যানেজ এবং ডেস্টিচ্যুট সেন্টারকে স্বীকৃতি দিয়েছে সুমনের 'দ্য হরাইজন' তার মধ্যে একটা। চুম্বকে, সুমন লামা ইয়লমো একজন গুড সামারিটান। আ স্মার্ট ফেলো উইথ আ বিগ হার্ট। খুব কম মানুষ জানে সেই কথা। টিভিতে নেই, খবরের কাগজে নেই, পেজথ্রি-তে নেই। একত্রিশেই এমন বর্ণময় জীবন! এবং তাকে এতটা আড়ালে রাখাও একটা আর্ট। তিন পুরুষের অর্জিত সাধনা।

এই রাস্তা বাটা সুভাষের হাতের তালু। পাহাড়ের প্রতিটা চুলের কাঁটার মত বাঁক ওর মুখস্ত। এমনকী কোথায় স্কারলেট মিনিভেট পাখিদের বাসাবাড়ি, তাও নখদর্পণে। শিলিগুড়ি বয়েজের ক্লাস টিচার দুর্গাবাবু এই পাখির বাংলা নাম শিখিয়েছিলেন সুভাষকে। আলতাপরি। অঙ্কে মাস্টার্স সুভাষের জীবনে যদি একটাও বাংলা শব্দ গেঁথে গিয়ে থাকে, তা হল এই শব্দটা। আলতাপরি। আর ঠিক দুটো মাত্র বাঁক, তারপরেই মেল্লি চেকপোস্ট। কমার্শিয়াল ট্যাক্সের এই চেকপোস্ট থেকে খানিকটা দূরে একটা কফি ক্যাফে। মিলন-জী ওখানেই আসবেন। ঘড়ির কাঁটা ধরে।

ক্যাফের সামনে সামান্য একটু পার্কিং লট। পাহাড়ে যেমনটা হয়। লুকিংগ্লাসের দিকে না তাকিয়েই ইঞ্চি মিলিয়ে নিখুঁত পার্ক করে সুভাষ। স্টিয়ারিং যেন পোষা ল্যাব্রাডর। আর এই ক্যাফেটা আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তিন দিকে বড় কাচের জানালা। তিনদিকেই পাহাড়। নীচে বয়ে চলেছে তিস্তা। গাঢ় সবুজ দেখায় তার জলের রং। খরস্রোতা তিস্তায় এত সকালেও র‍্যাফটিং চলছে। নানান রঙের র‍্যাফট। মোচার খোলার মত উঠছে, নামছে আর ভেসে চলেছে তিস্তার সবুজ জলে। আর উচ্ছ্বল আওয়াজ ভেসে আসছে। এতটা উঁচুতে সেই আওয়াজের তীব্রতা কমে আসে ঠিকই কিন্তু র‍্যাফটে বসে থাকা মানুষজনের বডি ল্যাঙ্গোয়েজ থেকে মালুম পড়ে ওই অতটা নীচে আনন্দোচ্ছ্বাসের ডেসিবেল কতটা হতে পারে। এক মাগ ক্যাপুচিনো আর একটা ওট কুকি টেবিলে রেখে গেছে নেপালি ছেলেটা। সদ্য কামানো ফর্সা মুখে নীল আভা। আহা, ছেলেটার প্রোফাইল তো একদম টম ক্রুজের মত। জ'লাইনও।

পিঠে একটা ভারি হাত পড়ায় চমকে ওঠে বাটা সুভাষ। মিলন-জী। ঘড়ির দিকে তাকায় সুভাষ। সাতটা উনত্রিশ। মিলন গোম্বু মানুষটাই এমন। ওঁকে দেখে ঘড়ি মিলিয়ে নেয় পুলিশ লাইনের লোকেরা। খাকির প্রাচীন প্রবাদ।

'অফলেট, সময় কো মতো তিমলে পানি বুঝনু থালেও?'

'আপনাকে দেখে শিখছি, মিলন-জী' উঠে দাঁড়ায় সুভাষ।

'কফি বলো নি, কবে থেকে এমন কিপটে হয়ে গেলে তুমি। কহিলে দেখি এস্তো নির্ধনভায়ো?', লেগপুলিং শুরু করলেন মিলন গোম্বু।

'শোনো, সি ফোর এক্সপ্লোসিভ ভালমত ইউজড হলে কোনও ফুটপ্রিন্ট থাকে না। নেইও। ফরেনসিক কনফার্ম করেছে যে আগুন এবং বিস্ফোরণে 'গ্লোবাল কেমিক্যালস' উড়ে গেছে তা শর্টসার্কিট থেকেই। তবু...'

'তবু কী মিলন-জী?' ভ্রূতে ভাঁজ পড়ে বাটা সুভাষের।

'তবুও ইনটেল মেসেজ। সামথিং অরেঞ্জ ইজ লাইকলি টু হ্যাপেন', এই একটা সেনটেন্স নিয়ে পড়ে আছেন দাত্তা সাহেব। ছেলেটি ইয়াং, ইনকুইজিটিভএবং অসম্ভব শার্প একজন অফিসার।'

'এনি অ্যাডভাইস, মিলন-জী?'

'নাথিং অ্যাজ সাচ, তবে ননেকে বলে দিও টেলিফোন ইউজ না করতে। টেকনোলজির ভাল-মন্দ, দুটো দিকই আছে। এবং তার ট্রেইল থাকে। ফোনে বোলো না। লোক পাঠাও।'

কফির দাম জোর করে নিজেই দিয়ে দেন মিলন গোম্বু। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন,

'ইয়োথাও দেখি কার্তোক মনাস্টারি ছে আশি কিলোমিটার পড়ছ। মাঝে কুড়ি কিলোমিটারের

একটা স্ট্রেচ জুড়ে রাস্তা খারাপ আছে। আমার সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগে এই পথটা, তুমি তো বোধহয় আড়াই ঘণ্টায় শেষ করবে। এনিওয়ে, এসো এখন। শি ইজ ওয়েটিং ফর ইউ। নতুন অ্যাসাইনমেন্ট ওয়েট করছে তোমার জন্য। আর এই খাদা-টা রাখো, সময় পেলে লোপেন-কে দিও। বাই সুভাষ, টেক কেয়ার। হোশিয়ার সঙ্গো জাও, ল?'

মিলন গোম্বু নিজের মারুতি জিপসিতে রওনা দিলেন শিলিগুড়ির দিকে। অপসৃয়মাণ ওই সবুজ জিপসির দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রণাম করে সুভাষ। কার্তোকের ওই অরফ্যানেজ থেকে বড় হয়ে ওঠা মিলন গোম্বু পুলিশের চাকরি বেছে নিয়েছেন স্রেফ মানুষের ভাল করার জন্য। যে ঝুঁকি নিয়ে উনি 'কোডগ্রিন'-এর প্রতিটা অপারেশনকে মা-পাখির মত ডানা দিয়ে আড়াল করে চলেছেন, ভাবা যায় না।

আজ রাস্তায় ট্র্যাফিক অনেক কম।

বোলেরো ছিটকে বেরোয় পার্কিং লট থেকে। সুভাষ জানে পাহাড়ে দুর্ঘটনা কম ঘটে। কারণ ড্রাইভার সতর্ক থাকে। সুভাষও সতর্ক। প্রতিটা ইন্দ্রিয় সজাগ। সুভাষের এই পথচলা হয়ত একদিন কোনও এক ব্লাইন্ড লেনে গিয়ে শেষ হবে কিন্তু আপাতত সামনে খোলা রাস্তা। ডাইনে পাহাড়। ওপরে নীল আকাশ এবং বাঁ-পাশে সবুজ ফিতের মত তিস্তা।

ইয়াকসামের প্রাণকেন্দ্র হল 'রেডপান্ডা ট্যুরস্ অ্যান্ড ট্রাভেলস।' সারা পৃথিবী থেকে কত ট্রেকার যে আসে ধনরাজের এই ছোট্ট অফিসঘরে। জোংরি এবং গোচালা ট্রেক রুট খুব জনপ্রিয়। সকালের দিকেই বেশিরভাগ ট্রেকার যে যার পোর্টার, ইয়াক, ওয়াকিং স্টিক এইসব নিতে আসে ধনরাজের অফিসে। এতক্ষণে বেশিরভাগ ট্রেকারই রওয়ানা দিয়ে দিয়েছে। দু-একটা গ্রুপ বাদে। 'রেডপান্ডা ট্যুরস্ অ্যান্ড ট্রাভেলস্'-এর লাগোয়া এক রেস্টুরেন্টে এই মুহূর্তে অপেক্ষায় বাটা সুভাষ। দুপুর শুরু হওয়ার সময় ইয়াকসাম মোটামুটি ফাঁকা। এই রেস্টুরেন্টও।

একটু বাদে ধনরাজের অফিস থেকে বেরিয়ে এক সদ্য তরুণ এগিয়ে আসে সুভাষের দিকে,

'হোজুর, ম নামস্যাং শেরপা। ম্যাডাম লে তপাইলাই লগেরা জানু ভন্নু ভায়েকো ছ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ নামস্যাং।'

নামস্যাং-এর পিলিয়নে বসে কার্তোক মনাস্টারিকে ডাইনে রেখে একটু এগিয়েই 'দ্য হরাইজন'-এর ক্যাম্পাসে ঢোকে নামস্যাং-এর বাইক। বিরাট ক্যাম্পাস জুড়ে কোথাও মেয়েদের সেলাই শেখানোর স্কুল, কোথাও ফুড প্রসেসিং-এর ট্রেনিং ইউনিট, কোথাও বা শাড়ি ডাই করা শেখানো হচ্ছে হাতে কলমে। অরফ্যানেজের দিকটায় বাচ্চাদের স্কুল, বাস্কেটবল খেলার কোর্ট। কী নেই! তিনপুরুষ ধরে ইয়োলমো-রা তিল তিল করে বাড়িয়ে গেছে এই বিরাট কর্মযজ্ঞ এবং সম্পূর্ণ নিজেদের পয়সায়। এখন অবশ্য দেশ বিদেশ থেকে এইড আসে এই মডেল অরফ্যানেজ এবং 'হোম'-এ। প্রায় মিনিট দুয়েক হেঁটে গেস্ট হাউসে পৌঁছয় ওরা। লাউঞ্জে একা অপেক্ষা করে সুভাষ। সামনে পোড়ামাটির তৈরি স্লিপিং বুদ্ধা।

'থ্যাঙ্ক ইউ সুভাষ, এত সুন্দর একটা লিপস্টিক

সি ফোর এক্সপ্লোসিভ ভালমত ইউজড হলে কোনও ফুটপ্রিন্ট থাকে না। নেইও। ফরেনসিক কনফার্ম করেছে যে আগুন এবং বিস্ফোরণে 'গ্লোবাল কেমিক্যালস' উড়ে গেছে তা শর্টসার্কিট থেকেই। তবু... ইনটেল মেসেজ। সামথিং অরেঞ্জ ইজ লাইকলি টু হ্যাপেন', এই একটা সেনটেন্স নিয়ে পড়ে আছেন দাত্তা সাহেব। ছেলেটি ইয়াং, ইনকুইজিটিভএবং অসম্ভব শার্প একজন অফিসার।

গিফট করার জন্য।'

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসেন রাধারাণী। দু কাপ চা ইলেকট্রিক কেটল্ থেকে নামিয়ে একটা এগিয়ে দেন সুভাষের দিকে।

'শোনো সুভাষ, নাগরাকাটা, মাটিয়ালি এই এলাকা থেকে গত একমাসে ছয়জন মেয়েকে উদ্ধার করে এখানে এনেছি আমরা। খুব তাড়াতাড়ি আরও বড় একটা রেসকিউ অপারেশন করতে হবে। মংরা এবং এইচডি একেবারে গ্রাউন্ড লেভেলে ব্যাপারটা দেখছে।'

'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন?' রাধারাণীকে থামিয়েই জিজ্ঞেস করে বসে বাটা সুভাষ।

'প্রশাসন নিজের মত চেষ্টা করছে। কিন্তু পলিটিক্যাল লোকেদের একটা বড় অংশ জড়িয়ে পড়েছে এই ট্রেডে। পয়সা উড়ছে বাতাসে। ফাইল থেমে যাচ্ছে হাওয়ায়। প্রপার চ্যানেলে কাজ হতে হতে আরও অনেক মেয়ে চলে যাবে দেশের বাইরে, আরো অনেক আদিবাসী জমি গিলে ফেলবে রিসর্ট হাঙ্গরেরা।'

চুপ করে শুনতে থাকে সুভাষ।

'একটা ন্যাশনাল নিউজপেপারের ব্যাক আপ পাচ্ছি আমরা। তুমি লজিস্টিক এবং টাকার ব্যবস্থা করো।'

চা শেষ করার পর উঠে যাওয়ার সময় রাধারাণী জিজ্ঞেস করেন,

'তুমি কি সরাসরি শিলিগুড়ি ফিরবে এখন?'

'না, মিলন-জী একটা খাদা পাঠিয়েছেন। মনাস্টারিতে লোপেন-কে, আই মিন, বৃদ্ধ লামাকে দেওয়ার জন্য।'

দরজা খুলে বেরিয়ে আসার ঠিক আগে আবার ডেকে ওঠেন রাধারাণী,

'এক মিনিট, সুভাষ। একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ, সমাজে নামডাক আছে সে যদি সেক্সুয়াল প্রিডেটর হয়ে ঘুরে বেড়ায় কেমন লাগবে তোমার?'

'এলিমিনেট না করা অবধি শান্তি নেই।'

একটু থেমে কয়েকটি বাংলা কবিতার বই এবং গোটা দুয়েক উপন্যাস ভেতরের ঘর থেকে নিয়ে আসেন রাধারাণী,

'কোনও তাড়াহুড়ো নেই। আগে আরও অনেক কাজ আছে। তবে পড়ে দেখো, নামী লেখক। সাদা পাঞ্জাবীতে কোনও দাগ নেই। কিন্তু একজন আদ্যোপান্ত সেক্সুয়াল প্রিডেটর।'

বইগুলো হাতে নিয়ে চমকে ওঠে বাটা সুভাষ।

১২।

নিজের বাইকে আরাত্রিকা ম্যাডামকে নিয়ে ঠিক সন্ধের মুখে একটু বেরিয়েছিল এইচডি। কুন্ডুর কয়েকটা জমি দেখায় ম্যাডামকে। যে জমির মা বাপ নেই, যে জমি চা-বাগানের কিংবা সরকারি, সেইসব জমি কোন মন্ত্রবলে কুন্ডু এবং ওর দলের লোকেরা রেকর্ড করে ফেলছে, বোঝা দায়। বিএলআরও অফিসে সব জমির ঠিকুজি কোষ্ঠী নাকি কমপিউটারে চলে আসবে। তাই দু-তিনবছর ধরে এই খেলা শুরু হয়েছে। জবর খেলা।

'জমির কাগজ বড় খতরনাক চিজ ম্যাডাম', একবার ঝামেলায় গেলে সিভিল কোর্টে মামলা। আর সিভিল কোর্টে মামলা শেষ হতে হতে এক জীবন মোটামুটি কাবার। তাছাড়া সরকারি জমির হয়ে লড়াইটা করবে কে?'

'তার মানে?'

'মানেটা হল আটষট্টির বন্যায় মধুপুর শহর ভেসে গেছিল। বাড়ি ঘর, মানুষ। অফিস কাছারি... সব। আর ম্যাডাম, অফিস ভেসে গেলে কাগজ ভেসে যায়,কাগজ ভেসে গেলে আরএস ম্যাপ ভেসে যায়। তারপর অ্যাভেলেবল রেকর্ড থেকে ধীরে ধীরে রিকনস্ট্রাক্ট করা হয় সব।'

'মজার খেলা তো, তাতে গোলমাল হয় নি?'

'ওইটাই তো খেলা দিদিমণি। বাসরঘরের ছিদ্র তো ওইখানেই। কোণা কাঞ্চির জমি তো তারপর থেকেই সাপে কাটা রোগী হয়ে ভেলায় ভাসতে শুরু করল। নদীর দিক বদলায় সঙ্গে বদলায় জমি মালিক। আর চর জেগে উঠলে সেখানে লোক বসায় কুন্ডুর দল।'

বিষয়টা মাথায় ঢুকতে সময় লাগবে

আরাত্রিকার। জীবনের কোনও সিলেবাসেই জমি ছিল না ওর। তবে ক্রমশ সড়গড় হয়ে উঠছে।

'ম্যাডাম, একটা নতুন জমি কিনেছি, দেখবেন? এখনও লোক বসাই নি। চারপাশে মুলিবাঁশ লাগিয়েছিলাম বর্ষার আগে।'

আরাত্রিকার মৌন হয়ে থাকাটাকেই সম্মতি ধরে নিয়ে বাইক ইনডং নদীর ধার বরাবর সরু রাস্তায় নামিয়ে ফেলে হরি।

নতুন জমিটাকে দূর থেকে দেখতে পায় এইচডি। বাইক নিউট্রালে নিয়ে আসে। জমির ঢালে গিয়ার ছাড়াই বেশ সুন্দর নামতে থাকে এইচডির দুই চাকা। হঠাৎ আরাত্রিকা বলে,

'থামুন, এইচডি।'

জোরে ব্রেক কষে হরি। ভিজে মাটির রাস্তায় একটু স্কিড করেই থেমে যায় হিরো হন্ডা।

'শুনতে পাচ্ছেন?', আরাত্রিকা গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করে এইচডি-কে।

হেলমেট খুলে নিয়ে হরিও শুনতে পায় গানের আওয়াজ। সঙ্গে গিটারের টুং টাং। ওর জমি থেকেই। বাঁশ ঝাড়ের আড়াল থেকেই ভেসে আসছে গান...

'ভাব দিয়ে খোল ভাবের তালা / দেখবি সে মানুষের খেলা। / ঘুচে যাবে মনের ঘোলা / থাকলে সে রূপনিহারে যার যে ভাব সে জানতে পায় / লালন কয় বিনয় করে।'

'এই গান শুনেছেন আগে, এইচডি?'

'না, ম্যাডাম। এ তো ভাওয়াইয়া নয়।'

'লালন, হরি। লালন সাঁই', অবাক হয় আরাত্রিকা। এই ভর সন্ধেবেলায় গিটার বাজিয়ে লালনের গান গাইছে এত অল্পবয়েসি ছেলেমেয়ে। এরা কারা?

আরও কিছুক্ষণ বাদে ওরা দুজন জমির একেবারে ভেতরে আসে। গোল হয়ে বসে আছে কুড়ি-আঠারোর ছেলেমেয়েগুলো। আরাত্রিকা আর এইচডি-কে দেখে ঈষৎ থমকে গেল কি?

'তোমাদেরই গান শুনছিলাম লুকিয়ে আধঘণ্টা ধরে। রাগ করলে?'

'না, না। আমরা একটু বাদেই ফিরে যেতাম। মধুপুরে।'

'কিছুক্ষণ আরও না হয় রহিতে কাছে', সহজ করার চেষ্টা করে আরাত্রিকা, 'আর একটা দুটো গান কি শুনতে পারি না আমরা?'

গিটারে শব্দ তুলে একটা দুটো নয় বেশ কিছু গান ওদের শোনায় জন্নত, অরিত্র, জোজো, মহুয়া আর কুনাল। এত অল্প বয়েস কিন্তু কী অপূর্ব সুরের সেন্স! অবাক হয় আরাত্রিকা। জন্নত নামের মেয়েটিই ওদের লিড সিঙ্গার। অরিত্র খুব স্মার্ট গিটারে। মহুয়া আর জোজো গান লেখে। কুনাল

মানেটা হল আটষট্টির বন্যায় মধুপুর শহর ভেসে গেছিল। বাড়ি ঘর, মানুষ। অফিস কাছারি... সব। আর ম্যাডাম, অফিস ভেসে গেলে কাগজ ভেসে যায়,কাগজ ভেসে গেলে আরএস ম্যাপ ভেসে যায়। তারপর অ্যাভেলেবল রেকর্ড থেকে ধীরে ধীরে রিকনস্ট্রাক্ট করা হয় সব। মজার খেলা তো, তাতে গোলমাল হয় নি?

কলকাতায় ডাক্তারি পড়ে। ছুটিতে এসেছে। বিদেশি মিউজিকের সঙ্গে ফিউশন আর ব্লেন্ডের কাজটা ওই দেখে। এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে দেখে অবাক হয় আরাত্রিকা। প্রাথমিক আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেলেই জন্নত আরাত্রিকাকে জিজ্ঞেস করে,

'দি, জয়েন্ট চলবে একটা? ব্যাপক হ্যালু। জেনুইন মণিপুর।'

হেসে ফেলে আরাত্রিকা। মিরান্ডা হাউসে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের সময় বেশ কয়েকবার 'জয়েন্ট' ট্রাই করেছে ও। খুব খারাপ যে লেগেছিল তা নয় তবে কোনও নেশাই কনটিনিউ করতে ভাল লাগে

না আরাত্রিকার। তবু ইনডং নদীর ধারে, এই পূর্ণিমার রাত্রে আর একবার ট্রাই করতে খুব ইচ্ছে করে ওর।

'বেশ, আমিই বানিয়ে দিচ্ছি', জন্নত সিগারেট থেকে তামাক বের করতে শুরু করে।

অরিত্র গিটার বাজাতে বাজাতে ভরাট গলায় গেয়ে ওঠে,

'এভরিথিং গনা বি অলরাইট... টুগেদার উই ক্যান টেক দিস ওয়ান ডে অ্যাট আ টাইম'।

খুব শিক্ষিত গলা তবু মূলত গিটারই বাজায় অরিত্র। চুলটাও বেশ বব মার্লে টাইপ। ডুয়ার্সের এই জাদু নদীটির পাশে ভিজে ওঠা ঘাসের ওপর আধশোয়া হয়ে এই সদ্য তরুণদের সঙ্গে অনেকদিন বাদে 'কপি', 'স্টোরি', 'হাউস', 'পেজ রিলিজ' এসব ভুলে দশ বছর পিছিয়ে যায় আরাত্রিকা। খুব মৃদু একটা হাওয়া বইছে। বাঁশ পাতার মত কেঁপে উঠছে নদীর জল। জ্যোৎস্নায় ভিজে যাওয়া ইনডং নদীর জল।

'দি, তুমি কি হাই হয়ে গেছ?' মহুয়া জিজ্ঞেস করে আরাত্রিকাকে।

'এক্কেবারেই না', উঠে বসে আরাত্রিকা, 'সেদিন তোমাদের আর্ট গ্যালারিতে দেখলাম না কেন? আমিন মিয়াঁ আর শ্যামসুন্দরের সম্বর্ধনা সভায়? আমি গিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য ওখানে।'

সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। জোজো ওর কচি দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে,

'দিদি, পুরো রসুন এপিসোড।'

'রসুন!'

'হ্যাঁ দি, যাই হোক না কেন পিওর সম্প্রীতির কাঁচা ককটেল। বাপের বিয়েকেও এরা 'রবীন্দ্র-সুকান্ত-নজরুল' সন্ধ্যা করে ছাড়বে। রিনাত মিশেলের টোটাল ফুটবলের মত টোটাল সম্প্রীতি', কুনাল বলে ওঠে।

'হ্যাঁ, দিদি, আমি মুসলমান বলে বহুবার আমায় নজরুলের গান গাইতে ডেকেছে। অ্যাজ ইফ, মুসলমান মেয়েকে দিয়ে নজরুলের গান গাওয়ানোটা একটা পবিত্র কর্তব্য', জন্নত রাগে গনগন করে, 'হোয়াট আ ফাক।'

চলে আসার আগে জন্নত আরাত্রিকার ফোন নম্বর চায়,

'দিদি, তুমি খুব মিষ্টি, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না? কথা হবে না আমার?'

'এই নাও আমার কার্ড। কাউকে দিও না, বোলোও না। একটা মিশনে আছি', ব্যাগ থেকে নিজের কার্ড বের করে জন্নতের হাতে দেয় আরাত্রিকা। জন্নত আরাত্রিকাকে জড়িয়ে ধরে।

আপার চ্যাংমারি ফেরার পথে এইচ ডি আক্ষেপ করে,

'এই কারণেই জমিতে মানুষ বসাতে হয়। পাঁচিল দিতে হয়।'

'কেন এইচ ডি, এই ছেলেমেয়েগুলো কি মানুষ নয়?'

'ঠিক তা নয় ম্যাডাম তবে এইটুকু চ্যাংড়াপ্যাংরাও আজকাল কেমন গাঁজা খাচ্ছে দেখেছেন? মেয়ে দুটোও কম যায় না।'

'আহ্, সব সময় মেয়েদের আলাদা করে দেখেন কেন এইচ ডি?'

এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই হরিদাস সাহার কাছে। মেয়েরা তো আলাদাই। আলাদা মানে আলাদা। আজকাল সব বদলাচ্ছে অবশ্য। পুরুষ মানুষ শুয়ে থাকছে, মেয়েছেলেরা উপরে উঠছে। মেয়েতে মেয়েতেও নাকি হয় এখন। এইচ ডি-র মাথা ঘুরে ওঠে মাঝেমধ্যে। এর থেকে বিএলআরও অফিসের ফাইল অনেক সোজা।

গভীর রাতে, ভোরের অনেক আগেই যখন কচি লেবুপাতার মত নরম সবুজ আলোয় ভরে গেছে জ্যোৎস্নায় সিক্ত হয়ে ওঠা আপার চ্যাংমারি, যখন চরাচর জুড়ে সুরেশ তামাং আর দিনকানা প্যাঁচা বাদ দিলে কেউ জেগে নেই, যখন সন্ধের হ্যালুসিনেশন কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে... আরাত্রিকা কুঁজো গড়িয়ে জল খায় একগ্লাস। পাশের বিছানায় ঘুমন্ত সাবিত্রী। কী একটা মেলাতে গিয়েও মিলছে না। খুব কাছে এসেও হারিয়ে যাচ্ছে। এইসময় খুব অস্থির লাগে নিজেকে। ঘাম হয়, মন

ছটফট করে।

তবু ঘুমনোর চেষ্টা করে আরাত্রিকা।

জন্নতের মুখটা এত চেনা লাগছে কেন?

ওই চোয়াল, ওই চোখ। খুব চেনা। তবু মেলাতে পারছে না আরাত্রিকা।

শেষ কয়েকদিন ঝড় চলে গেছে সৌরভের ওপর দিয়ে। আপাত নিস্তরঙ্গ এই মফস্‌সল শহরের উপকণ্ঠে এত বড় একটা বিস্ফোরণে শুধু 'গ্লোবাল কেমিক্যালস্'ই নয়, কেঁপে উঠেছে গোটা শহরটাই। হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে একটার পর একটা চিঠি, ফ্যাক্স এবং ফোন। যদিও বেশিদিন হয় নি এখানে জয়েন করার কিন্তু কোথাও একটা দায় থেকে যায় এসডিপিও হিসেবে। চেষ্টা তো কম করে নি সৌরভ। মিডিয়া এবং মানুষ জেনেছে শর্ট সার্কিট থেকেই এই বিস্ফোরণ, কিন্তু ডিপার্টমেন্ট জানে সেন্ট্রাল আইবি থেকে মেসেজ ছিল। খুব ধোঁয়াটে একটা বার্তা তবু ছিল এবং ও সেটা আটকাতে ব্যর্থ হয়েছে। আ ব্লাডি ড্যাম ফেলিওর। মেজাজ খিঁচড়ে আছে সৌরভের। অফিসের জানালা থেকে রুদ্রপলাশ দেখা যাচ্ছে। গাঢ় লাল রঙের ফুলগুলোকে দেখেই ওই মেসেজ মনে পড়ে যায় সৌরভের। 'সামথিং অরেঞ্জ ইজ লাইকলি টু হ্যাপেন।'

বহু ফোনকে র‍্যানডম ট্যাপ করার পরও কিচ্ছু পাওয়া যায় নি। ফরেনসিকের সিনিয়র সায়েন্টিস্টের সঙ্গে নিজে কথা বলেছে সৌরভ। এমনিতে এই বিস্ফোরণ ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকেই হয়েছে বলে ওদের ফাইন্ডিং। তবে চান্স খুব কম, প্রায় ধরাও যাবে না, এমন ডিভাইস দিয়েও এটা ঘটানো যায়। যদিও আগুনে সেই ডিভাইসের কোনও ফুটপ্রিন্ট থাকার কথা না। নেইও। তবু মহদিপুরের 'কমলা টকিজ' ঘিরে যার শৈশব কেটেছে, সিনেমার ডায়ালগ মুখস্ত বলে যাওয়া যে বালকের অভ্যেস ছিল তার ভাবনা সেলুলয়েডের রিলের মতই ঘুরবে। কাহিনিতে ট্যুইস্ট অ্যান্ড টার্ন আছে কোথাও। কোনও না কোনও কথোপকথন ইটারসেপ্ট করেছিল বলেই সেন্ট্রাল আইবি-র ওই মেসেজ। এই চটকে যাওয়া আবহেই সোহিনী আসবে আজ। ট্রেনিং-এর পর সৌরভ নিজের হোম ক্যাডারই পেয়েছে, সোহিনী আসাম ক্যাডার। দিল্লি থেকে বাগডোগরা হয়ে গুয়াহাটি। সৌরভের সঙ্গে দেখা করার জন্যই শিলিগুড়িতে ওর এই স্টপ ওভার। সোহিনি, পাঁচ আটের সোহিনী রাঠোর। উত্তপ্ত মাটি অথবা বৈশাখী বাতাসের মতই যার শরীর থেকে ঘাম ও শানেল ফাইভের হলকা, সেই সোহিনীর সঙ্গে কিছুতেই নিজের সব কিছু মেলাতে পারে না সৌরভ।

বহু ফোনকে র‍্যানডম ট্যাপ করার পরও কিচ্ছু পাওয়া যায় নি। ফরেনসিকের সিনিয়র সায়েন্টিস্টের সঙ্গে নিজে কথা বলেছে সৌরভ। এমনিতে এই বিস্ফোরণ ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকেই হয়েছে বলে ওদের ফাইন্ডিং। তবে চান্স খুব কম, প্রায় ধরাও যাবে না, এমন ডিভাইস দিয়েও এটা ঘটানো যায়। যদিও আগুনে সেই ডিভাইসের কোনও ফুটপ্রিন্ট থাকার কথা না। নেইও।

ট্রেনিং-এর সময়েই একবার সিরসা-তে গিয়েছিল সৌরভ এবং আর কয়েকজন ব্যাচমেট। সোহিনীরা পুসত্যায়নি জমিদার। ওর বাবা টিপিকাল হরিয়ানভি। বিরাট প্রাসাদের ছাদ থেকে ডানহাতের তর্জনি তুলে সামনের আদিগন্ত সবুজ গমের ক্ষেত দেখিয়ে বলেছিলেন,

'যাঁহা তক তুমহারা নজর যায়ে, উহা তক হামারি হি জমিন।'

তবু ট্রেনিং-এর দিনগুলি থেকেই সৌরভ শুনে এসেছে ওকে দেখলেই নাকি হার্টের একটা বিট মিস্ করে সোহিনী। সৌরভ জানে এই মোহ কেটে যাবে

একদিন কিন্তু এত ইঙ্গিত, এত ইশারাতেও কোনও কাজ হয় নি। দেখা যাক জীবন কী বলে। আনটিল ফার্দার অর্ডার, সোহিনী সেই পতঙ্গ যে ভুল আগুনে ঝাঁপ দেবে বলে মনঃস্থির করেই ফেলেছে। সৌরভের শৈত্য ওকে দূরে সরাতে পারে নি। জীবনের প্রেক্ষাপটও। মহদিপুর পিএইচই বাংলোর কেয়ারটেকারের ছেলে সৌরভ দত্ত যার মা রাত গভীর হলে উঠে যেত বাংলোর দোতলায়, বাবা নীচে শুয়ে থাকত বেহুঁশ মাতাল হয়ে।

বাগডোগরা এয়ারপোর্টে দুটোই মাত্র কনভেয়ার বেল্ট। এক নম্বর বেল্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সোহিনী। ঘোড়ার লেজের মত চুল,

সৌরভের শৈত্য ওকে দূরে সরাতে পারে নি। জীবনের প্রেক্ষাপটও। মহদিপুর পিএইচই বাংলোর কেয়ারটেকারের ছেলে সৌরভ দত্ত যার মা রাত গভীর হলে উঠে যেত বাংলোর দোতলায়, বাবা নীচে শুয়ে থাকত বেহুঁশ মাতাল হয়ে।

গম রঙের ত্বক এবং সেই আগুনের হলকা। বাইরে বেরিয়ে এল যখন সৌরভ ওর ট্রলিটা নিয়ে নেয়। নিজেই ড্রাইভ করে এসেছে আজ। ভিআইপি পার্কিং লটে পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে সোহিনী,

'ডোন্ট বি সো মরোজড বেবি, ইটস্ নট ইয়োর ফল্ট। থোরা সা তো মুসকুরা দো দাত্তা সাহাব। একটু হাসুন।'

বাংলায় সোহিনী তুমি আপনি গুলিয়ে ফ্যালে। এবারে সত্যি সত্যি হেসে ওঠে সৌরভ।

আজ অপরাহ্নের আকাশ ঘন নীল, আজ বিহার মোড়ের পুলিশ কিয়স্কে বসন্তবৌরি। দার্জিলিং মোড়ে এতটুকু জ্যাম নেই। আজ দু'জন তরুণ আই পি এস অফিসারকে স্বাগত জানাতে কোনও কার্পণ্য করে নি তরাই-এর এই সুন্দর ছোট্ট শহরটি।

সার্কিট হাউসের তিন নম্বর স্যুইটে সময় থমকে আছে বহুক্ষণ। সোহিনীর আওয়াজ চাপা দেওয়ার জন্য কেবল টিভিতে সিনেমা চালিয়ে দেয় সৌরভ। তপ্ত বালির ওপর প্রথম বৃষ্টির মাতাল করা সোঁদা গন্ধে ভরে গেছে এই কুড়ি বাই কুড়ির চতুর্ভুজ। রাঠোর যুবতীর ঘাম আর শানেল ফাইভে, সৌরভ দত্ত নামের দ্বিধা থরথর এক চাবুক শরীরে মর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিসার রচিত হচ্ছে। চম্পাসারির কুহক বাতাস সাক্ষী। গজল গাইতে গাইতে ঘরে ফিরছে পাখির দল। ট্র্যাফিক সিগন্যালে শ্রাবণী সেন। ক্লান্ত দুটো মানুষকে উপেক্ষা করে সার্কিট হাউসের কুড়ি বাই কুড়ি তিননম্বর স্যুইটের কেবল টিভিতে সিনেমা। সোহিনীর চুলে মুখ ডুবিয়ে সৌরভ সলিলকির মত বলে ওঠে, 'হিন্দুস্থানমে যব তক সানিমা হ্যায়, লোগ চুতিয়া বন্‌তে রহেঙ্গে।'

সব বিকেলই একসময় শেষ হয়। আজকের বিকেলও শেষ হল নিজের নিয়মে। সন্ধে এল। দার্জিলিং মোড়ের হেরিটেজ হোটেলে ক্যান্ডেল লিট ডিনার শেষে দুজনে দুদিকে ফিরে গেল একসময়।

'ওয়ান মোর কিস্ ফর দ্য রোড', সোহিনীর শুভরাত জানানোর এমনটাই ধরণ।

'শ্যাল পিক ইউ আপ অ্যাট থার্টিন ফিফটিন', সৌরভ মনে করিয়ে দেয়, 'ফ্লাইট ছাড়ার অ্যাটলিস্ট পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে পৌঁছোতে হবে।'

কিছু সময় মানুষ একা হয়ে যায়। যেমন একা এখন সোহিনী রাঠোর। বিকেলের বাগডোগরা, সন্ধের চম্পাসারি, রাতের মোমবাতি আলো পেরিয়ে একা একটি মানুষ। সোহিনী রাঠোর, আই পি এস। তবু কিছু অদৃশ্য সুতোয় সবাই জড়িয়ে মড়িয়ে আছে। বাসি বিছানার ওপর অবহেলায় পড়ে থাকা মিস্ রাঠোরের মোবাইল বেজে ওঠে,

'ইয়েস।'

'ম্যাডাম, দিস ইজ মিলন। ডিএসপি ডিআইবি মিলন গোস্বু হিয়ার। নিড টু মিট ইউ আর্লি ইন দ্য মর্নিং। দেয়ার ইজ আ ক্যারিয়র ফর ইউ। গুডনাইট।'

(চলবে)

তাজ্জব মহাভারত

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

যুধিষ্ঠির সিদ্ধান্তে এলেন রাতেই গোপনে অভিযান চালাতে হবে সাগরদেশের দূতাবাসে। সেইমত তৈরি হয়ে পাঁচ ভাই বের হলেন গভীর রাতে। সাথে বাহুবলী। ভুসুকুর ফিরে আসার সংবাদে বিচলিত দুর্যোধন নির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না। কর্ণকে নিয়ে রাতের বেলা তিনিও ছটফট করছিলেন কিছু করার জন্য। ভূতমিত্রের আশ্রমে যজ্ঞের আগুন জ্বলবে জ্বলবে করছে। চূড়ান্ত ব্যস্ততা। তার মধ্যে সকলের অগোচরে ভুসুকু আর চার্বাক বেরিয়ে পড়ল পথে। মধুক্ষরার সাথে দেখা করবে ভুসুকু। এই সব যখন চলছে তখন গভীর রাতে হস্তিনাপুরের সীমানায় প্রবেশ করেছেন পুন্ডরীকাক্ষ ধুর্জটিবর্মা। তাঁর লক্ষ্য সাগরদেশের দূতাবাস। কী হবে এবার?

৩৯

প্রাচীর টপকে এক এক করে সবাই ভেতরে ঢোকার পর একটা বড় ঝোপের আড়ালে ওরা আশ্রয় নিল। অন্যান্য দূতাবাসগুলির তুলনায় ছোট হলেও অনেকটা জায়গা। ইতিউতি মশাল জ্বলছে। লোকজনের গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। অদূরে পশুশালা থেকে অবশ্য টুকটাক শব্দ ভেসে আসছিল। দূতাবাসের সামনের দিকে না গেলে স্পষ্ট কিছু বোঝা সম্ভব নয়। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেলেই প্রহরীদের চোখে পড়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

যুধিষ্ঠির সংক্ষেপে সব বুঝিয়ে দিলেন। যথাসম্ভব লুকিয়ে থেকে সব কিছু জেনে নিতে হবে। ভোর হওয়ার ঠিক আগে ফিরে আসতে হবে এই ঝোপের আড়ালে। খুব দরকার না পড়লে প্রহরী বা অন্য কাউকে আঘাত করার দরকার নেই।

ছায়ামূর্তির মত ছ-জন এবার ঝোপের আড়াল থেকে এক এক করে বেরিয়ে সামনের গাছপালা আর অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সবার আগে যুধিষ্ঠির। বাকিরা একটু দূরে ছড়িয়ে থেকে তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করল। কিছুটা এগোতেই দেখা গেল একটা বড় আকারের ভবন। যুধিষ্ঠির একটা বড় গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে ভাল মত পর্যবেক্ষণ করে নিলেন। তাঁরা ভবনের পেছন দিকে রয়েছেন। সেদিক দিয়ে ভেতরের যাওয়ার একটা দ্বারও চোখে পড়ছে। সেখানে মশাল জ্বলছে একজোড়া। দুটো মুশকো চেহারার প্রহরী গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। তাঁদের একজনের হাতে ধনুক।

যুধিষ্ঠির ঠোঁট সরু করে একটা শিস দিলেন। মনে হল যেন কোন পাখি ডাকল। প্রহরী দুটি গল্প থামিয়ে এদিক ওদিক তাকাল একবার। তারপর আবার মেতে গেল গল্পে।

একটা গাছের আড়াল থেকে ভীম বেরিয়ে এসে হেলতে দুলতে এগোতে শুরু করল ভবনের দিকে। তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা। একটু এগিয়ে যেতেই প্রহরীরা গল্প থামিয়ে হাত তুলে বলল, 'এই! সাবধান! এদিকে আসার আদেশ নেই!'

ভীম তৎক্ষণাৎ থেমে গিয়ে একটু নাকি সুরে বলল, 'ইয়ে মানে নতুন তো! ঠিক বুঝতে পারছি না!'

'নতুন মানে?'

'আজই এসেছি। ভাবছিলাম, রাতের বেলায় একটু ঘুরে ঘুরে দেখে নিই। দিনে তো সময় হবে না।'

'কী বলছেন বুঝতে পারছি না।' প্রহরী দুটো একটু এগিয়ে এল। যার হাতে ধনুক সে এখনো তাতে শর যোজনা করে নি। তার মানে তাঁরা খুব একটা চিন্তিত নয়।

'এখানে প্রতিদিন কেউ না কেউ আসছেন। আপনি কি তাঁদের ভৃত্য?'

'আমি পাচক।' বলতে বলতে ভীম একটু এগিয়ে যায়। 'এটা কার ভবন?'

'এই ভবন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য পাচক মশাই। তবে এই মুহূর্তে তেমন বলতে একজনই আছেন।'

'কী নাম তাঁর?'

ওদের মধ্যে দূরত্ব আর মাত্র কয়েক হাত। যে রক্ষীটি কথা বলছিল সে এবার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'সে সংবাদে আপনার কী কাজ পাচক মশাই?

ক্ষিপ্র চিতা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভীম। মুহূর্তের মধ্যে রক্ষী দু-জন দুটি প্রবল পদাঘাতে দু-দিকে ছিটকে পড়ে মূর্ছা গেল। বাকিরা আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে চলে গেল ভবনের ভেতরে। দ্বার পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই একটা কক্ষ চোখে পড়ল ভীমের। সম্ভবত রক্ষীদের বিশ্রাম কক্ষ। তিনি অচেতন দুই প্রহরীকে কাঁধে তুলে অবলীলায় সেই কক্ষে রেখে দরজা বন্ধ করে দিলেন বাইরে থেকে।

ভবনটি দ্বিতল বিশিষ্ট। নিচ তলায় কাউকে দেখা গেল না। সিঁড়ি বেয়ে সন্তর্পণে দোতলায় উঠে এল ওরা। এবার দেখা গেল সেখানে অল্পস্বল্প পাহারা রয়েছে। গুটি কয়েক রক্ষী এবং

দাসদাসীদের দেখা গেল যাতায়াত করতে।

'ওই কোণার দিকে কোনও কক্ষে কেউ আছে।' ফিসফিস করে বাকিদের বললেন যুধিষ্ঠির। 'কিন্তু সেখানে যেতে গেলে ওদের চোখে পড়ে যাব। দাস সেজে কাউকে যেতে হবে।'

'আমি যাই?'

'না।' ভীমের উৎসাহে জল ঢেলে দিলেন যুধিষ্ঠির। 'অর্জুন কোথায়?'

'এখানে ঢোকার পর থেকে তাঁকে দেখতে পারছি না।'

'তা হলে আমিই যাই।'

বাকিদের অপেক্ষা করতে বলে যুধিষ্ঠির আড়াল থেকে সাবধানে বেরিয়ে এলেন। সামনের প্রশস্ত কক্ষটি আসলে সভাকক্ষ। কক্ষের অপর প্রান্তে পাশাপাশি কয়েকটি দ্বার। তার বিশেষ একটি দিয়ে দাসদাসীরা যাতায়াত করছে। যুধিষ্ঠির একটি থামের পাশে দাঁড়ালেন। এদিক ওদিক তাকাতেই দেখতে পেলেন দুই হাতে দুটি কলস নিয়ে একজন দাস খুব সন্তর্পণে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'আমায় একখানি কলস বহন করতে দিন।'

দাসটি যুধিষ্ঠিরকে এক পলক দেখে নিয়ে বলল, 'নতুন নাকি?'

'এখানে এই প্রথম।'

'ভালই হল। এই মহলে দাসের সংখ্যা খুব কম। ভাল করে কলসটি ধর।'

'কী আছে এতে?'

'সোমরস।' দাসটি হাসল। 'একটু আগে দু-জন মহাপ্রতাপশালী অতিথি এসেছেন। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে। সোমরসের বন্যা বইছে।'

'তাঁরা কারা?'

'দুর্যোধন আর কর্ণ।'

যুধিষ্ঠির এবার আর অবাক হলেন না। চুপচাপ কলস বহন করে চললেন দাসের পিছু পিছু। রক্ষীরা তাঁদের দেখেও দেখল না।

'তুমি কক্ষে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে থাকবে।' দাস মুখ ঘুরিয়ে জানিয়ে দিল। 'ওনাদের কাছাকাছি যাওয়ার অনুমতি কেবল আমার আছে, বুঝলে?'

'নিশ্চয়ই।'

আলোচনা কক্ষটি অতি সুপ্রশস্ত। গোল করে সাজান কয়েকটি ছোট ছোট শয্যায় কয়েকজন আধাশোয়া অবস্থায় আলোচনা করছিলেন। বাকিদের চিনতে পারলেন না যুধিষ্ঠির। তবে দুর্যোধন আর কর্ণ যে সেখানে উপস্থিত, সে নিয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। তাঁদের দু-জনকে প্রদীপের আলোয় বেশ ভালমত চেনা যাচ্ছিল দূর থেকেই। যুধিষ্ঠির চেষ্টা করলেন তাঁদের আলোচনা শুনতে। কিছুক্ষণ কান পেতে থাকার পর তিনি বুঝতে পারলেন যে আলোচনার বিষয় হল ভুসুকুর ফিরে আসা। সংবাদটি পাওয়ার পর কী করা কর্তব্য তা দুর্যোধন বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন বাকিদের।

'বাকি কলসটা দাও।'

যুধিষ্ঠির একটু চমকে উঠে কলসটি এগিয়ে দিলেন। 'কী এত মন দিয়ে ভাবছিলে?' কলসটা নিয়ে প্রশ্ন করল দাস। 'এখানকার কাজে এত অন্যমনস্ক থাকলে চলবে না।'

কলস হস্তান্তর করে যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমি কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব?'

'বাইরে বেরিয়ে একবার পাকশালে গিয়ে জেনে এসো সোমরস পর্যাপ্ত তৈরি হল কি না। হয়ে থাকলে দুটি কলস ভরে নিয়ে আসবে।'

যুধিষ্ঠির মাথা একদিকে কাৎ করে সম্মতি জানিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল। তারপর সন্তর্পণে ফিরে এল আগের জায়গায়। সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সেখানে। যুধিষ্ঠির সংক্ষেপে সব জানিয়ে দিয়ে বললেন, 'গোটা ব্যাপারটার সাথে সাগরদ্বীপের এই দূতাবাসের সম্পর্ক এবার প্রমাণিত হল। এখন আমাদের জানতে হবে এই দূতাবাস আসলে কারা চালাচ্ছে। ভোর হতে দেরি নেই। আমাদের চটপট একবার পুরো দূতাবাস ঘুরে দেখে নিতে হবে। আলো ফোটার ঠিক আগে ওই ঝোপটার ওখানে আমরা একত্র হব।'

আবার পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে ওরা দূতাবাসের বিভিন্ন দিকে ঘুরে বেড়াতে শুরু

আলোচনা কক্ষটি অতি সুপ্রশস্ত। গোল করে সাজান কয়েকটি ছোট ছোট শয্যায় কয়েকজন আধাশোয়া অবস্থায় আলোচনা করছিলেন। বাকিদের চিনতে পারলেন না যুধিষ্ঠির। তবে দুর্যোধন আর কর্ণ যে সেখানে উপস্থিত, সে নিয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। তাঁদের দু-জনকে প্রদীপের আলোয় বেশ ভালমত চেনা যাচ্ছিল দূর থেকেই।

করল। দূতাবাসের সামনের দিকে অনেকগুলো অস্থায়ী কুটির দেখতে পেল তাঁরা। মোষের গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামাচ্ছিল কয়েকজন দাস। বেশ কয়েকজন দীর্ঘদেহী রক্ষীও চোখে পড়ল ওদের। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে তাঁরা আসলে শক্তিশালী সৈনিক। সব মিলিয়ে দূতাবাসের সামনের দিকে কিছু কিছু কর্মতৎপরতা দেখে যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন যে বেশ দ্রুততার সাথে এখানে কোনও বিশেষ কাজ চলছে। দূতাবাসগুলি নিজেদের নিরাপত্তার জন্য যতজন সৈনিক ও রক্ষী রাখতে পারে, এখানে সেই সংখ্যা তার কয়েকগুণ।

'এখানে কিছু একটা গোপনে চলছে রে বড়দা!' সহদেব ফিসফিস করে বলল। বাকিরা একমত হলেন সে কথায়। 'মনে হয় ভাল করে খুঁজলে এখানে অস্ত্রাগারের সন্ধানও পাওয়া যাবে।' মহাবলী জানালেন। সে কথাতেও সমর্থন জানাল সবাই। কিন্তু ততক্ষণে আকাশ পরিষ্কার হওয়ার প্রাথমিক লক্ষণগুলো বোঝা যাচ্ছিল। তাই যুধিষ্ঠির নির্দেশ দিলেন ফিরে যাওয়ার জন্য।

ওরা দাঁড়িয়েছিল গাছপালায় ঢাকা একটা ছোট প্রাঙ্গণে। অদূরে একটা মহল। কিন্তু সেটা নিষ্প্রদীপ। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ শুনে সবাই সেই মহলের পাশ দিয়ে দূতাবাসের পেছন দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই চারজন সশস্ত্র রক্ষী সেই মহল থেকে বেরিয়ে এসে ওদের উদ্দেশে আদেশের সুরে বলল, 'একদম নড়বেন না!'

চারজনের মধ্যে দু-জনের হাতে উদ্যত ধনুক। বাকিদের হাতে খোলা তলোয়ার।

'বেশ কিছুক্ষণ ধরে আপনাদের এখানে ঘুরে বেড়াতে দেখছি। আপনাদের পরিচয়?'

ভীমের মুঠি দুটো শক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁকে নিরস্ত করলেন। বিপক্ষে দুই তিরন্দাজ যদি শর নিক্ষেপ করে তবে দু-জন গুরুতর আহত হবে। মৃত্যুও হতে পারে। ওরা চারজন আরও একটু এগিয়ে এলে তখন আক্রমণের কথা ভাবা যাবে।

'উত্তর না পেলে আমরা আপনাদের বন্দি করতে বাধ্য হব।'

কিন্তু উত্তরের প্রয়োজন হল না। একজন তিরন্দাজের ধনুক তাঁর হাতে থাকা অবস্থাতেই দু-টুকরো হয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় অপর তিরন্দাজ এদিক ওদিক তাকাল বিস্মিত হয়ে। তারপরই দেখা গেল তাঁরও ধনুক টুকরো হয়ে ঝুলছে। বাকি দু-জন এইসব দেখে কয়েক পলকের জন্য ভুলে গিয়েছিল যে সামনে কেউ আছে কি না।

নকুল আর সহদেবের কাছে সেই কয়েক পলকই ছিল যথেষ্ঠ। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই তরোয়ালধারীকে কুপোকাৎ করে ফেলল তারা। তারপর গলার বিশেষ জায়গায় চাপ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল বেশ খানিকক্ষণের জন্য।

ততক্ষণে হতচকিত দুই তিরন্দাজকে দুই হাতে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন ভীমসেন।

'এবার পালা বড়দা!'

নকুলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাঁচজন হাওয়ার গতিতে দৌড়ল দূতাবাসের পেছন দিকে। ছুটতে ছুটতে বাহুবলী বললেন, 'ধনুকগুলো কাটল কে? অর্জুন, তাই না?'

'সে আর বলতে!' দৌড়নো অব্যাহত রেখে যুধিষ্ঠির স্বীকার করলেন। নির্ঘাৎ কোনও গাছে উঠে অর্জুন পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখছিল। প্রায়

অন্ধকারে কেবল গলার আওয়াজ অনুসরণ করে এমন নিপুণ শরনিক্ষেপের ক্ষমতা তৃতীয় পাণ্ডব ছাড়া আর কার আছে?

প্রাচীরের কাছাকাছি আসার পর ওরা পেছন থেকে অর্জুনের গলা পেল। দেখা গেল কিছুটা পেছনে সে-ও দৌড়ে আসছে। হাতে একটা ধনুক।

'এদের ধনুকগুলো ছোট হলেও বেশ সুন্দর।'

হাঁফাতে হাঁফাতে জানাল সে। প্রথমে যে দু-জন রক্ষীকে ভীমসেন ঘায়েল করেছিল তাঁদেরই একজনের তির-ধনুক নিয়ে অর্জুন একটা বড় গাছের ওপর বসে বসে লক্ষ্য করছিল চারদিক। যুধিষ্ঠিরের দিকে অস্ত্র তোলা হয়েছে দেখে আর তির না ছুঁড়ে পারে নি। যদিও হস্তিনাপুরের যুবরাজের দিকে অস্ত্র তোলা মানে মৃত্যু— তথাপি অর্জুন নিজেকে সংযত রেখেই তির ছুঁড়েছে।

'এখানে একটু পরেই সবাই জেনে যাবে। সতর্ক হয়ে যাবে দুর্যোধন।' দড়ি বেয়ে প্রাচীরে উঠতে উঠতে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন যুধিষ্ঠির।

৪০

সকালটা ভারি ঝলমল করছিল। অনেকদিন পর মনে হচ্ছিল যে ভোরের বাতাসে শীতের প্রকোপ কিছুটা কম। নিজের প্রাসাদের লাগোয়া উদ্যানে পাইচারি করতে করতে ভীষ্ম আকাশ বাতাস গাছপালা লক্ষ্য করছিলেন আর ভাবছিলেন বসন্তের সময় খুব একটা দূরে নেই। অচিরেই উদ্যানের গাছপালাগুলি ভরে যাবে সবুজ পাতায়। বিচিত্র বর্ণের ফুলেরা ফুটবে দলে দলে।

ভীষ্ম বেশ প্রফুল্ল বোধ করছিলেন। আজ একটু অন্যরকম উত্তেজনার সম্ভাবনা আছে। মহিষাসুর এসেছেন। তাঁকে হস্তিনাপুরে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। হস্তিনাপুরের জ্ঞানীগুণিদের মধ্যে যাঁরা সেরা, তাঁরা প্রায় সকলেই মহিষাসুরের সাথে সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব। আগামি দিনগুলিতে বেশ কিছু জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শোনার সুযোগ পাওয়া যাবে জেনে ভীষ্মের ভাল লাগছিল।

এ সব ভাবতে ভাবতে আকাশের দিকে তাকালেন ভীষ্ম। চমৎকার মেঘমুক্ত ঝকঝকে আকাশ। মাথার ওপরে একটা পাখি পাক খাচ্ছে। ভীষ্মের ভুরু সহসা কুঁচকে গেল পাখিটির পাক খাওয়া দেখতে দেখতে। পরক্ষণেই মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন তিনি। এ তো তাঁর বার্তাবাহী পায়রা! তার অর্থ সে দেবদূতাবাস থেকে কোনও বার্তা নিয়ে এসেছে!

পায়রা পাক খেতে খেতে নিচে নেমে এল। ভীষ্ম তাঁর বাম বাহু বাড়িয়ে দিলেন। মসৃণভাবে ভেসে এসে পায়রাটি বসল সেই প্রসারিত বাহুতে। তাঁর পায়ের সযত্নে আটকানো ছোট্ট একটি সাদা চৌকো বস্তু দেখা যাচ্ছিল। ভীষ্ম অতি সাবধানে সেটা খুলে নিলেন। এটা কি ভাঁজ করা কোনও গাছের ছাল? এত মসৃণ, পাতলা আর দুগ্ধফেননিভ? ভাঁজগুলি খুলতে হাতের তালুর মাপের একটি চৌকো সাদা টুকরোতে পরিণত হল সেটা। তাতে ঘন কালো কালিতে হস্তিনাপুরি ভাষায় লেখা তিনটি শব্দ— 'যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে এসো'।

ভীষ্ম কয়েক পলক চিন্তা করলেন। দেবদূতাবাসে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ নিয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কখন যেতে হবে তা বলা হয় নি। দেবদূতদের অপেক্ষা করিয়ে রাখা সম্ভব নয়, সুতরাং বিষয়টা অতি গুরুত্বপূর্ণ— পারলে এক্ষুনি যাত্রা শুরু করা কর্তব্য। তবে মহিষাসুরকে স্বাগত না জানিয়ে অকস্মাৎ তিনি যদি উধাও হয়ে যান তবে নগরে আলোচনা হবে। রাজপুরীতেও অস্থিরতা দেখা দেবে। ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে লোকজন যদি খুঁজতে বের হয় তবে সমস্যাও মন্দ হবে না। তারা অন্তত এটা জানতে পারবে যে তিনি আর যুধিষ্ঠির একত্রে কোথাও বেরিয়েছেন।

ভীষ্ম তাই সিদ্ধান্তে এলেন যে আগামীকাল ভোরবেলায় তিনি যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে দেবদূতাবাসের দিকে যাত্রা শুরু করবেন। পথ অনেকটা। সাথে লোকলস্কর চাই। দেবতাদের দূতাবাস হিমালয় পর্বতের একটি বিশেষ স্থানে। ভীষ্ম সে স্থান

চমৎকার মেঘমুক্ত ঝকঝকে আকাশ। মাথার ওপরে একটা পাখি পাক খাচ্ছে। ভীষ্মের ভুরু সহসা কুঁচকে গেল পাখিটির পাক খাওয়া দেখতে দেখতে। পরক্ষণেই মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠলেন তিনি। এ তো তাঁর বার্তাবাহী পায়রা! তার অর্থ সে দেবদূতাবাস থেকে কোনও বার্তা নিয়ে এসেছে!

সম্পর্কে অবহিত। তিনি জানেন গভীরতর অরণ্য অতিক্রম করে পর্বতের সংকীর্ণ ও বিপদজনক পথ বেয়ে যেতে হবে সেখানে। অবশ্য দূতাবাস অবধি যাওয়ার আগে দেবদূতদের সাথে দেখা হওয়াটাও সম্ভব। মূলত তাঁরাই ঠিক করে দেবে যে ভীষ্ম তাঁদের আবাসের কাছাকাছি কতটা যেতে পারবে। সাথে লোকজন নিলেও একটা সময়ের পর তাঁদের কোথাও অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে যেতে হবে। কোথায় অপেক্ষা করাতে হবে তা আগে থেকে ঠিক করা অসম্ভব। সব নির্ভর করছে দেবদূতেরা কী ভেবে রেখেছেন, তার ওপর।

তার পরেই ভীষ্মের মনে হল, আচ্ছা! পাণ্ডবদের তো কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছে না! তাঁরা নগরে আছে তো?

ভীষ্ম দ্রুত পায়ে পাণ্ডবদের মহলের দিকে হাঁটা দিলেন। তবে কিছুটা হাঁটার পর তিনি দেখলেন কুন্তী কয়েকজন দাসীকে নিয়ে কোথায় জানি যাচ্ছে। ভীষ্মকে দেখে তিনি বেশ অবাক হয়ে বললেন, ‘আপনি হঠাৎ এদিকে?’

‘যুধিষ্ঠির কি নগরে আছে?’

‘আজই তো ফিরল।’ একমুখ হেসে বললেন কুন্তী। ‘একটু আগেই ফিরেছে পাঁচ ভাই। আমি তো অবাক!’

‘অবাক হওয়ার কারণ?’

‘দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিল— আপনাকে বলি নি?’

‘সেটা বড় কথা নয়, ফিরে এসেছে জেনে আশ্বস্ত হলাম।’

‘কেন? কী হয়েছে?’

‘এগিয়ে এসো। বলছি!’

কুন্তী কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলেন। কাছে আসতেই ভীষ্ম একটু ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন, ‘যুধিষ্ঠিরকে গিয়ে বলো না ঘুমিয়ে এক্ষুনি যেন আমার সাথে দেখা করে। কাল ভোরবেলা ওকে নিয়ে আমি একটু ভ্রমণে বের হব। কথাটা গোপন রেখো।’

কুন্তী কিছু বলতে চাইছিলেন। কিন্তু ভীষ্ম চূড়ান্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে অন্যদিকে হাঁটা দিয়েছেন। তিনি চিন্তিত ভাবে আবার দাসীদের কাছে ফিরে আসতে একজন দাসী সাহস করে জিগ্যেস করল, ‘সব শুভ তো রাণী মা?’

‘হ্যাঁ মানে যুধিষ্ঠির— ইয়ে মানে এখন ঘুমোচ্ছে— আসলে বলছিলাম কি বড়খোকা এখন ঘুমোচ্ছে মানে কাল যে আবার বেড়াতে যাবে না তার কি কোনও মানে আছে?’

দাসীরা সকলে একবাক্যে স্বীকার করল যে যুধিষ্ঠির আবার আগামিকাল ভ্রমণে যেতেই পারেন।

‘উনি সেটাই বললেন।’ এবার স্বাভাবিক সুরে একটু হেসে বললেন কুন্তী। ‘মূল কথাটা হল যে ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে।’

‘কোনটা রাণী মা?’

‘ওই যেটা উনি গোপন রাখতে বললেন।’

একদন্ড পরে কুন্তীর মহলের সব দাসদাসী জেনে গেল যে ভীষ্ম কিছু একটা গোপন রাখতে বলেছেন কুন্তীকে। আরো একদন্ড পর যুধিষ্ঠির যখন ভীষ্মের সাথে দেখা করবেন বলে তাঁর রথ প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন তখন দেখা গেল তাঁর মহলের দাসদাসীরাও জেনে গেছে বিষয়টি। তবে তাঁরা অবশ্যি যুধিষ্ঠিরের সামনে কিছু বলছিল না।

মহিষাসুরকে হস্তিনাপুরের পক্ষ থেকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানান হলো দিবা দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার দেড় দন্ড পরে। সেটা ছিল রীতিমত একটা

বিরাট ব্যাপার। এক সহস্র বাদ্যকর দামামা, ভেরি ইত্যাদি রণবাদ্য বাজিয়ে অভিবাদন জানাল মহিষাসুরকে। এক সহস্র তিরন্দাজ তাঁর সম্মানে আকাশে সমবেত তিরনিক্ষেপ করলেন। তিরে অবশ্য ফলার বদলে রঙিন ফুল আর মালা লাগান ছিল। সেই পুষ্পবান মাটিতে পড়ার পর কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলা হলেও বিষয়টি সবাই উপভোগ করল। অতঃপর তুমুল করতালির মধ্যে ভীষ্ম উৎকৃষ্ট ক্ষেমবস্ত্র দ্বারা নির্মিত উত্তরীয় জড়িয়ে দিলেন মহিষাসুরের কাঁধে।

হস্তিনাপুরের জনতা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল এইসব দৃশ্য। তবে কয়েকজন অসন্তুষ্ট লোকজনকে দেখা গেল নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে বলছে, 'এই ভাবে অসুর তোষণের কোনও মানে হয়?' এক সময় দেখা গেল অসন্তুষ্টদের একজন ভীড় ঠেলে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসে দ্রুত হাঁটতে লাগল। কিছুটা হাঁটার পর রাজপথ ত্যাগ করে সে ধরল একটা সংকীর্ণ মাটির পথ। সেটা এঁকেবেঁকে গাছপালার মধ্যে দিয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে একটা সরোবরে। এই রকম সাধারণ সরোবরের অভাব হস্তিনাপুরে নেই। সেখানে একটা গাছের তলায় ঘোড়া থামিয়ে একজন অপেক্ষা করছিল। সে আসলে দুর্যোধনের লোক।

'কী বুঝলেন?' লোকটি জিগ্যেস করল।

'যে ভাবে অভ্যর্থনা জানান হল তা যথেষ্ট রাজকীয়। অর্থাৎ হস্তিনাপুরের পক্ষ থেকে মহিষাসুরকে বিশিষ্ট অতিথি রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।'

লোকটি আর কোনও প্রশ্ন না করে ঘোড়ায় চেপে দৌড়োল। বস্তুত মহিষাসুরের আগমন সংবাদে দুর্যোধন বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ভুসুকু সম্মোহিত। পুন্ডরীকাক্ষ চলে এসেছে। সাগরদেশের দূতাবাসে বসে একদল দক্ষ কর্মি দুর্যোধনের হয়ে প্রচারের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন কাজ করে চলেছে। ভূতমিত্রের আশ্রমে যজ্ঞের পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে একটা হাওয়া তোলার পরিকল্পনাও পাকা। এ সবের মধ্যে মহিষাসুরের আগমন মোটেই ভাল বলে মনে হচ্ছে না দুর্যোধনের।

কর্ণ অবশ্যি এতটা বিচলিত নয়। সে আর পুন্ডরীকাক্ষ মোটামুটি একমত যে মহিষাসুর এসেছেন হস্তিনাপুর ভ্রমণে। এখানকার রাজকীয় ব্যাপারে তিনি উদাসীনই থাকবেন। সুতরাং আসন্ন বসন্তকাল জুড়ে দুর্যোধনের হয়ে প্রচার চালানোর পর বর্ষায় যখন গোটা নগরি তিন মাস থমকে থাকবে তখন ঝপ করে করে ফেলতে হবে সেই বিশেষ কাজটি।

কাজটি হল কালকূট প্রয়োগে ভীমসেনকে পরলোকে পাঠিয়ে দেওয়া। যুধিষ্ঠিরের ঘটে বুদ্ধি আছে। দুর্যোধনের যুবরাজত্বের দাবী যখন শক্তিশালী হবে তখন সে যুবরাজ রূপে ভীমসেনের নাম প্রস্তাব করতে পারে। এই অবস্থায় গদাযুদ্ধ ছাড়া উপায় থাকবে না। পাণ্ডবদের হয়ে ভীমসেনই যে যুদ্ধ করতে আসবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই যুদ্ধে দুর্যোধন যে জিতবেনই, তেমন নিশ্চয়তা পুন্ডরীকাক্ষের মধ্যে নেই। এ ব্যাপারে তিনি খুঁত রাখতে চান না। ভীমসেনকে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতি তিনি।

অবশ্য সেটা দুর্যোধনেরও মনের কথা। কিন্তু বর্তমানে যেটা ভাবার তা হল মহিষাসুর কদ্দিন হস্তিনাপুরের রাজকীয় অতিথি হয়ে থাকছেন? তাঁর প্রেরণ করা চর তাঁকে এখন গিয়ে জানাবে যে মহিষাসুর সম্ভবত বর্ষা পার করে যাবেন।

৪১

সেই রাতে হস্তিনাপুর থেকে বেশ কয়েক ক্রোশ দূরে গঙ্গার অপর তীরে একটি ছোট কিন্তু দ্রুতগামী নৌকো এসে ভিড়ল। চারজন দাঁড় টানছিল নৌকোর। পঞ্চম জন দাঁড়িয়ে ছিল নৌকোর সামনের দিকে। নৌকোটি আসলে হস্তিনাপুরের একটি ঘাট থেকে আসছে। গঙ্গার পাড়টা এইখানে বেশ বিপদজনক। রীতিমত খাড়া। পাড়ে উঠলেই বেশ গভীর জঙ্গল। এই স্থানে এখনও বসতি গড়ে ওঠে নি। শীতকাল বলে জলের গভীরতা তেমন

সেই বিশেষ কাজটি হল কালকূট প্রয়োগে ভীমসেনকে পরলোকে পাঠিয়ে দেওয়া। যুধিষ্ঠিরের ঘটে বুদ্ধি আছে। দুর্যোধনের যুবরাজত্বের দাবী যখন শক্তিশালী হবে তখন সে যুবরাজ রূপে ভীমসেনের নাম প্রস্তাব করতে পারে। এই অবস্থায় গদাযুদ্ধ ছাড়া উপায় থাকবে না। পাণ্ডবদের হয়ে ভীমসেনই যে যুদ্ধ করতে আসবে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

নেই। গতিও কম। নৌকোটি তীরের একদম কাছাকাছি আসতেই একজন জলে লাফিয়ে পড়ে সেটাকে আটকে দিল। বাকিদের একজন চটপট দড়ি বের করে ছুঁড়ে দিল পাড়ের দিকে। পাড়ের ওপর অন্ধকারে যে একজন অপেক্ষা করছিল সেটা বোঝা গেল এবার। দড়িটা সে বেঁধে দিল গাছপালার সাথে।

নৌকোয় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি দড়ি ধরে অনায়াসে উঠে গেলেন পাড়ে। বোঝা গেল তিনি এই সব কাজে বেশ পটু। পাড়ে উঠে উল্টোদিকে দণ্ডায়মান ছায়ামূর্তিটিকে বললেন, 'অনেক দিন পর এলাম গর্গ।'

'তুমি তো এই ভাবেই অকস্মাৎ চলে আসো চার্বাক।' গর্গ হাসলেন। 'নৌকোর এগিয়ে আসার ধরন দেখেই মনে হয়েছিল সেটা এখানেই আসছে। তুমি আসছ বুঝি নি। এ ভাবে আরও কয়েকজন আসে। কাছাকাছি আসার পর কৌতুহল দূর হল।'

'তোমার আশ্রমের সংবাদ কী মিত্র?'

'কুশল। এবার আগমনের কারণ বল।'

'আমি দুটি অনুরোধ নিয়ে এসেছি।'

'রাখতে পারলে আনন্দিত হব।'

'বহুকাল পূর্বে দেবতারা যখন শেষবারের মত ধরায় এসেছিলেন তাঁরা পুরোহিতদের কাউকে কাউকে কিছু বিশেষ উপহার দিয়ে যান।'

'হ্যাঁ। যাঁরা সেই উপহার পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আমার পূর্বপুরুষ। সূর্যের গতিপথ নিয়ে তাঁর প্রবল জিজ্ঞাসার পরিচয় পেয়ে দেবতারা তাঁকে একটি আশ্চর্য স্বর্ণ চাকতি উপহার দিয়ে যান। সে চাকতির মাঝে একটি শলাকা আছে। সব সময় সেই শলাকার অবস্থান থাকে উত্তর দক্ষিণে। সেই বিচিত্র দিকনির্ণায়ক চাকতি বর্তমানে আমার কাছে।'

'সেটা কিছুদিনের জন্য ধার চাই। যুধিষ্ঠিরকে দেব।'

'যুধিষ্ঠিরের প্রয়োজন। অবশ্যই দেব। কিন্তু কারণ জানতে পারি?'

'অনেক কথা গর্গ।' চার্বাক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'হস্তিনাপুরের উত্তরাধিকার সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?'

'দুর্যোধন অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী।'

'সমস্যা সেদিক থেকেই। তোমাকে সবই খুলে বলব। কিন্তু তার জন্য তোমাকে হস্তিনাপুরে গিয়ে বর্তমানে থাকতে হবে মিত্র! এটাই আমার দ্বিতীয় অনুরোধ।'

'সানন্দে!' গর্গ তৎক্ষণাৎ বলল। 'সেখানে আমার কাজ কী হবে?'

'আমাদের সাথে থাকা।'

ভীষ্মের মুখে দেবদূতাবাসে উপস্থিত হওয়ার বার্তা পেয়ে যুধিষ্ঠির গোড়ায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। প্রাথমিক উত্তেজনা দূর হওয়ার পর তাঁর মনে হয়েছিল যে হস্তিনাপুরের বাইরে বেশি দিন থাকাটাও উচিত হবে না। যমারণ্য পাড় করে দেবদূতাবাসের দিকে যাওয়ার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পথ আছে যেদিক দিয়ে গেলে পর্বতের পাদদেশে পৌঁছোতে অর্ধেক সময় লাগে। কিন্তু সেই পথে যেতে হলে পেরোতে হবে দিগন্ত পার করা এক তেপান্তরের মাঠ। সে মাঠের কোথাও হালকা অরণ্য, কোথাও ঘাসজমি, কোথাও বন্ধুরতা। কিন্তু বিপদ যেটা সেটা হল দিক হারাবার ভয়। সূর্য এবং নক্ষত্র দেখে দিক ঠিক করে চলার শিক্ষা যুধিষ্ঠিরের

আছে। ভীষ্ম নিজেও এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ। কিন্তু এই শুষ্ক দিনে মাঠ থেকে উঠে আসা ধুলো আকাশে জমে সূর্যকে ঝাপসা করে দেয়। রাতের আকাশও যে সব সময় পরিষ্কার থাকে তা বলা যায় না। সর্বোপরি মাঠের বিশালতা এতটাই যে বহুক্ষেত্রে অভিজ্ঞ দিকদর্শীরও ভুল হয়ে যায়। একবার ভুল দিকে যাত্রা করলে সময় নষ্ট হবে। দিকভ্রষ্ট হয়ে ফিরেও আসতে হতে পারে।

এইসব কারণে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে দেবদূতাবাসের দিকে যাত্রা করাটা বিপদজনক। কিন্তু দিকনির্ণয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে কোনও সমস্যা নেই। যুধিষ্ঠিরের তখন মনে হয়েছিল গর্গের কথা। তাঁর সাথে চার্বাকের যোগাযোগের কথাও জানা ছিল যুধিষ্ঠিরের। চার্বাকই বলেছিল। তাই দেরি না করে তিনি চার্বাককে ডাকিয়ে এনে গর্গের কাছ থেকে দিকনির্ণয় যন্ত্রটি আনিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন তিনি।

দেবদূতাবাসের দিকে যাত্রা করার কথা অবশ্য বলেন নি। কেবল বলেছিলেন যে কয়েকদিন থাকবেন না।

গর্গের প্রসঙ্গ উঠতেই চার্বাকের মনে হয়েছিল যে তাঁকে কিছুদিনের জন্য হস্তিনাপুরে এনে রাখলে মন্দ হয় না। গর্গ অতি বুদ্ধিমান। বিবিধ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান আছে।

'দেখো গর্গ।' চার্বাক মৃদু স্বরে বলতে লাগলেন। 'সৈন্ধব রক্ত আমাদের দু-জনের শরীরেই বইছে। কিন্তু অতীত আমরা মনে রাখি নি। হস্তিনাপুরকে নিজের দেশ বলেই জানি। তাই আমাদের কিছু দায়িত্ব থাকে।'

গর্গ কিছু বললেন না। তারকা খচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। চার্বাকের ইঙ্গিত তিনি বুঝতে পেরেছেন। সৈন্ধবদের একটি গোপন সমিতি যে বহুকাল ধরে হস্তিনাপুরের বিরুদ্ধ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে তা তাঁর অজানা নয়। দুর্যোধন এতদিনে তাঁদের কাজটি সহজ করে দিয়েছে। কিন্তু কুরুবংশে বিভাজন এনে সৈন্ধবদের আদৌ কি কোনও লাভ হবে? দুর্যোধন রাজা হলে হয়ত তাঁদের অনেক সুযোগ সুবিধে দেবেন, কিন্তু তারপর সংঘাত অনিবার্য।

সামরিক শক্তিতে সৈন্ধবরা দক্ষ হতে পারে কিন্তু সুশৃঙ্খল কৌরব বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা একটা অবাস্তব ভাবনা।

'দুর্যোধন যাঁর দ্বারা চালিত হচ্ছেন তাঁকে আমি চিনি চার্বাক। আশ্রমের লোক নিয়মিত হস্তিনাপুরে যাতায়াত করে। তাঁরা প্রত্যেকেই আমাকে বলেছে যে এই মুহূর্তে দুর্যোধনের সব চাইতে কাছের লোক হলো কর্ণ আর লালচুলো।'

'আর লালচুলোর পেছনে কে আছে জান?'

গর্গ এবার একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কে?'

'অল্লরাজ অঙ্গার।'

'বলো কী! কিন্তু সে কি সৈন্ধব?'

'সম্ভবত না। সে বোধহয় সৈন্ধবদের সামনে রেখে হস্তিনাপুর নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন দেখছে।'

গর্গ হঠাৎ সামান্য হতাশার সুরে বলল, 'এখানে আমাদের ভূমিকা কতটুকু চার্বাক? শত হলেও এ হল রাজাগজার ব্যাপার। আমাদের অধিকারই বা কী?'

'যুধিষ্ঠির আমাদের সহযোগিতা সানন্দে গ্রহণ করবেন।'

'বেশ।' গর্গ যেন স্বস্তি পেলেন। তিনি হাততালি দিলেন বিশেষ ছন্দে কয়েকবার। অন্ধকার গাছপালার মধ্য থেকে ছায়ার মত বেরিয়ে এল কয়েকজন। গর্গ তাঁদের নির্দেশ দিতেই তাঁরা আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

'দিকনির্ণায়ক চাকতিটি ওরা তোমাকে এনে দিচ্ছে চার্বাক। তবে হস্তিনাপুরে যাওয়ার আগে আমি কয়েক দিন সময় চাইছি। সময় মত ঠিক চলে যাব। সে নিয়ে তুমি ভেব না। এক অর্থে আমরা সৈন্ধব হয়ে নিজেদের বিরুদ্ধেই পদক্ষেপ নেব— কিন্তু নাগরিক রূপে আমাদের দায়িত্ব সুশাসককে রক্ষা করা। হস্তিনাপুর অতি সুশাসিত একটি রাজ্য। একে নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না।'

দু-জনেই চুপ করলেন। গঙ্গার মৃদু কুলকুল ধ্বনি অন্ধকারে ধারাবাহিক ছন্দে বাজতে থাকল।

(চলবে)

ধরা যাক, মেয়েটির নাম বর্ষা মুর্মু

জ্যোতির্ময় বিশ্বাস

ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। একবার বর্ষাকালে গেছি মামাবাড়ি। তো, আমার নিত্যনতুন কর্মপদ্ধতিতে সবার পৈতৃক প্রাণ মোটামুটি ওষ্ঠাগত। এটা ভাঙছি তো সেটা ছিঁড়ছি, এসব তো চলছে, তবে একদিন বুঝি বড় ধরনের কিছু করে ফেললাম। ফলে মা'র কাছে দৈনিক বরাদ্দের অতিরিক্ত কিছু কৃপাশীর্বাদ জুটছে, আমাকে উদ্ধার করে ছোটমাসি আমায় বসিয়ে দিল জানালার পাশে। তারপর একটা অদ্ভুত কাজ দিল। বাইরে ঝমঝমিয়ে আষাঢ়ের বৃষ্টি, ছোটমাসি বলল, 'বৃষ্টি দেখ'। বৃষ্টি আবার কী দেখব গোছের মুখ করেছি; মাসি বলল, 'দেখ কী ভাবে দিঘিটা ভরে যাচ্ছে, গাছের পাতাগুলো কেমন ভিজে যাচ্ছে, বসে বসে দেখ, বৃষ্টির ফোঁটা গোন তো...'।

আমি মজা পেলাম। সেদিন অনেকক্ষণ বসে রইলাম জানলার ধারে। কী ছিল সেই দিনটা! কিছুতেই ফোঁটাগুলো গুনে উঠতে পারি না, বিকেল অব্দি তুমুল লড়াই।

এই মুগ্ধতার প্রকাশ (তা অবশ্যই শিশুর মুগ্ধতা নয়। পক্ব, রসসমৃদ্ধ।) বাংলা ভাষার কবিতায় বেশসমাদৃত।

ষড়ঋতুর বঙ্গদেশে কবিরা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত সবার প্রতিই সহৃদয়। তা হলেও বর্ষা যেন খানিক বেশিই জায়গা পেয়েছে। মহাকবি কালিদাসের অনন্য সৃষ্টি 'মেঘদূত' মনে পড়বে। "নব আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, শৈল সানুটি ঘিরে/হেরে প্রমত্ত মাতঙ্গসম অতিকায় কালো মেঘে/মাতিয়া উঠেছে বপ্র-ক্রীড়ায় অধীর উতল বেগে" (অনুদিত)। একখণ্ড মেঘ কীভাবে কবির কল্পনায় ইন্দ্রিয়-সমর্থ হয়ে প্রেমিকের বিরহবেদনা তাঁর প্রিয়ার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, এই

ঝাঁপিয়ে পড়ছে ধারাপাত আর একটু একটু করে ভরে উঠছে মামাবাড়ির দিঘিটা। যতদূর দেখা যায় ভেজা চরাচর। টিনের চালে ঝামুরঝুমুর বৃষ্টির শব্দ, গন্ধরাজ লেবু গাছটার অনবরত ভিজে যাওয়া, মাঠে মাথলা মাথায় কাজ করা কৃষক, ডাগর দুধকচুপাতা মাথায় দূরে কেউ একজন হঠাৎ কেমন বুঁদ হয়ে পড়েছিলাম! সেই মুগ্ধতার রেশ আজও অনুভবে ধারণ করে আছি। এবং পরবর্তীতে যখন কবিতার সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে ছাত্র, পাঠক বা অল্পবিস্তর লেখার মানুষ হিসাবে দেখেছি, বৃষ্টি ও বর্ষার প্রতি

অমর বর্ষাকাব্যে আমরা তা দেখি। বাংলাসাহিত্যের আদি, আদি-মধ্য, মধ্য, আধুনিক এমন কোনও যুগ নেই যে যুগের কাব্যে বর্ষার অনুষঙ্গ অনুপস্থিত। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, মনোহর দাস, বাসু ঘোষ এঁদের প্রত্যেকের বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষার উল্লেখ রয়েছে। মূলত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের অনুরাগের গভীরতাকে স্পর্শ করার জন্যই বর্ষার রূপবৈচিত্র্যকে কাব্যে ব্যবহার করা হয়েছে। চণ্ডীদাস লিখছেন, "এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, কেমনে আইলো বাটে?/আঙ্গিনার

মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে, দেখিয়া পরান ফাটে"। এছাড়া মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার বড়াল, স্বর্ণকুমারী দেবী, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এঁদের কবিতাতেও বর্ষাভাবের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অক্ষয়কুমার একটি কবিতায় ভরা দীঘির রূপ বর্ণনা করছেন এভাবে "দীঘিটি গিয়াছে ভরে, সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে,/কানায় কানায় কাঁপে জল;/ বৃষ্টি-ভরে বায়ু-ভরে নুয়ে পড়ে বারে বারে/আধফোঁটা কুমুদ কমল"।

সময়ের সঙ্গে যেমন গ্রাম-শহর দু'জায়গাতেই বর্ষার চেহারা পালটেছে, তেমনই পাল্টেছে কবিতায় ব্যবহৃত বর্ষার চিত্র। আমাদেরএখানে

বাংলাসাহিত্যের আদি, আদি-মধ্য, মধ্য, আধুনিক এমন কোনও যুগ নেই যে যুগের কাব্যে বর্ষার অনুষঙ্গ অনুপস্থিত। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, মনোহর দাস, বাসু ঘোষ এঁদের প্রত্যেকের বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষার উল্লেখ রয়েছে। মূলত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের অনুরাগের গভীরতাকে স্পর্শ করার জন্যই বর্ষার রূপবৈচিত্র্যকে কাব্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

বর্ষার ইমেজ অফুরন্ত। ঘন কালো মেঘে ঢাকা আকাশ, ধান-রোয়ানো সজল চাষের ক্ষেত, ভেজা সবুজ বনজঙ্গল, অথৈ নদী, ভরা খালবিল, শাপলা, কদম, পানা, বনতুলসী, হেলেঞ্চা কতরকমের ফুল, আলো-ছায়া-অন্ধকারমাখা মনকেমন করা দিন, জলকাদা মেখে খেলা, গাঁয়ে-গঞ্জে ট্যাঁপাই পেতে; জাল ফেলে মাছ ধরা, ভিজতে ভিজতে ঠাকুরদার সমাধিতে ঠাকুমার ফুল দিয়ে আসা... বাঙলার বর্ষার কত যে ছবি। আর এ সমস্ত দৃশ্য বাংলা কবিতায় চিত্রকল্প রূপে হাজির। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় আসি।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের যে চিরকালীন সংযোগ, তা রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়, এবং অন্যান্য সৃষ্টিতে এমনভাবে সৃজিত হয়ে আছে যে 'রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় প্রকৃতি' এই মূলভাবের আলোকে অনেকানেক প্রাসঙ্গিক আলোচনা হয়েছে বা হচ্ছে, এবং আরও হবে। মজার বিষয় হল, কবির প্রকৃতি পর্যায়ের মোট ২৮৩টি গানের মধ্যে ১১৫টি-ই বর্ষার গান। এছাড়া রয়েছে বর্ষার কবিতা। বাঙালির ঋতুভিত্তিক উৎসবের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বর্ষামঙ্গল উৎসবের সূত্রপাত হয়েছিল। প্রতি বছর শান্তিনিকেতনে অথবা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিয়ম করে বর্ষামঙ্গল হয়েছে। কবিতার উদ্ধৃতি দিলে অনেক আসবে। আমি বরং পক্ষপাতী হই, গানের কথা লিখি। রবীন্দ্র সংগীত বিশেষজ্ঞ, স্বরলিপিকার এবং প্রশিক্ষক শৈলজারঞ্জন মজুমদারের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, ১৯২১ সালের বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে কবি নিজে 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে' আবৃত্তি করেছিলেন এবং গেয়েছিলেন 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' এই গানটি। বাংলাদেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী কলিম শরাফীর কণ্ঠে এই গান আমার ব্যক্তিগত বর্ষাভাবনার খুবই নিকটের একটি গান। এছাড়া 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল', 'এসেছিলে তবু আসো নাই', 'সাওতালি ছেলে', 'এসো নীপবনে', 'শাওনগগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথযামিনী রে/কুঞ্জপথে, সখি, কৈসে যাওব অবলা কামিনী রে' ইত্যাদি চিরঞ্জীব সব গানগুলির সঙ্গে আমাদের চিরকালীন বিরহ-বেদনা-আনন্দ-প্রেম যেন অমোঘ আত্মীয়তায় বাঁধা। শ্রীমোহন সিং খাঙ্গুরার কণ্ঠে 'বন্ধু, রহো রহো সাথে/আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে...' আজ যখন শুনি, বন্ধু শব্দটির ওই পাখি-উড়ে-যাওয়া উচ্চারণ আমার চোখে প্রতিবার জল এনে দেয়।

কাজী নজরুল ইসলামও নিজস্ব শিল্পদৃষ্টিতে বর্ষা ঋতুকে দেখেছেন। তাঁর কবিতায়, তাঁর গানে। 'সখী বাঁধলো বাঁধলো ঝুলোনিয়া/নামিল মেঘলা

মোর বাদরিয়া', 'এলো কৃষ্ণ কানাইয়া' এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। মূলত বর্ষাকে বিরহের ঋতু হিসেবে দেখেছেন নজরুল। কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন 'অঝোর ধারায় বর্ষা ঝরে সঘন তিমির রাতে/নিদ্রা নাহি তমার চাহি, আমার নয়ন-পাতে'। মনে পড়ছে কবি জসীম উদ্দীনের বিখ্যাত 'পল্লী-বর্ষা' কবিতার শেষ লাইনদুটি 'আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছল ছল জলধারে/বেণু-বনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় কারে'। বর্ষা এমন এক ঋতু যাকে শোনা যায়। বর্ষার আওয়াজও কতো বৈচিত্র্যময়। ব্যাঙের ডাক, মেঘের গর্জন, ঝড়ের নিজস্ব শব্দ, এমনকি ব্রিজের নীচ দিয়ে প্রবল তোড়ে জল চলে যাবার বন্যাকালীন শব্দটাও আমার মনে হয় বর্ষারই শব্দ। বাংলাদেশের কবি আবু হাসান শাহরিয়ারের কবিতায় পড়ছি, 'দূরে কোথাও বৃষ্টিভেজা ঘর/টিনের চালে বিঠোফেনের চিঠি'। এই চিঠির 'শ্রোতা' আমরা কে নই!

জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখের কবিতায় বর্ষা ছবিতে এবং শব্দময়তায় ধরা দিয়েছে। জীবনানন্দ যদিও ঘনঘোর বৃষ্টির চেয়ে হেমন্ত এবং হৈমন্তিক শিশিরের কাছেই ফিরে গেছেন বারবার, এমনকি তাঁর 'রূপসী বাংলা'-তেও বৃষ্টির সাক্ষাৎ পাবেন না। তবুও, 'বাংলার শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ/চেয়ে রবে; ভিজে পেঁচা শান্ত স্নিগ্ধ চোখ মেলে কদমের বনে' (একদিন জলসিড়ি) এমন অনেক বর্ষাচিত্র তাঁর কবিতায় পাই। সুধীন্দ্রনাথের কবিতাতেও ঋতুবৈচিত্র্য এসছে, তাঁর বর্ষার কবিতাও রয়েছে। 'বর্ষার দিনে' এবং 'শ্রাবণবন্যা' তাঁর দুটি বিখ্যাত কবিতা। তিরিশের আরেকজন কবি অমিয় চক্রবর্তীর একটি লাইন মনে পড়ছে 'অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।/ধানের খেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে...'। বুদ্ধদেব বসুও বর্ষা নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। তাঁর 'ব্যাঙ' কবিতাটির লাইন স্মরণ করা যায় 'ঘাস হ'ল ঘন মেঘ; স্বচ্ছ জল জমে আছে মাঠে/উদ্ধত আনন্দগানে উৎসবের দ্বিপ্রহর কাটে'।

এই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে সব দশকের কবিতাতেই বর্ষার অপরূপ আবহ রয়েছে। সুনীল, শক্তি, জয়, উৎপলকুমার, বিনয় থেকে শুরু করে অন্য সকলের কবিতায় বৃষ্টি ঝরেছে। সবার নামোল্লেখ কিংবা বিশদ করার সুযোগ এই পরিসরে আমাদের হাতে নেই। আমি আসি উত্তরের কবিতায় বর্ষা প্রসঙ্গে। কবি সুরজিৎ বসুর 'বৃষ্টির দিনে' কবিতায় আমরা পড়ছি 'একদিন এরকম বিষণ্ণ সকালে ফের বৃষ্টি হবে/বাগানের কামিনীর...ফুল সকালের সজল বাতাসে ছড়াবে সুবাস'। বেনু দত্তরায়ের একটি লাইন এরকম 'ধরা যাক, মেয়েটির নাম বর্ষা মুর্মু.../ কে তাকে এমন সুন্দর নাম উপহার দিয়েছিল?...কে এনেছে যত্ন করে উত্তরবাংলার

উত্তরের কবিতায় বর্ষা নিয়েই একটি সম্পূর্ণ আলোচনা করা যায়। তেমনি বাংলাদেশের কবিতায় বর্ষা নিয়েও। প্রেমিক কবি মহাদেব সাহার পঙক্তি দিয়ে শেষ টানি 'কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ প্রেমের কবিতা লিখে রেখেছে আকাশে/সেই ভালবাসার কবিতা এই বৃষ্টি, এই ভরা বর্ষা'।

আষাঢ়ের মেঘ থেকে দু'চামচ চোখ তার?' (একগুচ্ছ বর্ষাকবিতা)। বিকাশ সরকার লিখছেন, 'আকাশের দুঃখগুলি ফোঁটা-ফোঁটা ঝরে পড়ে শ্রাবণের রাতে/রাতচরা পাখি আমি, বাদলে-বাদলে ঘুরি একতারা হাতে' (দুঃখের গান)। উত্তরের কবিতায় বর্ষা নিয়েই একটি সম্পূর্ণ আলোচনা করা যায়। তেমনি বাংলাদেশের কবিতায় বর্ষা নিয়েও। ফররুখ আহমদ, আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, হুমায়ুন আজাদকার কথা বাদ দিই। বরং প্রেমিক কবি মহাদেব সাহার পঙক্তি দিয়ে শেষ টানি 'কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ প্রেমের কবিতা লিখে রেখেছে আকাশে/সেই ভালবাসার কবিতা এই বৃষ্টি, এই ভরা বর্ষা'।

তোমার জন্য লিখতে পারি এক পৃথিবী

আবিরা সেনগুপ্ত

আষাঢ় পূর্ণিমা রাতে, মেঘ এসে ডাক দিল আমায়। মনে হলো বহুযুগের সেই ওপার থেকে রামগিরি পাহাড়ের ওপর মেঘলা নীল নেমে এসেছে আমার জানলায়। আমি ঘুমভাঙা চোখে, হাত বাড়িয়ে দিলাম, হাতের পাতায় নেমে এল আষাঢ়ের আবাহন। সে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়লো আমার ঘরে। সে এখন নবীনা। চোখে মুখে আর ভেজা গালে লেগে আছে শৈশবের বিস্ময়। পাহাড়ি পথের বাঁকে, যেখানে পথ হারিয়ে গেছে উপলখণ্ডে, সেই দিগন্তখোলা আকাশ প্রান্তে আমার আষাঢ় আমায় ডাক দিয়ে যায়। আমার মন বলে ওঠে— আবার এসেছে আষাঢ়, আকাশ ছেয়ে। মেঘলা মেয়ে তার অবিন্যস্ত চুল মেলে আকাশের সাথে রান্নাবাটি খেলে। তার সাথে আমি ছুটে বেড়াই, কখনো লুকোচুরি, কখনো গোল্লাছুট। বৃষ্টির প্রতিটি কণার মাঝে আষাঢ়ের প্রথম আদর,

নেমে আসে আমার চেতন জুড়ে। যে ছেলেটি চা-বাগানের পথে একলা দাঁড়িয়ে আছে, আমি জানি, প্রতীক্ষা তার সঙ্গী। যেই মেয়েটি রোজ এপথে ঘরে ফেরে আজ সে আসে নি, এখনো, অথচ এই জলভারানত মেঘ জানে আজ হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভবের তিথি। আজ সেই অভিসারিকার হাত ধরে, বলা যায়, যেমন আছ তেমনি এস আর কোরো না সাজ। আমার সকল চেতনাজুড়ে এই অপেক্ষমান তরুণ সেই রামগিরি পর্বতের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। পার্বত্য সবুজের মাঝখানে ভেসে যায় চেতনস্রোত, মনে হয়... এমন দিনে তারে বলা যায় এমনি ঘনঘোর বর্ষায়, এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে, তপনহীন ঘন তমসায়। চিরকালীন নওল কিশোরী, তার নীল আঁচল বিছিয়ে দেয় বিস্তৃত সবুজ অরণ্যভূমে। শেষ বিকেলের মেদুর মন্দ্রতায় দিনের শেষ কেকাধ্বনি আষাঢ়ের প্রতিশ্রুতি ডানায় নিয়ে উড়াল দেয়।

সেদিন ছাদের মাঝে পাশের বাড়ির আলসেতে গা ঠেকিয়ে বই পড়ছিল শ্রাবণ। ধূপছায়া রঙের ওড়না থেকে থেকে জড়িয়ে যাচ্ছিল মাধবীলতায়। আমি শুধালুম কী পড়া হচ্ছে? সদ্য বড় হয়েছে সে, সময় কোথায় দুদণ্ড গপ্পো করে, ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দিল... পড়ছি বর্ষামঙ্গল। সেদিন আকাশ আলুথালু, জলভরা চোখ মেলে আমার শ্রাবণ খুঁজে বেড়ায় সেই কবিকে... যে বলেছিল... আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে... আমি জানলা ধরে দাঁড়িয়ে দেখি, হলদেটে হয়ে ওঠা মেঘদূতের পাতার প্রতিটি শব্দ শ্রাবণের আঁচল খসে... ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই জলজ বাতাসে। ক্ষ্যাপা মেয়ের সীমাহীন অভিমান আর অপেক্ষা গান হয়ে জেগে থাকে জলভার ক্লান্ত সিক্ত উদ্যানে। গভীর রাতে হৃদয় থেকে শব্দ ওঠে... কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে... আজি এই বরষা নিবিড় তিমির, ঝরঝর জল জীর্ণ কুটীর...। আমার শ্রাবণ আমায় এসে শুধায় আমার কবিকে দেখেছ? আমি বলি দেখেছি কী গো, তাকে যে রোজ দেখি। পাহাড়ের কোলে যখন মেঘলা ছায়ায় সবুজে সবুজে রূপকথা বোনা হয়, তখন কবি তোমায় ভেবে পদ্য লেখেন, আবার যখন খোয়াই দিয়ে বয়ে চলে পাটল রঙের জল, অজয়ের জলে লাগে তীব্র যৌবনের উচ্ছ্বাস, তখন কবি তোমায় চিঠি লেখেন নবীন শালতরুর নীচে বসে। সে বানী ঘন যামিনী মাঝের না বলা বাণী নয়... সে যে তোমায় ছুঁতে পাবার আকুলতায় ভরা। শালতরুর পাতায় পাতায় বাজে... আজি ঝরঝর মুখর বাদরদিনে, জানিনে জানিনে কিছুতে কেন যে মন লাগে না... এমন পাগল আর প্রেমিক সে। আর তুমি কিনা তাকেই খুঁজে পাওনা। তুমি তাকে খুঁজে নিয়ে এসো শ্রাবণ। তাকে ছাড়া যে আমাদের মেঘযাপন মিথ্যে হয়ে যায়। সে ছাড়া আমাদের কে শোনাবে জলের সুর, ভেজা বাতাসের পদ্য আর ভিজে

আমার শ্রাবণ আমায় এসে শুধায় আমার কবিকে দেখেছ? আমি বলি দেখেছি কী গো, তাকে যে রোজ দেখি। পাহাড়ের কোলে যখন মেঘলা ছায়ায় সবুজে সবুজে রূপকথা বোনা হয়, তখন কবি তোমায় ভেবে পদ্য লেখেন, আবার যখন খোয়াই দিয়ে বয়ে চলে পাটল রঙের জল, অজয়ের জলে লাগে তীব্র যৌবনের উচ্ছ্বাস

মাটির এস্রাজ। আমরা যে তার কথা তারই সুরে বৃষ্টির জল করতলে ধরি, গায়ে মেখে নি মেঘ। সেই কবিকে খুঁজে নাও শালবনে, নীপবিথি তলে। তার ক্লান্ত আঙুলগুলিতে জড়িয়ে দিও ভেজা মেঘের তুলো। তার কপালে দিও তোমার শ্রাবণ জলের সেবা। কানে কানে গান শুনিও... গোধুলি গগনে মেঘে ঢেকে ছিল তারা... আমার যা কথা ছিল হয়ে গেল সারা... তারপর? পাহাড়ের গা জুড়ে বসে থাকা খেলুড়ি মেঘ নেমে আসবে নদীর তটে, তার মুখের ছায়া পড়বে জলের বুকে ,

তারপর শুধু বৃষ্টি বৃষ্টি আর বৃষ্টি।

নদীর পাশে নদীর গন্ধ

সত্যম ভট্টাচার্য

দূরে কোথাও দু এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে— সুমন

না, শুধু দু এক পশলা নয়। আগের রাতে টানা বৃষ্টি হয়ে সেদিন চারিদিক জলে থৈ থৈ। রাস্তা-দুদিকের ড্রেন-বাড়ির উঠোন-সেদিন সব ভেনিস। মেসবাড়ির সিঁড়ির নীচের অন্ধকার ঘরটাতে আর ভালো লাগছিলো না। জল ঠেলে কী ভাবে যেন ২৩৪ না ২০১ ধরে ইউনিভার্সিটি পৌঁছে গিয়েছিলাম। অপরাহ্ন বিভাগের ক্লাস চলছিল। আর আমি বরাবরের মতো লাস্ট বেঞ্চে বসে জানলা দিয়ে দেখছিলাম কী রকমভাবে আকাশের মুখ আরো কালো হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। মনে পড়ছিলো দাদুর ছাতাটার কথা। ওটা দিয়ে আকাশের মধ্যে একটা খোঁচা দিলেই যেন সব জল ঝরঝর করে বেরিয়ে আসবে।

এক একাই বসেছিলাম। বাকি আমাদের ব্যাকবেঞ্চার্সরা কে কোথায় ছিল জানি না। আর কীভাবে কেন তা আজও বলতে পারি না। তবে সেদিন ঐভাবে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ 'বাঁশি শুনে কি আর ঘরে থাকা যায়'— গানটা গুনগুন করে গেয়ে ফেলেছিলাম। ব্যস, স্যর না ম্যাডাম কে যেন ক্লাস নিচ্ছিলেন। বইখাতা সব ছুঁড়ে ফেলে

এক একাই বসেছিলাম। বাকি আমাদের ব্যাকবেঞ্চার্সরা কে কোথায় ছিল জানি না। আর কীভাবে কেন তা আজও বলতে পারি না। তবে সেদিন ঐভাবে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ 'বাঁশি শুনে কি আর ঘরে থাকা যায়'— গানটা গুনগুন করে গেয়ে ফেলেছিলাম। ব্যস, স্যর না ম্যাডাম কে যেন ক্লাস নিচ্ছিলেন। বইখাতা সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ক্লাস থেকে।

দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ক্লাস থেকে। উনার কাছে না বললেও গোটা ক্লাস আমাকে বলছিল— তোর জন্যেই আমরা ক্লাস করতে পারলাম না, নিজেও করবি না, আমাদেরকেও করতে দিবি না— এইসব কথা।

আর আমার ভীষণ ভীষণ মনখারাপে তখন শুধু মনে পড়ছিল বাড়ির কথা। মনে হচ্ছিল বাবা কি স্কুল থেকে সিঙাড়া আর মিষ্টি নিয়ে ফিরলো। পাড়ার গলিটা আবার খুব কাদা হয়ে যায় নি তো? রিক্সা আসবে তো বাড়ির সামনে অব্দি? উঠোনটা আবার নিশ্চয়ই খুব পেছল হয়ে গিয়েছে। বাবা ইঁট পেতে দিয়েছে গেট থেকে একেবারে ভেতর অব্দি। মা হয়তো তার উপর দিয়ে তুলসিতলায় ধূপকাঠি দেখিয়ে এলো। একটু পরেই টিপটিপ করে টিনের চালে বৃষ্টি নামবে। বাবা মাকে বলবে— চা বানাও আর মুড়ি ভাজো। সেসব করে উঠেই মা তারপর খিচুড়ি বসিয়ে দেবে। মুসুর ডালের পাতলা খিচুড়ি, তাতে পেঁয়াজ রসুন থাকবে। আমি থাকলে হয়তো আমাকে আলসে ভেঙে যেতে হতো পাড়ার মোড়ের দোকানে ডিম আনতে,
এখন কে যাবে? রাতে ভরপেট খেয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বিছানায় গেলেই জোর শুরু হয়ে যাবে মাথার

ওপর অর্কেস্ট্রা।

সে রাতে জল ঠেলে যে কী ভাবে আবার ইউনিভার্সিটি থেকে মেসে ফিরেছিলাম আজ আর মনে নেই। কিন্তু নীচতলার বারান্দায় সেই হলুদ আলো-স্যাতসেঁতে তেলচিটে নোংরা রান্নাঘরে খাবার ঢাকা দেওয়া— এসব দেখে খুব মনে আছে কেঁদে ফেলেছিলাম। মহানগরের নিজস্ব যে এক মজা আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার ডুয়ার্স— সে যে নিজেই এক কবিতা। তাকে ছেড়ে থাকবো কেমন করে? তার এক নিজস্ব রকমের বর্ষা অথবা শীত। তাই কোনওক্রমে পড়া শেষ হতেই বাড়ি ফিরে বলেছিলাম আর আমি কোনওদিন

অঝোর বর্ষার মধ্যেই কোনও কোনও বালক জানালা দিয়ে দেখতো তাদের বাবারা কোদাল হাতে কাজ করে চলেছেন রাস্তায়। না হলে যে স্কুলে যেতে জামা জুতোয় কাদা লেগে যায়। আর রাতে চারিদিক জুড়ে সশব্দে ডাকতে থাকে ব্যাঙ আর ঝিঁঝিঁপোকা। তার মধ্যেই তারা টেবিলল্যাম্প অথবা লন্ঠনের আলোয় পড়াশুনা করতে থাকে।

বাইরে যাবো না।

সেই কোন শৈশবকালে এমনই এক বর্ষাতে ভাড়াবাড়ির শ্যাওলাপড়া কুয়োর পাড়ে গুন্ডুর মা আমাকে স্নান করাতে করাতে নাচ দেখিয়ে বলেছিলো— বাউরে, মেঘ ডাকিলেই মোর নাচিবার মোনায়। ধবধবে সাদা ফোতা পড়া সেই ভদ্রমহিলা বিড়ি খেতে খেতে যার দাঁতগুলো কালো হয়ে গিয়েছিলো আমাকে কোলে করে বাড়ির পেছনের উঠে আসা নদীকে দেখাতেন। সারা বছরের ঢালু রাস্তা দিয়ে নেমে গিয়ে দেখা শীর্ণ সে নদী তখন যেন উচ্ছ্বল যুবতীর মতো বাড়ির পেছন দিয়ে কলকল করে বয়ে চলতো। সেই দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তারও কি মনে পড়তো তার যৌবনের কথা, ভাতারের কথা, ভালোবাসাবাসির কথা? আকুল বর্ষায় রোয়া গাড়তে গাড়তে ভিজে ওঠা শরীর মন নিয়ে ঝাপসা হয়ে আসা চোখে প্রান্তরের গুয়াবাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতো কি সে?

তাহলে কি সেই লিরিকাল ব্যালাডসের কথাই সবার মধ্যে থাকে? অবসরে অবকাশে সবাই ফেলে আসা জীবনের দিকে তাকায়। কেউ লিখতে পারে। আবার গুন্ডুর মায়ের মতো পড়াশোনা না জানা বা জানাও কেউ হয়তো লিখতে পারে না। কিন্তু কবিতা সবার মধ্যে জন্ম নেয়, সর্বত্র জন্ম নেয়। আর সে যদি ডুয়ার্সের এমন কালচে সবুজ হয়ে আসা বর্ষাকাল প্রত্যক্ষ করে থাকে— তাহলে তো আর কথাই নেই।

আর ঠিক তারপরেই বৃষ্টি নেমেছিলো। মায়নাপত্তর একটু ভালো হবার দৌলতে আশির দশক নাগাদ মাস্টারমশাইরা ডুয়ার্সের মফস্বলগুলিতে আশ্রয় খুঁজে নিচ্ছিলেন। এতদিন যারা গ্রামের স্কুলগুলিতে সম্পাদক-সভাপতির দেওয়া জমিতে ছিলেন, তারা সেই অপবাদ ঘুচিয়ে মফস্বল বা শহরে এসে ভাড়া বাড়িতে থাকা শুরু করে ব্যাঙ্কলোন নিয়ে একটুকরো জমি কিনছিলেন কোথাও। ধনীদের টিনের কাঠের দোতলা বাড়ি আর গ্রামের দিকে গরীব কৃষকদের ছনের ঘরের পরে মফস্বলগুলিতে জায়গা করে নিতে থাকলো এক নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

নতুন বসতি যেসব জায়গায় গড়ে উঠছিলো সেখানে বর্ষাকালে ঢোকা দায়। রাস্তায় এক হাঁটু কাদা। আর ডুয়ার্সে তখন তো বর্ষাকাল মানে সাত দশ দিন ধরে টানা বৃষ্টি। গোটা ঘর বারান্দা জুড়ে দড়িতে দড়িতে কাপড়। আর নতুন বাড়ি করা লোকেরা কেউ কেউ সেই অঝোর বৃষ্টির মধ্যেই নেমে পড়েন রাস্তা ঠিক করতে। না হলে নিজেদেরই তো কাজেকম্মে বেরুতে অসুবিধে।

সেই অঝোর বর্ষার মধ্যেই কোনও কোনও

বালক জানালা দিয়ে দেখতো তাদের বাবারা কোদাল হাতে কাজ করে চলেছেন রাস্তায়। না হলে যে স্কুলে যেতে জামা জুতোয় কাদা লেগে যায়। আর রাতে চারিদিক জুড়ে সশব্দে ডাকতে থাকে ব্যাঙ আর ঝিঁঝিপোকা। তার মধ্যেই তারা টেবিলল্যাম্প অথবা লন্ঠনের আলোয় পড়াশুনা করতে থাকে। রাতে ছাতা হাতে বাইরে যেতে হলেই বাড়ির পেছনের বিশাল বড় মাঠের দিকে তাকিয়ে বুক কেঁপে ওঠে। সবুজ বাথরুমের দেওয়াল হলুদ আলোয় যেন আরো রহস্যময় হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় অঝোর ধারায় ঝাপসা হয়ে আসে সব। সুপারী-নারকেল গাছগুলি ক্রমাগত মাথা দোলাতে থাকে সে অবিরাম বর্ষণের মধ্যে। ঘোষমশাই তার মধ্যেই ছাতা হাতে গামছা মাথায় মিষ্টি নিয়ে হাঁক দিয়ে চলে যায়। রাস্তার দু'দিকের নীচু জায়গাগুলি ভরে থাকে জলে। কালভার্টের হিউমপাইপের নীচ দিয়ে স্রোতে জল বেরিয়ে যায়। তাতে কেউ মাছ ধরে, কেউ বা আবার শুধু একদিক থেকে নেপালের চটি ছেড়ে আরেক দিকে ধরে নেয়।

আর একটু বড় হয়েই সে অবিরাম বর্ষণ— সেই না শেষ হওয়া বর্ষাকাল— অনন্ত ধারাপাত কী যেন এক অস্থিরতা ডেকে আনে সেই বালকের মধ্যে। কোনওদিন সাইকেল নিয়ে আবার কোনওদিন বাসে চেপে সে তখন বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশের ঠিকানায়। মফস্বলের সরু রাস্তাকে ঢেকে দু'দিকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল গাছ। সেই কিশোর তখন পেরিয়ে যেতে থাকে গ্রামের পর গ্রাম। বিশাল বড় বটগাছটার নীচে ঘন অন্ধকার, ঝরঝর করে জল পড়ে সেখান থেকে। এর মাঝেই ভয়ানক শব্দে বাজ পড়ে কোথাও। জঙ্গলের গাছের পাতা থেকে গড়িয়ে নামতে থাকে গাঢ় সবুজ।

কখনো জলঢাকা কখনো আবার ডায়না ব্রিজের ওপর থেকে দেখা যায় দূরে চালসা বা ভুটান পাহাড় বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে আসে। আর ভয়ানক গর্জনে ঘোলা হয়ে আসে নীল নদীর জল। আচ্ছা পাহাড়ে কি তখন পাড় ভাঙে? যেরকম মন ভাঙে প্রেমিকার। জানালার গরাদ ধরে আকুল নয়নে ভরা বর্ষার মধ্যে সে চেয়ে থাকে দূরে, কীসের পানে?

চামুর্চি ইকো রিসর্টে পৌছতে গেলে নদী পার হতেই হবে। কিন্তু লোটাকম্বল নিয়ে সেখানে নামতেই একেবারে ঝপাস। আসলে দূরে সেই ঝাপসা হয়ে আসা ভুটান পাহাড়ের মধ্যে তখন রামধনু উঠছিলো একখানা। তাতেই বিপত্তি। লেপচা-খা পাহাড়ে সারারাত ঘুমোতে না পারা বৃষ্টিতে কি সেদিন ক্লাউডবার্স্টই হয়েছিলো। নীচে জয়ন্তী-আঠাশবস্তি সকালে ঢেকে ছিলো গভীর গাঢ় মেঘে।

কখনো জলঢাকা কখনো আবার ডায়না ব্রিজের ওপর থেকে দেখা যায় দূরে চালসা বা ভুটান পাহাড় বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে আসে। আর ভয়ানক গর্জনে ঘোলা হয়ে আসে নীল নদীর জল। আচ্ছা পাহাড়ে কি তখন পাড় ভাঙে? যেরকম মন ভাঙে প্রেমিকার। জানালার গরাদ ধরে আকুল নয়নে ভরা বর্ষার মধ্যে সে চেয়ে থাকে দূরে, কীসের পানে?

এভাবেই তিস্তার উথালপাতাল জলের মধ্যে গভীর কালো আকাশের নীচে পাহাড় থেকে ভেসে আসা কাঠ ধরতে নেমে পড়ে লোকজন। বর্ষা এলেই প্রতিবছর তাদের ঘর ছেড়ে উঠে পড়তে হয় বাঁধে। কোলের বাচ্চাটিকে নিয়ে দূরে তাকিয়ে থাকে অল্পবয়সী বধূটি। নদী পেরিয়েই বাসের ফাঁকা সিটটিকে দেখিয়ে তখন কেউ বলে, একটু চেপে বসবেন। সে ছাতা বন্ধ করে আর আমি দেখি তার শ্যামলা গায়ে বিন্দু বিন্দু জল। আর হয়তো তার গা থেকেই ভেসে আসছে এক অপূর্ব আনাস্বাদিত আঘ্রাণ। বাড়ি ফিরে লিখি— নদীর পাশে নদীর গন্ধ।

বর্ষা বন্দনা

সময়ীতা ঘোষ

বছরের নানা সময়ে প্রকৃতি নানারূপে সেজে ওঠে। বর্ষা এসে তাকে আরো সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে। রিমঝিম বৃষ্টি, একরাশ সজীবতা এবং কদম ফুলের সুবাস নিয়েই হাজির হয় সে। আষাঢ়, শ্রাবণ এই দুই মাস নিয়ে বর্ষাকাল হলেও এর ব্যাপ্তি প্রায় চার মাস। গ্রীষ্মের দুপুরের অভিমান, ক্লান্ত মন তার আসার অপেক্ষাতে দিন গুনে যায়। বর্ষা এলে নদী-নালা, খাল-বিল জলে ভরে ওঠে। মরা নদীতে জোয়ার আসে। আকাশে ঘন মেঘ ঘুরে বেড়ায়। কখনো আবার আকাশ ছাপিয়ে বৃষ্টির ধারা নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। ঘরের টিনের চালে বৃষ্টির রিমঝিম শব্দে সৃষ্টি হয় কবিতার, সারা রাত কান পেতে শুনে যাই সেই কবিতা। তারপর সেই কবিতা শুনতে শুনতেই দু-চোখে ঘুম নেমে আসে। জানালা খুলতেই জল ছিটকে আসে ভেতরে সে জল দেহ ভেদ করে প্রবেশ করে অন্তরে। স্বল্পক্ষণের

জন্য হলেও সে সব ভুলিয়ে দেয়। ক্লান্ত মনে তখন বিরাজ করে শীতলতা। প্রিয়জনের স্মৃতি বর্ষার হাত ধরে ঘুরে ফিরে আসে। প্রিয়জনের শূন্যতাকে সে দ্বিগুণ করে তোলে। বর্ষা কখনো কাঁদায়, বর্ষা কখনো ভাবায় কখনো আবার তার জন্যেই মন ভরে যায় আনন্দে।

মেয়েবেলায় সারারাত সকাল হওয়ার অপেক্ষা করতাম। সকাল হলে একটু পড়ে বানাতে বসতাম কাগজের নৌকা তারপর বানিয়ে ভাসিয়ে দিতাম বর্ষার জলে। এখনো দেখি শিশুরা একইভাবে উল্লাসে মেতে ওঠে। আমিও কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যাই সব, ইচ্ছে করে আবারও শৈশবের গলিতে ফিরে যেতে। কবিতা আমার আসে না তেমন, তবুও এই বর্ষার দিনে কোনো এক কবির আত্মা ভর করে আমার উপর। প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়েই যেন লিখে ফেলা যায় হাজার কবিতা। কেউ লেখে প্রেমের কবিতা প্রিয়তমার জন্যে কারোর কবিতা জুড়ে থাকে বিরহের মিষ্টি যন্ত্রণা। বর্ষা একাধারে জাগিয়ে তোলে কবি ও প্রেমিককে। বর্ষা শেখায় ভালোবাসতে আবার সেই বোঝায় বিরহের অর্থ। খুব ইচ্ছে করে শ্রাবণের এক সকালে জানালার পাশে গিয়ে বসতে, দেওয়ালে কান পেতে শুনতে বৃষ্টির শব্দ, ইচ্ছে করে শুনতে তার কবিতা কিংবা লিখতে শ্রাবণের কাব্য। একই ছাতার নীচে বেড়ে উঠবে কবিতা, যত্নে সাজাবো তাকে নীল কালিতে এ আমার ইচ্ছে, বহুদিনের ইচ্ছে।

বর্ষা ও বসন্ত নিয়ে কম বেশী প্রায় সব কবিই কিছু না কিছু লিখেছেন। কালিদাস, জয়দেব-এর কবিতায় বর্ষার উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, কবি বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, রায়শেখর এঁদের প্রত্যেকের বৈষ্ণব পদাবলিতেও বর্ষার বর্ণনা রয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের যে অনুরাগ সেই অনুরাগের গভীরতাকে প্রকাশ করা হয়েছে বর্ষার বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্যের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে।

কালিদাস বর্ষাকে অনুভব করেছেন অনুরাগের গভীরতায়।

মধ্যযুগে চণ্ডীদাসের কোনো কোনো কবিতায় বর্ষা এসেছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের ইন্ধন হিসেবে। মধ্যযুগের কবিরা বর্ষাকে অভিসার ও বিরহ পর্বে ‘প্রেমের আগুনে ঘিয়ের ছিটা’ হিসেবে কল্পনা করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে কৃষ্ণের জন্য রাধার বিরহের যন্ত্রণা বেড়ে যায় এই বর্ষা এলেই। কৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হয়ে রাধিকা বড়াইকে বলেন-

‘আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ/বরিষে যেহ্ন/ঝর এ নয়নের পানি। /আল বড়ায়ি/সংপুটে প্রণাম করি দুইলো সখিজনে/কেহো নান্দ কাহবনঞিকে আনী।’

মেয়েবেলায় সারারাত সকাল হওয়ার অপেক্ষা করতাম। সকাল হলে একটু পড়ে বানাতে বসতাম কাগজের নৌকা তারপর বানিয়ে ভাসিয়ে দিতাম বর্ষার জলে। এখনো দেখি শিশুরা একইভাবে উল্লাসে মেতে ওঠে। আমিও কিছুক্ষনের জন্য ভুলে যাই সব, ইচ্ছে করে আবারও শৈশবের গলিতে ফিরে যেতে। কবিতা আমার আসে না তেমন, তবুও এই বর্ষার দিনে কোনো এক কবির আত্মা ভর করে আমার উপর।

হঠাৎ করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বর্ষা ঋতুর সঙ্গে সে সম্পর্ক জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত অক্ষত থেকে গিয়েছিল। এবং এক বর্ষার দিনেই কবি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। ওঁর কাছে বর্ষাই ছিল সব ঋতুর সেরা। ওঁর কবিতায় বর্ষার বিচিত্র রূপ প্রকাশ পায় বর্ষাবন্দনা রূপে। উনি তাঁর নানা কবিতায় বর্ষার নানাদিক ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘আষাঢ়’ কবিতায় মানুষকে ঘরের বাইরে যেতে মানা করলেও, গ্রামবাংলার যে অপরূপ দৃশ্য ফুটিয়ে

তুলেছেন তা পাঠককে গ্রামবাংলার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। অন্যদিকে ‘সোনার তরী’ কবিতায় আমরা দেখি, আকাশে মেঘ গর্জন করছে, চারিদিকে বৃষ্টির জল থৈ থৈ করছে। জমির ধান কেটে একটি ছোট খেতে কৃষক একা বসে আছেন, পার হওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। খেতের চারিদিকে নদীর বাঁকা জল খেলা করছে। শেষে সোনার তরী এসে তাকে পুরোপুরি নিঃস্ব করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। ‘বাঁশি’ কবিতায় দেখা যায়, বর্ষা এলেই ট্রামের খরচা বাড়ে। ছাতার অবস্থা জরিমানা দেয়া মাইনের মতো— বহু ছিদ্র তার। চারিদিকে ময়লা-আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। তখন গলিটাকে ঘোর মিছে অন্ধকার মাতালের প্রলাপের মতো মনে হয়। আবার কখনো উনি কবিতায় করেছেন শৈশবের দিনগুলির স্মৃতিচারণ। কবির মনে হয়েছে বর্ষার দিনেই প্রিয়তমাকে বলা যায় প্রণয়ের কথা।

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি বাতাসের বেগে জলের ছাঁটে বারান্দা একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে, সারি সারি ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে, প্যারীবুড়ি কক্ষে একটা বড় ঝুড়িতে তরিতরকারি বাজার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে জলকাদা ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, আমি বিনা কারণে দীর্ঘ বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আর, মনে পড়ে, ইস্কুলে গিয়াছি; দরমায় ঘেরা দালানে আমাদের ক্লাস বসিয়াছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘অপরাহ্নে ঘনঘোর মেঘের স্তূপে স্তূপে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে; দেখিতে দেখিতে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল; থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ একটানা মেঘ-ডাকার শব্দ; আকাশটাকে যেন বিদ্যুতের নখ দিয়া একপ্রান্ত হইতে আর— এক প্রান্ত পর্যন্ত কোনপাগলি ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিতেছে; বাতাসের দমকায় দরমার বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়; অন্ধকারে ভালো করিয়া বইয়ের অক্ষর দেখা যায় না, পণ্ডিতমশায় পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; বাহিরের ঝড় বাদলটার উপরেই ছুটাছুটি মাতামাতির বরাত দিয়া বন্ধ ছুটিতে বেঞ্চির উপরে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে মনটাকে তেপান্তরের মাঠ পার করিয়া দৌড় করাইতেছি।’

‘বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি বাতাসের বেগে জলের ছাঁটে বারান্দা একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে, সারি সারি ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে, প্যারীবুড়ি কক্ষে একটা বড় ঝুড়িতে তরিতরকারি বাজার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে জলকাদা ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, আমি বিনা কারণে দীর্ঘ বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আর, মনে পড়ে, ইস্কুলে গিয়াছি; দরমায় ঘেরা দালানে আমাদের ক্লাস বসিয়াছে।’

—রবীন্দ্রনাথ

বর্ষাকালের আকাশ আর আমাদের মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। আর তাই হয়ত বর্ষা ঋতু আমাদের এতটা কাছের। বর্ষা একেকজনকে একেকটা কথা মনে করিয়ে দেয়। একেক জনের কাছে সে একেকটা বার্তা নিয়ে আসে। বর্ষার কোনো এক দিন যখন কোনো এক বালকের কাছে পরিবারের সকলের সাথে বসে খিচুড়ি খাওয়ার সুযোগ এনে দেয় তখন দরিদ্র মানুষের বর্ষার এই রূপ দুচোখ ভরে দেখার সময় থাকে না বরং তাদের কাছে বর্ষা হয়ে ওঠে বিরক্তিকর। তবুও বর্ষার প্রভাব সকলের ওপরেই পড়ে। সে নিজের মতো করেই আমাদের জীবনকে কখনো কাব্যময় ও কখনো গদ্যময় করে তোলে।

সংক্ষিপ্ত বর্ষা

মায়েদা আফরিন তনু

‘নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে,
ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে’

খুব বেশি হলেও বিশ কি ত্রিশ বছর হবে! এভাবেই বাড়ির গুরুজনেরা ছেলেমেয়েদের ঘন বর্ষায় ঘরের বাহিরে যেতে মানা করতো। কথায় হয়তো আঞ্চলিকতা আসতো অথবা কখনো কড়া শাসনে গাছের ডাল ভেঙে পিঠে বেদম মার পড়তো। আর তাও ভেজা পিঠে। তবুও সেকাল ছিল ভালো, একাল সেথায় বড্ডই নিষ্প্রাণ হয়ে গেল।

আষাঢ় ও শ্রাবণ দুইমাস বর্ষাকাল। বেশ অনেকটা সময়। চারদিকে পানি থৈথৈ। পথঘাট ডুবে নৌকার আবির্ভাব। গৃহবন্দী মানুষ আর কালো আকাশে গর্জন। বাইরেটা একেবারে ভয়ঙ্কর

নিস্তব্ধতায় ভরপুর।

আগের দিনে ছেলেমেয়েরা বৃষ্টি হলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তো, ভিজতো, খেলতো কখনো ক্রিকেট, ফুটবল বা ছোঁয়াছুঁয়ি। আর পা পিছলে ধপাস ধপাস পড়ে গিয়েও গড়িয়ে গিয়ে পিচ্ছল খেলার অভিনয়ও তারা দারুণ করতো। তারপর 'আয় বৃষ্টি ঝেপে ধান দেব মেপে...', 'বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর নদে এলো বান...' আরও কত ছড়া আর

একজন অভিজ্ঞ সাহিত্যিক তার কবিতা বা লেখায় বর্ষার প্রভাব ভালো করেই ফুটিয়ে তুলতে পারেন। আর সেই মাহাত্ম্য নিয়ে বর্ষা আসে কিছু মুখচোরা পাঠকের হৃদয়ে হয়তো প্রেমের কবিতা হয়ে অথবা 'আমার আপনার চেয়ে আপন যেজন খুঁজি তারে আপনায়..' এই মন্ত্রে উজ্জীবিত করে উপন্যাস রূপে। বর্ষা আর রোমান্টিকতা অবিচ্ছেদ্য আর কবিতা ছাড়া কি তার প্রকাশ হবার উপায় আছে? নেই হয়তো। সে যাইহোক, আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারাতে বসা দারুণ কৈশোর, নদী ভাঙনে নিঃস্ব গৃহহীনের করুণ চাহনি, বন্যার্ত দুঃস্থজনের নির্মম জীবনের কাব্যও বাস্তব এই বর্ষার কল্যাণে।

কবিতায় মুখরিত হতো বৃষ্টির শব্দ। সেসব এখনো হাতে গোণা গ্রামীণপল্লীতে মাঝেমধ্যে চোখে পড়লেও সচরাচর দেখা যায় না। আর শহরের কথা না হয় বাদই দিলাম। এই তো সেদিন আকাশে পতপত করে উড়তে থাকা ঘুড়ির শব্দ চিনতেই বেগ পেতে হল। আহা বৃষ্টির পর সদ্য নেয়ে উঠা আকাশে ঘুড়ি ওড়াবার যে আনন্দ তা কি অন্য কিছুতে পাওয়া যায়! আজকাল এসবের বালাই নেই বললেই চলে। আমরা কোথায় যেন বড্ড পেশাদার হয়ে যাচ্ছি। জীবন থেকে উপভোগ বিষয়টা হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশই। শুধু ভিডিও গেম, ফোন, নেট, কিছু জমকালো ব্যবসায়িক গান আর প্রেমিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ এতেই বুঝি ভরা বর্ষা মনোমুগ্ধকর।

তবে এই প্রেমিরাও মাঝে মাঝে কবি হয়ে উঠে। সে কবিতা কেবল তার প্রেমির কাছেই থাকবে অন্যরা সে সাহিত্য কখনো জানবে না এরকমই শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় এসব সম্পর্কে। কিন্তু এই প্রেমিও সাহিত্যিক হয়ে উঠে কখনো কখনো নীরব ব্যথায় যখন আপন অশ্রু বর্ষাকে সঙ্গী করে নেয়। অবশ্য পেশাদার লেখক বা কবি কারোরই অভাব নেই। তারাও বর্ষাকে বরণ করে। কিছু দারুণ লেখাপড়ার আর জম্পেশ কাজ করার জন্য বৃষ্টি বা বর্ষার জুড়ি মেলা ভার। একজন অভিজ্ঞ সাহিত্যিক তার কবিতা বা লেখায় বর্ষার প্রভাব ভালো করেই ফুটিয়ে তুলতে পারেন। আর সেই মাহাত্ম্য নিয়ে বর্ষা আসে কিছু মুখচোরা পাঠকের হৃদয়ে হয়তো প্রেমের কবিতা হয়ে অথবা 'আমার আপনার চেয়ে আপন যেজন খুঁজি তারে আপনায়...' এই মন্ত্রে উজ্জীবিত করে উপন্যাস রূপে। বর্ষা আর রোমান্টিকতা অবিচ্ছেদ্য আর কবিতা ছাড়া কি তার প্রকাশ হবার উপায় আছে? নেই হয়তো। সে যাইহোক, আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারাতে বসা দারুণ কৈশোর, নদী ভাঙনে নিঃস্ব গৃহহীনের করুণ চাহনি, বন্যার্ত দুঃস্থজনের নির্মম জীবনের কাব্যও বাস্তব এই বর্ষার কল্যাণে। আর মৃদু স্পর্শে কবির কবিতা বা টুকটাক শখের বশে লেখা কোনো সাহিত্যের পাতায় এই করুণ দৃশ্যগুলোও জাগে কালের পর কাল, যুগ থেকে যুগ...

বর্ষা আসে যায়! নিত্যনতুন কাব্য রচিত হয় প্রেম, বিচ্ছেদ, হাহাকার ইত্যাদিকে উপজীব্য করে। বাস্তব জীবনে তার ছাপ আরও বহুগুণ গভীর। কী নিদারুণ বৈচিত্র্য প্রকৃতি আর সমাজবাস্তবতার এই বর্ষাকে কেন্দ্র করে! তা বরাবরই থেকে যায় কবিতায়!"

ভালোবাসার বইঘর। পত্রভারতী এখন জলপাইগুড়িতে

পত্রভারতী

DooarsBooks.com

অনুমোদিত বিক্রয়কেন্দ্র

ডুয়ার্স বুকস

সনাতন অ্যাপার্টমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, পাহাড়ি পাড়া, কদমতলা, জলপাইগুড়ি

DOOARS BOOKS Jalpaiguri #Whatsapp 6297731188

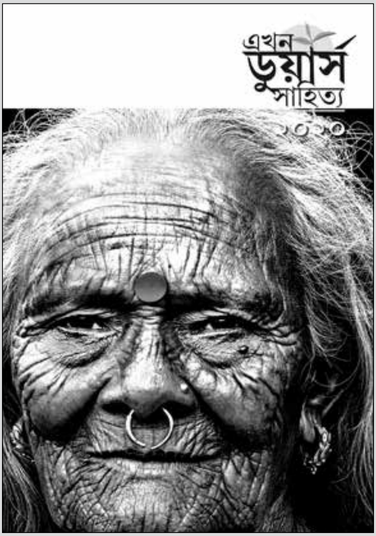

পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি। বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২ **জলপাইগুড়ি।** ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩ **আলিপুরদুয়ার।** দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭ **কোচবিহার।** জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪ **মালদা।** অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৭৮৬৪৯৯৫৫১৫ **কলকাতা।** বিশাল বুক সেন্টার, ৪ টৌটি লেন, নিউ মার্কেট। ৪০৬৪৪০৯৭ অথবা না পেলে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮।

এ সময়ে বাংলার উত্তরে সাহিত্যচর্চার সেরা সংকলন

উপন্যাস

বিপুল দাস। তনুশ্রী পাল। অমিত কুমার দে। শুভময় সরকার। অভিজিৎ সরকার। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

গল্প

পীযুষ ভট্টাচার্য। অর্ণব সেন। অরুণাভ ভৌমিক। বিমল লামা। দিবাকর ভট্টাচার্য। গৌতমেন্দু রায়। তপতী বাগচি। সাগরিকা রায়। কল্যাণ গোস্বামী। রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়। সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য। দীপালোক ভট্টাচার্য। শাশ্বতী চন্দ। রম্যাণী গোস্বামী। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। শ্বেতা সরখেল। রাখি পুরকায়স্থ। দেবপ্রিয়া সরকার। মানিক সাহা। রঙ্গন রায়। সন্দীপন নন্দী। সত্যম ভট্টাচার্য। সৌমিত্র চৌধুরী। সুব্রত চক্রবর্তী। শাঁওলি দে। হিমি মিত্র রায়। সৌগত ভট্টাচার্য। শতরূপা নাগপাল। ইপ্সিতা সোম। অগ্রদীপ দত্ত।

কবিতা

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত কবিতা। সন্তোষ সিংহের রাজবংশী কবিতাগুচ্ছ। সমীর চট্টোপাধ্যায়। অমর চক্রবর্তী। কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য। সমর রায়চৌধুরী। রাণা সরকার। বিজয় দে।

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস। সুজিত দাস। নিখিলেশ রায়। অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। রত্নদীপা দে ঘোষ। সেবন্তী ঘোষ। অনিন্দিতা গুপ্ত রায়। সোমা বৈদ্য। সুদীপ্ত মাজি। সুবীর সরকার। নিঝুম ঠাকুর। অমিত দে। জয়শীলা গুহ বাগচী। মনোনীতা চক্রবর্তী। সৌমনা দাশগুপ্ত। স্বপ্ননীল রুদ্র।

শ্যামলী সেনগুপ্ত। শুক্লা রায়। সম্পা দত্ত দে। পাপড়ি গুহ নিয়োগী। সৌম্য সরকার। নীলাদ্রি দেব। মারুফ আহমেদ নয়ন। নির্মাল্য ঘোষ। অনুপ ঘোষাল। অভিজিৎ দাশ। দীপায়ন পাঠক। শক্তিপ্রসাদ ঘোষ। সুপ্রিয় চন্দ। প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। অমিত পাল। হেমন্ত সরখেল। তুহিন শুভ্র মন্ডল। জ্যোতির্ময় মুখার্জি। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। মহুয়া। সন্দীপ শর্মা।

সম্পাদক শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ৫১২ পৃষ্ঠার পেপারব্যাক। মূল্য ১৯৫ টাকা

ইরাবতী কার্ভে
ভারতের প্রথম নারী নৃবিজ্ঞানী

রাখি পুরকায়স্থ

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক। বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ ভারতের অধিকাংশ নারী তখন পর্দানশীন। পুরুষ আধিপত্যপূর্ণ ভারতীয় সমাজের গতেবাঁধা নিয়মনীতির প্রতিকূলে গিয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে চাওয়া নারীদের তখন সমাজবিরোধী কিংবা চরিত্রহীনা বলে দেগে দেওয়াটাই সমাজ স্বীকৃত রীতি। এমনই একটা কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে নতুন চিন্তাভাবনার আলোকে মানুষ, মানব আচরণ ও মনুষ্যসমাজকে অন্বেষণ করবার অদম্য স্পৃহায় ভারতের প্রথম নারী নৃবিজ্ঞানী ডঃ ইরাবতী কার্ভে লিঙ্গবৈষম্যজাত সকল বাধাবিঘ্নগুলিকে অতিক্রম করেছিলেন অসীম মনোবলে। ভারতের এই প্রথম মহিলা নৃতাত্ত্বিক তথা সমাজবিজ্ঞানী তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সমাজের গভীরে প্রোথিত পুরুষতান্ত্রিকতার শিকড়ে জড়ানো সামাজিক নির্মাণগুলির বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রশ্ন তুলেছেন নারীবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা প্রচলিত সমাজ-মানসিকতা থেকে একেবারেই ভিন্ন ছিল। ‘নারীদের বলছি, নিজেদের প্রাপ্য অধিকারের দাবিতে পুরুষদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার সময় কেন শুধু সম-অধিকারের জন্যে লড়াই করেন? আরও অনেক বেশি অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করুন!’ বিভিন্ন সম্মেলনে বক্তৃতা

দেওয়ার সময় প্রায়শই তাঁর মুখে এ কথাগুলি শোনা যেত। তাই সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিদ্যার পুরুষ প্রাধান্যপূর্ণ ক্ষেত্রে তাঁর ব্যতিক্রমী দক্ষতাকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে সমাজের পুরুষশ্রেষ্ঠরা যতখানি সংবিগ্ন হয়েছেন, ঠিক ততটাই বিক্ষুব্ধ হয়েছেন সেই সময়কার সমাজ-আরোপিত লিঙ্গ ভূমিকাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পুনের রাস্তায় মোটরচালিত দ্বিচক্রযানে চেপে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো ইরাবতীকে দেখে!

ডঃ ইরাবতী কার্ভে (কর্মকার) ১৯০৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বার্মার (বর্তমান মিয়ানমার) মান্দালয় অঞ্চলের ম্যিংগ্রামে একটি চিতপবন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গণেশ হরি কর্মকার সেখানকার একটি কটন মিলে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন। ইরাবতীর মা ছিলেন ভাগীরথী দেবী। মিয়ানমারের পবিত্র নদী ইরাওয়াদির (সংস্কৃত ইরাবতী) নামানুসারে পিতা-মাতা তাঁর নামকরণ করেছিলেন ইরাবতী। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি মহারাষ্ট্রের পুনেতে বড় হয়ে ওঠেন। সৌভাগ্যবশত তাঁর পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল পুনের তৎকালীন অন্যান্য মধ্যবিত্ত পরিবারের মত ছিল না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, একটি সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের শিক্ষা লাভের গুরুত্ব সর্বাধিক।

পুনের হুজুরপাগা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন ইরাবতী। তার পর ফার্গুসন কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক হন ১৯২৬ সালে। এর অব্যবহিত পরেই মহারাষ্ট্র সরকার প্রদত্ত 'দক্ষিণা ফেলোশিপ' অর্জন করেন, যা তাঁকে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক জি. এস. ঘুরিয়ের অধীনে সমাজতত্ত্ব পড়বার সুযোগ করে দেয়। ১৯২৮ সালে ইরাবতী বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। সেই সময় তিনি দুটি গবেষণামূলক সন্দর্ভ রচনা করেছিলেন। প্রথমটি,'The Chitpavan Brahmins – An Ethnic Study' এবং দ্বিতীয়টি, 'Folklore of Parshuram'।

ইরাবতী কার্ভে

ডঃ কার্ভের উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে অন্যতম তাঁর ভারতবিদ্যা (Indology) সম্পর্কিত গবেষণা। এত কাল বিদেশীরা যে চোখে ভারতে দেখেছেন সেভাবে নয়, তিনি ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গবেষণা করেছিলেন পুরোপুরি ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। গবেষণামূলক কাজের মধ্য দিয়ে বৈচিত্র্যের মাঝে মিলনের তত্ত্বটি তিনি এমন একটা সময়ে প্রচার করেছিলেন যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক মহর্ষি ধোন্দো কার্ভের

পুত্র, ডঃ দিনকর ধোন্দো কার্ভেকে বিবাহ করেন ইরাবতী। তাঁর শ্বশুরমশাই মুম্বাইয়ের (সাবেক বম্বে) এসএনডিটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ছিল ভারতে মহিলাদের জন্যে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। উদারমনস্ক ও প্রগতিশীল জীবনসঙ্গীর সহযোগিতায় উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন ইরাবতী। ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে তিনি জার্মানির কাইজার উইলহেলম ইনস্টিটিউট অফ এনথ্রোপোলজি, হিউম্যান হেরিডিটি এন্ড ইউজেনিক্সে গবেষণা শুরু করেন এবং দু'বছর পর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। পিএইচডি করবার সময় তিনি দর্শন, সংস্কৃত এবং প্রাণিবিদ্যার পাশাপাশি ইউজেনিক্স অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর পিএইচডির বিষয় ছিল 'The Normal Asymmetry of the Human Skull'। এই বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে পঠনপাঠনের সময় মানব প্রজাতি, মানব শারীরবৃত্ত এবং জেনেটিক্স বিষয়ে তাঁর সম্যক ধারণা জন্মায়। জার্মানিতে থাকাকালিন অধীত বিষয়সমূহ এবং প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাগুলি পরবর্তী জীবনে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ক আধুনিক চিন্তাচেতনা গঠনে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল।

জার্মানিতে পঠনপাঠন শেষে, ডঃ কার্ভে নৃবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রবেশ করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ অবধি নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার মধ্যে সুস্পষ্ট পদ্ধতিগত পার্থক্য ছিল। পূর্ববর্তী বিষয়টি ছিল ফিল্ড ওয়ার্ক ভিত্তিক, পরবর্তীটি ছিল কেস স্টাডি নির্ভর। কঠোর শারীরিক পরিশ্রম এবং নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতির বাইরে গিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কারণে নারীদের পক্ষে নৃবিজ্ঞানকে গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা সে-আমলে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ছিল। তদুপরি নৃতত্ত্ব যেহেতু বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা তাই 'মেয়েদের বিজ্ঞান পড়তে নেই' কিংবা 'মেয়েরা বিজ্ঞানের মারপ্যাঁচ বুঝতে অক্ষম' এসব প্রচলিত ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে নৃবিজ্ঞান পাঠে তাঁদের নিরুৎসাহ করা হত। অথচ ইরাবতী এই বিষয়টিকেই আপন করে নিলেন। তাই তাঁকে নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসে একজন ব্যতিক্রমী চরিত্র বলে গণ্য করা হয়।

ভারতে ফিরে ডঃ কার্ভে ১৯৩১ সালে বম্বের এসএনডিটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পদ গ্রহণ করেন। সেই সাথে স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষকতা চালিয়ে যান। ১৯৩৯ সালে তিনি পুনের ডেকান মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ডেকান মহাবিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান, ১৯৪৭ সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি, এসএনডিটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য— ডঃ কার্ভে তাঁর জীবদ্দশায় এমন বহু দায়িত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হল পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগের সূচনা করা।

ডঃ কার্ভের উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে অন্যতম তাঁর ভারতবিদ্যা (Indology) সম্পর্কিত গবেষণা। এত কাল বিদেশীরা যে চোখে ভারতে দেখেছেন সেভাবে নয়, তিনি ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গবেষণা করেছিলেন পুরোপুরি ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। গবেষণামূলক কাজের মধ্য দিয়ে বৈচিত্র্যের মাঝে মিলনের তত্ত্বটি তিনি এমন একটা সময়ে প্রচার করেছিলেন যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা ধর্মের ভিত্তিতে ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর গবেষণায় বর্ণবাদ, পারিবারিক সম্পর্ক, ধর্ম, পুরাণ, জ্ঞাতিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে উঠে এসেছে নানান অশ্রুতপূর্ব প্রশ্ন। ইংরেজি ও মারাঠি ভাষায় তিনি রচনা করেছিলেন একাধিক গ্রন্থ। Kinship Organization in India (1953), Bhils of West Khandesh (1958), Hindu Society— an interpretation (1961), The Pandharpur Yatra (1962), Maharashtra: Land and People (1968), (1968) প্রভৃতি।

মারাঠি ভাষায়, পরবর্তীতে ইংরেজিতে, লেখা তাঁর 'যুগান্ত' বইটি মূলত ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মহাভারতের বিশ্লেষণ। মহাভারতের চরিত্রগুলি এখানে কাল্পনিক নয়, বরং বাস্তব সামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের পরিস্থিতি ও কর্মকাণ্ডকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে মহাভারতের মতো একটি মহাকাব্যের ওপর ভিত্তি করে ডঃ কার্ভে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার একটি দৃশ্যপট পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। বইটি ১৯৬৮ সালে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার লাভ করে। তিনিই প্রথম মহারাষ্ট্রীয় নারী যিনি এই পুরস্কারটি লাভ করেন। Kinship Organization in India শীর্ষক অত্যন্ত সুখপাঠ্য বইটিতে সমগ্র ভারত জুড়ে জ্ঞাতিত্ব কাঠামোর বিভিন্নতা বোঝাতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা এবং ভৌগলিক পার্থক্যকে ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ছিলেন, তাই তার অনুসন্ধানগুলিকে সপ্রমাণ করতে অক্লেশে ব্যবহার করেছেন সংস্কৃত এবং পালি ভাষার বিবিধ উপাদান। Hindu Society— an interpretation বইটিতে তিনি ফিল্ড স্টাডির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য এবং হিন্দি, মারাঠি, সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত পুঁথিগুলির ওপর ভিত্তি করে হিন্দু সমাজের বিশ্লেষণ করেছেন। এই বইটিতে তিনি প্রাক-আর্য যুগেও হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রথার অস্তিত্বের কথা বর্ণনা করেছেন এবং বর্তমান রূপে তার ক্রমবিবর্তনের পথটিকে চিহ্নিতকরণের চেষ্টা করেছেন। Maharashtra— Land and People বইটিতে সুচারুরূপে বর্ণিত হয়েছে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং আচার-অনুষ্ঠানের কথা। The Pandharpur Yatra বইটিতে তিনি পুনে থেকে মহারাষ্ট্রের সোলাপুর জেলায় অবস্থিত পন্ঢরপুরের শ্রীবিটল-রুক্মিণী মন্দির সফরের একখানা অসামান্য ভ্রমণকাহিনি বর্ণনা করেছেন, যা বর্তমানে একটি ধ্রুপদি সাহিত্যসম্পদ হিসেবে সর্বজনবিদিত। প্যাট্রিসিয়া উবেরয়, নন্দিনী সুন্দর, সতীশ দেশপাণ্ডে সম্পাদিত Anthropology in the East: The Founders of Indian Sociology and Anthropology বইটিতে নন্দিনী সুন্দরের লেখা 'In the Cause of Anthropology: The Life and Work of Irawati Karve' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করা হয়েছে - একজন গোঁড়া নাস্তিক হয়েও পন্ঢরপুরের ভগবান বিঠোবার

বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ অবধি নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার মধ্যে সুস্পষ্ট পদ্ধতিগত পার্থক্য ছিল। পূর্ববর্তী বিষয়টি ছিল ফিল্ড ওয়ার্ক ভিত্তিক, পরবর্তীটি ছিল কেস স্টাডি নির্ভর। কঠোর শারীরিক পরিশ্রম এবং নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতির বাইরে গিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কারণে নারীদের পক্ষে নৃবিজ্ঞানকে গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা সে-আমলে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ছিল। তদুপরি নৃতত্ত্ব যেহেতু বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা তাই 'মেয়েদের বিজ্ঞান পড়তে নেই' কিংবা 'মেয়েরা বিজ্ঞানের মারপ্যাঁচ বুঝতে অক্ষম' এসব প্রচলিত ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে নৃবিজ্ঞান পাঠে তাঁদের নিরুৎসাহ করা হত। অথচ ইরাবতী এই বিষয়টিকেই আপন করে নিলেন।

মন্দির ভ্রমণ প্রসঙ্গে ডঃ কার্ভে বলেছেন, '(ধর্ম) বিশ্বাসের পরিবর্তে ঐতিহ্যের কাছে বশ্যতাস্বীকার'। তাঁর লেখা Kinship Organization in India, The Pandharpur Yatra, Bhils of West Khandesh, প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বর্তমানে নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ধ্রুপদি আকর গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত।

ভারত তথা সারা বিশ্বের পণ্ডিতেরা তাঁদের গবেষণাপত্রে ডঃ কার্ভের মহামূল্যবান শিক্ষয়তনিক গবেষণার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর জীবৎকালেই। ইংল্যান্ডের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এবং আফ্রিকান স্টাডিজ থেকে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলার ফাউন্ডেশনের হিউম্যানিটি বিভাগ, ডক্টর কার্ভেকে প্রায়শই এই সব বিশ্বখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নৃতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা-সন্দর্ভ উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হত। প্যাট্রিসিয়া উবেরয়, নন্দিনী সুন্দর, সতীশ দেশপাণ্ডে সম্পাদিত Anthropology in the East: The Founders of Indian Sociology and Anthropology বইটিতে নন্দিনী সুন্দরের লেখা 'In the Cause of Anthropology: The Life and Work of Irawati Karve' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে, ডঃ কার্ভের পঠনপাঠনের পরিধি ছিল ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। একদিকে যেমন তিনি রামায়ণ-মহাভারতের মত সংস্কৃত মহাকাব্য থেকে ভক্তি সাহিত্য সবই পাঠ করেছেন, অন্যদিকে তেমনই অলিভার গোল্ডস্মিথ, জেন অস্টেন, আলবার্ট ক্যামাস, অ্যালিস্টার ম্যাকলিন প্রমুখ পাশ্চাত্য জগতের সাহিত্যিকদের রচনাসম্ভারে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে থাকা শিক্ষায়তনিক গবেষণামূলক গ্রন্থগুলি বর্তমানে ডেকান কলেজের গ্রন্থাগারে অমূল্য সম্পদ হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে।

দেশের দ্বিধাবিভক্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নারী সহ দুর্বল সম্প্রদায়ের শোষণ এবং ধর্মের ওপর ভীষণভাবে নির্ভর করে টিকে থাকা একটি সমস্যাদীর্ণ সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেও, ডঃ কার্ভে সমাজের চিরাচরিত রীতিনীতির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করবার সাহস দেখিয়েছিলেন।

১৯৭০ সালের ১১ই অগাস্ট ডঃ কার্ভে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যু সাধারণভাবে ভারতের শিক্ষায়তনিক জগতের জন্যে এবং বিশেষভাবে সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর দেহাবসান মারাঠি ভাষাভাষী মানুষদের জন্যে আরও বৃহৎ ক্ষতি, কারণ তাঁদের চোখে তিনি ছিলেন বিরল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন এমন একজন কথাশিল্পী যিনি কিনা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার পাশাপাশি মানব আচরণ গঠনকারী মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলিকেও নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী ছাড়াও ইরাবতী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।

জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ডঃ ইরাবতী কার্ভে যাপন করেছিলেন একটি ব্যতিক্রমী জীবন। যেমন, বিবাহিত হিন্দু মহিলাদের ব্যবহৃত কোনও পরম্পরাগত বিবাহের প্রতীক না পরার সিদ্ধান্ত। তা ছাড়া পুনের রাস্তায় স্কুটার চেপে ঘুরে বেড়ানো প্রথম মহিলা ছিলেন তিনিই। অন্যদিকে আবার সমাজবিজ্ঞানী তথা নৃবিজ্ঞানী ডঃ ইরাবতী কার্ভে তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবন জুড়ে গবেষণা করাকালীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন। তিনি এমন একটি সময়ে, এমন একটি পরিবেশে গবেষণা করছেন যা কিনা মহিলা গবেষকদের জন্যে মোটেই অনুকূল ছিল না। অভিজাত পরিবারের মহিলা হওয়া সত্ত্বেও, ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও গবেষণা চালিয়ে গিয়েছিলেন। দেশের দ্বিধাবিভক্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নারী সহ দুর্বল সম্প্রদায়ের শোষণ এবং ধর্মের ওপর ভীষণভাবে নির্ভর করে টিকে থাকা একটি সমস্যাদীর্ণ সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেও, ডঃ কার্ভে সমাজের চিরাচরিত রীতিনীতির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করবার সাহস দেখিয়েছিলেন। নতুনভাবে ভারতীয় সমাজকে চিনবার-জানবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে গিয়েছেন তিনি আজীবন। তাই তো আজও ডঃ ইরাবতী কার্ভে ভারতের সমস্ত নবীন নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের হৃদয়ে অনুপ্রেরণা হয়ে চির জাগরুক হয়ে আছেন।

স্কেচ: বিদিশা চন্দ

ভিরিঙ্গি শিবপদ

তনুশ্রী পাল

প্রায় তিনটি দশক পরে ঘটনাচক্রে দেখা। ওকে দেখে খানিকক্ষণ হাঁ হয়েই রইলাম! সত্যি কথা বলতে অবাক হতেও যেন ভুলে গেলাম আর শ্রীমদ্ভাগবতগীতার একটি শ্লোক মনে পড়ে গেল। এমনও হয়! মানুষ এতটাই পাল্টে যায়? বিস্মৃতপ্রায় অতীত এমন ঐশ্বর্যময় বর্তমান হয়ে সামনে দাঁড়ালে চোখে-মনে খানিক ধাঁধা লাগে বইকি! এ আমি কাকে দেখছি! সামনের চুল উঠে গিয়ে কপালটা চওড়া, নাক আর কপালের ওপর সেই আড়াআড়ি কাটাদাগটা তেমনই। গলায় সেসব তাবিজ কবচের পরিবর্তে সোনার চেন উঁকি দিচ্ছে। ধবধবে সাদা ব্রান্ডেড শার্ট কালো প্যান্টের ভেতর গুঁজে পরা। চকচকে কালো শু; সবমিলিয়ে আধুনিক ঝাঁ চকচকে নার্সিংহোমটার সঙ্গে খুব মানানসই। কালো, নাদুসনুদুস বুনো টাইপের চেহারার ওপর চমৎকার শহুরে পালিশ! সেই হলদে ছোপওয়ালা বড়বড় দাঁতের সারি এখন ফটফটে সাদা। কথাবার্তাও চমৎকার!

একই ছাদের নীচে অনেকগুলো সুবিধা পাওয়া যাবে; তাই ভাইবোনেরা মাকে এখানে নিয়ে এসেছি। এই পঁচাত্তরেই ওনার শরীরে অনেক রোগ। নার্ভের সমস্যা থেকে শুরু করে আরও নানা কিছু। ডাক্তারবাবু একটা এমআরআই করিয়ে নিতে বলেছেন, সেটা হবে। ওনার পরামর্শেই এই নার্সিংহোমে। চোখের জন্যে আলাদা কমপ্লিট একটা উইং আছে এদের, তার সুনামও আছে বেশ। ক্যাটারাক্ট অপারেশন হবে মায়ের এখানে; অনেকগুলো টেস্ট হবে আজ। ওর সুসজ্জিত চমৎকার নিজস্ব কেবিনে বসিয়ে বলল, 'শোন জ্যাঠিমার কোনও অযত্ন হবে না এখানে। ভালো ক্যাবিন দিয়ে দেব। এসি, ননএসি দুরকমই আছে। তোরা যে কেউ সঙ্গে থাকতে পারবি। চেকে হয় না, পুরোটাই অ্যাডভান্স আর ক্যাশ পেমেন্ট করার নিয়ম। তবে তোদের কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না। আমার মিসেস ক্যাশে থাকে আমি বলে দিচ্ছি, অসুবিধা থাকলে পরে পেমেন্ট করলেও

হবে। একই জায়গার লোক আমরা, এখানে আর কোনও কথা নেই। জ্যাঠিমা আমার মায়ের মত।' কথার মধ্যে কোথাও কোনও জড়তা বা অসংলগ্নতা নেই। স্ত্রীর সঙ্গে পরে পরিচয় করিয়ে দিল। ভানুপ্রিয়া তামাং। এই স্বল্পভাষী, আন্তরিক, চটপটে ও বুদ্ধিমতী অবাঙালি মহিলাটির অবদান যে কতটা গভীর শিবার জীবনে, স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলাম। কীভাবে, কী দেখে ওকে বিয়ে করেছেন এই মহিলা! কীভাবে পাল্টে দিতে পারলেন পাগলাটে ছেলেটির জীবন? নাকি আরও কোনও বিশেষ মানুষের ছোঁয়ায় লোহার পাতটি সোনা হয়ে গেল! এখন এতবড় একটা নার্সিংহোম চালাচ্ছে ওরা দুজনে। কত স্টাফ এদের সব সামলাচ্ছে! ওকে কী বলে সম্বোধন করব ভেবে পাচ্ছিলাম না, ভাববাচ্যেই প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সারি।

আমাদের সঙ্গে প্রাইমারিতে পড়ত শিবা, শিবপদ। বুড়া মাষ্টারমশাই অবশ্য বলতেন 'ধুর অ, শিবপদ না কোন ছাই, নন্দীভৃঙ্গীর জাতভাই।' ডাকতেন ভিরিঙ্গি বলে, নিরাপদ দূরত্বে থেকে ছাত্রছাত্রীরাও তাকে নিয়ে ছড়া কাটত 'অই ভিরিঙ্গি অই ভিরিঙ্গি/ তর নাকের ফুটায় কী?' ব্যাস হয়ে গেল। মুখে বিকট গালি, হাতে লাঠি বা পাথরের টুকরো যা হোক নিয়ে সে তেড়ে যাবে শত্রুর দিকে এবং সেসব অস্ত্র বিনা বাক্যব্যয়ে প্রয়োগ করবে আগুপিছু না ভেবে। আর হাতের কাছে তেমন উপকরণ মজুত না থাকলে নিজের তেল চুকচুকে ভারি শরীরটিকেই গুরুতর অস্ত্রের মতই শত্রুর ওপর নিক্ষেপ করে, তাকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে ছাড়বে। প্রায়ই তার বাড়ি বয়ে হেডমাষ্টারমশাই নালিশ করতে যান, কিন্তু তাতে কিছুই পরিবর্তন দেখা যায় না শিবার আচরণে। তাদের বিশাল গুদামের সামনের গদিঘরে মাষ্টারমশাইকে সাদরে বসিয়ে ওর বাবা বলেন, 'চা খান মাস্টর চা খান, তার হইয়া আমি আপনার কাসে করজোড়ে ক্ষমা চাই। আরেট্টু বড় হইলে সাইরা যাইব। মাপ দ্যান, মাপ দ্যান। আমি কইয়া দিমু তারে। হে হে হে। আহা শিক্ষক সে কত মাইন্যবর মানুষ, আহা।'

তেল চকচকে উলুম-ঝুলুম কোঁকড়া চুল, নাকে আর কপালের মাঝে আড়াআড়ি লম্বাটে কাটা দাগ, তার কালচে ভারি ঠোঁটের ওপর চেপে বসে থাকত বড়বড় না-মাজা হলদে দাঁতের সারি। চাপা আর খানিক ওলটানো নাসিকার গহ্বরদুটিও দিয়ে অন্দরের দৃশ্য দেখা যেত এবং সারাবছর ধরেই তার সর্দি। গলায় কালো সুতোয় বাঁধা কীসব তাবিজ-কবচ। নিয়মিত স্নান, দাঁত মাজা কোনওটাই তার ধাতে সইত না। খেলতে খেলতে হঠাৎ স্কুলের কথা মনে পড়লে সে স্কুলে এসে হাজির হল। পেছন পেছন তার ঠাকুমা এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন স্কুলের সামনে বাঁ ধারের ঘোড়ানিম গাছের নীচে। পাহারা দিতেন নাতিকে। নাতি ক্লাসে ঢুকলে তবেই তিনি বাড়ি ফিরতেন। কোনও কোনও দিন আবার ঘন্টা দুয়েক পর ফিরে এসে ওখানে দাঁড়াতেন। নাতি শত দুষ্টুমি করলেও তাকে শাসন করছেন বা বকছেন এমনটা দেখি নি, বরং মাষ্টারমশাইরা কেউ ওকে বকলে তিনি এসে ঝগড়া লাগিয়ে দিতেন।

সাধারণত ক্লাস শুরু হবার পর শিবা স্কুলে আসত আর কখনই প্রথামত 'মাষ্টারমশাই আসব' বলে সরাসরি ক্লাসে ঢুকত না। দরজার ধারে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে অথবা পেছন দিকের জানালায় ধারে দাঁড়িয়ে ক্লাসের ওপর নজর রাখত। কখনো ক্লাসের ভাঙা বেড়ার অংশের ধারে ঘাপটি মেরে বসে বসে দেখত, ছোট পাথর যা প্রায়ই থাকত তার পকেটে, সেগুলো দিয়ে টুকটাক ঢিল মারত ক্লাসের ভেতর। কারও গায়ে লাগলে সে নালিশ করত 'মাষ্টারমশাই দ্যাখো শিবা আমাকে মারল।' 'কইরে শিবা এদিকে আয়, কোথায় লুকাইচিস রে শয়তান। আয় এদিকে।' এমন সব ঘটনার পর ক্লাসে ঢুকত শিবা।

বেশ অন্যরকম একটা আবহাওয়া তৈরি হয়ে যেত সে স্কুলে এলেই। তবে কোনওকালেই সে আমার তত বন্ধু হয়ে ওঠেনি। আসলে শুধু আমার কেন, স্কুলে তার কোনও বন্ধুই ছিল না। শিবা

বা শিবপদ সাহা, ছিলই সে একেবারে আলাদা রকমের ছেলে। নিজস্ব টাইমে স্কুলে আসে আবার ইচ্ছে হলেই ফেরত যায়। কারও কোনও অনুমতি নেওয়ার মোটে ধার ধারে না। তার এমন ধারা ব্যবহার দেখলে মনেহয়, স্কুলটা যেন তার সত্যিকারের মামারবাড়ি বা বাপের কেনা সম্পত্তি! তবে হ্যাঁ তার বাপের সত্যিই মেলা সম্পত্তি। আর এমন একটা-দুটো স্কুল তার বাবা ইচ্ছে করলে কিনে নিতেই পারেন। তেমনটা করলেই বোধহয় উনি ভালো করতেন।

অতি আদরে এক্কেবারে খাঁটি বাঁদর হয়ে উঠেছিল শিবা। হাড় জ্বালিয়ে খাচ্ছিল সে পাড়ার লোকের, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মায় মাষ্টারদের পর্যন্ত! কৃষ্ণপদ, শ্যামাপদ দুই দাদা; পারুল আর টগর দুই দিদির পরে, মানে অনেক পরে শিবার জন্ম। বাড়ির ছোটছেলে, বড়ই আদরের। বিশেষ করে ঠাকুমার চোখের মণি সে। কারণও আছে। বাড়ির লোকের পরবর্তীতে গ্রামসুদ্ধ লোকের বিশ্বাস ওর দাদু রাধামাধব সাহাই শিবা হয়ে ধরাধামে রয়ে গেলেন। এই ঘরবাড়ি, দোকান-গুদাম, ব্যবসা বাণিজ্য, বৌ ছেলের মায়া কাটাতে পারেন নি উনি। ওধারে ঠাকুরদার শ্বাস বন্ধ হল, এধারে নাতি ভূমিষ্ঠ হয়েই চিলচিৎকারে আগমন সংবাদ জানাল। ঠাকুমা স্বামী শোকে কাতর হবারই সময় পেলেন না। ঠাকুমা সহ বাড়িসুদ্ধ লোকের কেমন বিশ্বাস হল, হ্যাঁ তিনিই! পুরনো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করেছেন। শিবার ছয়ষষ্ঠির দিনই নাকি নামসংকীর্তন, হরিরলুঠ ইত্যাদির আয়োজন হয়েছিল বেশ বড় করে। ছ'মাসের মত দেখতে ছ'দিনের বাচ্চা তখন নাকি চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে ছিল সারাক্ষণ! একবছর বয়স হতেই শিবা দিনে এক কেজি দুধ খেয়ে হজম করে ফেলে; বাড়ির লোকেরা বলাবলি করে তার এসব আচরণ একেবারেই তার প্রয়াত ঠাকুরদার মত।

তো একটু বড় হতেই বাড়ির সবার অসীম প্রশ্রয়ে বিশেষ করে ঠাকুমার অতি আদরে শিবা একটি আস্ত বাঁদরে পরিণত হল। স্কুলে ভর্তি হয়ে তার বাঁদরামি এককথায় গুন্ডামিতে পরিণত হল। ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের অকারণেই পিঠে দুম করে কিল মারা, কান মলে দেওয়া, থুতু ছেটান, মেয়েদের খিমচি দেওয়া। চুলের ফিতে টান মেরে খুলে নেওয়া, চুল ধরে টেনে মাটিতে ফেলা। অন্যের শার্টের বোতাম ছেঁড়া, অন্যের কাঠি বরফ বা আচার কেড়ে নিয়ে খাওয়া। বই-খাতা-পেন-পেনসিল কেড়ে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া, কোথা থেকে ফড়িং ধরে এনে অন্যের জামার ভেতর ছেড়ে দেওয়া! উফ আরও কত প্রকারের নব নব দুষ্টামির প্রক্রিয়া সবসময় তার মাথায় জন্মাত সে আর বলার না। এসব নিত্য নৈমিত্তিক দুষ্টুমি তো ছিলই সেই সঙ্গে তার

শিবা বা শিবপদ সাহা, ছিলই সে একেবারে আলাদা রকমের ছেলে। নিজস্ব টাইমে স্কুলে আসে আবার ইচ্ছে হলেই ফেরত যায়। কারও কোনও অনুমতি নেওয়ার মোটে ধার ধারে না। তার এমন ধারা ব্যবহার দেখলে মনেহয়, স্কুলটা যেন তার সত্যিকারের মামারবাড়ি বা বাপের কেনা সম্পত্তি!

বিশেষ উৎসাহ ছিল দুর্বল স্বাস্থ্যের বা ছোটক্লাসের রোগা-পটকাদের ওপর অভিনব সব অত্যাচার চালানো। কী জানি কোথা থেকে এত ছোট বয়সে সে এমনধারা কান্ড করে আনন্দ পেতে শিখল!

'দাঁড়া তোকে শূর্পনখা বানাবো' মেয়েদের উদ্দেশে এমন ধারা গালি দিত সে। আমরা ভয়ও পেতাম তার হাবভাবে, কিছুই বিশ্বাস নেই সে এমন কিছু করে ফেলতেও পারে! তবে কোথা থেকে এহেন ভাবনা এলো তার মাথায়? বাড়ি থেকেই? কে জানে, তবে ওদের বাড়ির একটি পুরনো ঘটনা লোকমুখে প্রচার পেয়েছিল। ওর ঠাকুরদার বাবা বা জ্যাঠা ছিলেন খুব রাগীমানুষ। ঘোমটা মাথায় দিয়ে গিন্নি একদিন রান্নাবাড়ির বারান্দায় খেতে বসা

মুনিশটিকে পাহাড় প্রমাণ উঁচু ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে হেসে হেসে কী জানি বলছিলেন; ব্যস সে দৃশ্য চোখে পড়তেই ভয়ানক রেগে উঠে বউয়ের দুলসুদ্ধ কান ধরে এমন টান মেরেছিলেন যে কানই নাকি ছিঁড়ে গিয়েছিল! সেই দৃশ্য দেখে সে লোকটি ভাতটাত ফেলে ঝেড়ে এমন দৌড় লাগিয়েছিল এক্কেবারে টানা পাঁচমাইল দৌড়ে তবে গিয়ে কোন নদীর ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল! ঘটনার সত্যমিথ্যা আর কে জানে; কিন্তু শিবার কথায় আর আচরণে মনে হয় হতেও পারে। শূর্পনখা বৃত্তান্ত ভাবলেই নাক কানের ডগা কেমন শিরশির করে।

এর মধ্যে একজন নতুন মাষ্টারমশাই এলেন স্কুলে। বিনয় মাস্টারমশাই। খুব হাসিখুশি, ভালবাসেন সবাইকে। বাঁশের কঞ্চি নিয়ে ক্লাসে যান না কোনওদিন। কানমলা, হাতের পাতায় বেতমারা বা নিলডাউন এসব কোনও শাস্তি নেই। গল্পও শোনান মাঝে মাঝে। স্বাস্থ্যবিধি শেখান, টিফিনের সময় আমাদের কাবাডি, রুমালচোর এমন সব খেলা শেখান। অল্প ক'দিনেই বিনয় মাষ্টারমশাইকে সব্বাই ভালবেসে ফেললাম আমরা। উনি ঘোষদের বাড়ির বাইরের দিকে একটেরে একটি ঘরে থাকেন। ঘোষেরা এমনিই মাষ্টারমশাইকে ওদের বাইরের দিকের ঘরটায় থাকতে দিয়েছিল। শনিবার করে উনি শহরে নিজের বাড়িতে যেতেন, সোমবারে ফিরতেন। একবার একটা হারমোনিয়াম নিয়ে এলেন আর ভোরবেলায় গলা সাধতে লাগলেন। আশেপাশের বাড়ির অনেকেই খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ল। অনেক অভিভাবকেরাও বেশ খুশি, তাদের অনুরোধে মাষ্টারমশাই কয়েকজন ছেলেমেয়েকে সা রে গা মা শেখাতে শুরু করলেন।

শিবাও মাষ্টারমশাইয়ের বাড়ির ধারে কাছে ঘুরঘুর করতে লাগল। গান শেখার থেকেও, হারমোনিয়মটাই সম্ভবত তাকে টানছিল বেশি! মাষ্টারমশাই সাদরে তাকে ডেকে নিলেন ঘরে, সে শান্ত হয়ে বসে থাকে, গান শোনে আর হঠাৎ ফট করে হারমোনিয়মের যে কোন একটা রিড টেপে। মাষ্টারমশাই তাতে রাগ করেন না। উনি হয়ত ধরেই নিয়েছিলেন এবার সুরের ভেলায় ভেসে শিবপদ প্রকৃত সুভদ্র মানুষ হয়ে উঠবে। কিন্তু সে আশা দুরাশা বা দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে সময় লাগল না। এক সোমবারে বাড়ি থেকে ফিরে স্কুল শেষে ঘোষেদের দেওয়া সে ঘরে ঢুকে উনি আঁতকে উঠলেন। হারমোনিয়ামটা সাতটুকরো অবস্থায় ছত্রখান হয়ে বিছানার ওপর পড়ে আছে! মনে হচ্ছে কে যেন এ যন্ত্রের মধ্যে সুর কোথায় সৃষ্টি হয় তা বোঝবার খুব জোর চেষ্টায় যন্ত্রটার প্রতিটি অংশ ভেঙ্গেচুরে খুলে খুলে দেখেছে! চুরি করবার ইচ্ছে থাকলে তো তুলেই নিয়ে যেত সে আগন্তুক! মাষ্টারমশাই আমাদের ততদিনে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' 'আহা ফাগুনের নবীন আনন্দে' এই দুটো গান শেখাতে শুরু করেছেন। রোজ প্র্যাকটিস করাচ্ছিলেন, স্কুলের রবীন্দ্রজয়ন্তীতে গাওয়াবেন বলে। সব আনন্দ মাটি। কে করেছে কান্ডটা খোঁজ খোঁজ খোঁজ; পরে জানা গেল ওই সোমবারেই স্কুলে না গিয়ে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে এই কান্ড করেছিল শিবা!

যথারীতি স্কুলেও এল আর যথারীতি দুষ্টুমিও করতে লাগল। তারপর এল সেই বিশেষ দিন। সেদিন একটা ক্লাস থ্রির মেয়ের মাথায় গোটা চারেক গাট্টা মেরে ওর বই কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে দিল শিবা। মেয়েটা কাঁদতেই থাকল, সবাই মিলে হেডমাষ্টারমশাইয়ের কাছে নালিশ করা হল। উনি খুব রেগে গিয়ে পাতলা বেতটা নিয়ে বেরোলেন, ধরেও ফেললেন শিবাকে। তারপর ওর উলুম ঝুলুম চুলের মুঠি ধরে শপাং শপাং কটা বাড়ি পিঠের মধ্যে। 'এরপর যদি আর দুষ্টুমি করিস তোকে এমন মার মারব না তুই বাপ ঠাকুরদা চোদ্দপুরুষের নাম ভুলে যাবি। স্কুলেই আর ঢুকতে দেব না তোকে মনে রাখিস। তোকে মানুষ করা আমার কম্ম না। বুঝলি! থাক এখানে কান ধরে নিলডাউন হয়ে। বাপের জন্মে এরকম শয়তান দেখি নাই।' এভাবে শাসন করে হেডমাষ্টারমশাই পেছন ফিরে ঘরের দিকে রওনা হলেন আর মুহূর্তের মধ্যে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অঘটনটি ঘটিয়ে শিবপদ

চিরতরে স্কুল থেকে বিদায় হল।

দৃশ্যটি এখনও মনে আছে, ওই নিলডাউন থেকে উঠে এক দৌড়ে সে প্রথমে হেডমাষ্টারের পিঠে উঠে পড়ল, ওনার মোটা কাচের চশমাটা টান মেরে চোখ থেকে খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলল, চুল টানল আর পিঠে জোরসে দুমদুম করে কী একটা করে লাফিয়ে নেমে এক দৌড়ে সামনের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'দাঁড়া না, দা নিয়ে আসব। সবাইকে কুচি কুচি কইরে কাটব। সবাইকে মাইরে ফেলব।' তারপর এক লাফে পাটখেতে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই ওকে শেষ দেখেছি। আর কখনো স্কুলে আসে নি শিবা, তবে ওর বাবা নাকি এসেছিলেন হেডমাষ্টারমশাইয়ের কাছে, করজোড়ে ক্ষমা চেয়েছেন ছেলের হয়ে বারবার। জীবনের শত ব্যস্ততায় ভুলেও গিয়েছিলাম শিবাকে। গ্রামের সঙ্গেই সম্পর্ক ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেছে একসময়। তবে কানে এসেছিল ওর বড়দি পারুল নিজের কাছে নিয়ে গেছে। বিস্মৃতির অতলে চাপা পড়ে গিয়েছিল সব, মাকে এখানে না নিয়ে এলে শিবার এই উত্তরণ হয়ত অজানাই থেকে যেত!

ধান, পাট, তামাকের ব্যবসার সঙ্গে নানা জায়গায় প্রচুর জমি ক্রয় করে রেখে ছিলেন শিবার দূরদর্শী বাবা। রেলওয়ে জংশনের আসেপাশে সেকালেই শস্তায় প্রচুর জমি কিনে রেখেছিলেন সাহামশাই। শিবার ভাগেও অনেক সম্পত্তি, এই জমিটাও। পরে নার্সিংহোম তৈরি করেছে, শ্বশুর ডাঃ তামাংয়ের পরামর্শে। এছাড়াও আরও প্রপার্টির মালিক শিবা। স্কুলের পড়া শেষ করে অপথালমোলজি ট্রেনিং নিয়েছে, সেখানেই ভানুপ্রিয়া তামাংয়ের সঙ্গে তার প্রথম দেখা। ভানুপ্রিয়ার বাবা ডাঃ তামাংয়ের নামেই নার্সিংহোমটির খ্যাতি। ওই ক'দিনে ওর সম্পর্কে এসব জেনেছিলাম। হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর থেকেও বিখ্যাত কয়েকজন ডাক্তার প্রতিমাসেই এখানে পেশেন্ট দেখেন। ওর এক মেয়ে ডাক্তারি পড়ছে কলকাতায়, ছেলে এমবিএ করছে হায়দরাবাদে। ওকে পুরনো নামে ডাকার কথা আর মনেও আসে নি। যেভাবে ও আর ভানুপ্রিয়া সে ক'দিন আন্তরিক ভাবে আমাদের পাশে পাশে থেকেছে। মায়ের কাছে গিয়ে বসেছে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও অপারেশনের আগে পরে ক্রমাগত আপন আত্মীয়ের মত খোঁজখবর করেছে, মুগ্ধ হয়ে থাকলাম। ভাবছিলাম এই কি আমাদের সেই শিবা, ভিরিঙ্গি?

এই নতুন শিবাকে দেখে আমার শ্রীমদভাগবদগীতার শ্লোক মনে পড়ছিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন মনুষ্যের তিনটি গুণের কথা 'সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত। জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত।। রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত। রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।।' অর্থাৎ 'সত্ত্বগুণ সুখ আনে, রজঃগুণ মানুষকে কর্মে রত করায়, জ্ঞানকে আড়াল করে ভ্রান্তি সৃষ্টি করে তমঃগুণ। মানুষের জীবনে কখনো প্রবল হয় সত্ত্বগুণ, কখনো রজঃগুণ কখনোবা তমঃগুণ প্রবল হয়ে ওঠে।' মানুষ যখন যে গুণের অধীন হয়ে পড়ে তখন তার তেমনই আচরণ। সেই বাল্যকালে শিবার মধ্যে তমঃগুণের আধিক্যই প্রবল ছিল নিশ্চয়ই আর আজ রজঃ আর সত্ত্বগুণ ওকে পরিচালিত করছে নিশ্চিত। দু'চক্ষে যাকে দেখতে পারতাম না, মনে মনে আজ তার শুভকামনা করি, 'মঙ্গল হোক তোর শিবপদ, ভাল থাকিস রে।'

শিবাও মাষ্টারমশাইয়ের বাড়ির ধারে কাছে ঘুরঘুর করতে লাগল। গান শেখার থেকেও, হারমোনিয়মটাই সম্ভবত তাকে টানছিল বেশি! মাষ্টারমশাই সাদরে তাকে ডেকে নিলেন ঘরে, সে শান্ত হয়ে বসে থাকে, গান শোনে আর হঠাৎ ফট করে হারমোনিয়মের যে কোন একটা রিড টেপে।

দেবাদিদেব পিতৃদেব

প্রতীক মুখার্জী।
২৭ জুলাই ২০২০

ফেসবুকের সব্বাই জানে আমার পিতা প্রেমের কথা। আমার মতো করে যদি কেউ পৃথিবীতে বাবা'কে ভালোবাসতে পেরেছে; তাঁরা মাত্র দুজন। অনন্যা পান্ডে এবং টাইগার শ্রফ।

যাক গে যাক। আসল কথায় আসি।

বেশ ক'দিন যাবৎ ফেসবুকে থাকার সুবাদে বেশ কিছু সুশীল কবিতা পড়ে বাবার এই বয়সে এসে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামান্য সুগার হয়েছে আর বেশ খানিকটা প্রেশার বেড়েছে। আমি সচরাচর ভাষা নিয়ে কাউকে মলেস্ট করবো; এরকম নিম্নরুচির পুং পুরুষ নই। উপরন্তু বাবার ডাক্তারে এলার্জি। তো ধরে বেঁধে সমস্ত টেস্ট-রিপোর্ট করিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ডাক্তারের কাছে ক'দিন আগে। তখন সবে মার্চের শুরু। শীত সবে গেছে। 'হু' বলেছে— করোনা কোনো রোগ'ই নয়! স্রেফ ট্রেনের দেওয়ালে সাঁটানো "আপনার কী শিথিল? বক্র? ক্ষুদ্র? বাঁকা?" মার্কা পোস্টার। ডাক্তারবাবু বাঙালি নন। পাঞ্জাবি ভদ্র মানুষ। অমায়িক। সরল। চকচকে। ফর্সা। তেলা তেলা গা হাত পা। গিয়ে একটু আতঙ্কিত হলাম। ডাক্তারবাবু বাংলা বুঝতে তো পারেন। ঠিক করে বলতে পারেন না। গিয়ে ঢুকলাম। পাশাপাশি দুটো চেয়ার। মা আমার রাগী। ছোটবেলায় ময়াল সাপের মত খেলার মাঠ থেকে মুড়ো ধরে টানতে টানতে নিয়ে কলতলায় ফেলে কিলো দরে রাম ক্যালানি দিত। বলতো— 'কাঁদলে আরো মারবো।' পাপ করতো একজন ব্রাহ্মণ পুত্রকে মেরে। তাই ঠাকুর বাবাকে স্বামী করে পাঠিয়েছিলেন আগেভাগেই। সেটা বড় কথা নয়। আমার সম্মানহানি হলে আপনাদের যে ভালোই লাগে তা আমি বিলক্ষণ বুঝি। আসি দেবাদিদেব পিতৃদেবের কথায়। চেম্বারে ঢুকে মা পাশের চেয়ারে গম্ভীর মুখে বসল। বাবাও বসলো। আমি পিছনে বুম্বাদার মতো মুখচোখ লাক্স কোজি করে দাঁড়িয়ে। ডাক্তারবাবু সমস্ত রিপোর্ট দেখে বাবার দিকে মিষ্টি ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিলেন। এই হাসি আমার পছন্দ হলো না। কারণ আমি যদ্দুর জানি বাপ আমার বিবাহিত। মিহি গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে বুক ধাক্কানো কণ্ঠে বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন— 'আপ পেহলিবার? কই তাকলিফ?'

এই রে! আতঙ্ক আমার বাড়ছে। ঘামছি।

বাবার স্মার্ট জবাব— 'হাঁ স্যার। তাকলিফ থোড়া থোড়া...' আমি বমকে গেলাম। মনে উরিশ্লা লেভেলের প্রেমিকার কানের লতি চেবানো আনন্দ হল। বাবা আমার হিন্দি শিখে গেছে! চাপে পড়লে বাঘে-গরুতে যে একঘাটে জল খায় এবং এটা যে পড়া কথা নয় তা একা দিলীপ ঘোষ ও পুরো বিজেপি দলটা'কে দেখে এখন বুঝি। বুকটা মোদি করে দাঁড়িয়ে আছি। ডাক্তারবাবুর সাথে বাবার কথোপকথন শুরু হলো। আমি নিশ্চিন্ত। ডাক্তারবাবুর দ্বিতীয় প্রশ্ন— 'তো; প্র্যাদিপবাবু, কই টেনশন?'; বাবার উত্তর— 'নেহি স্যার। আম ফাইন।'

আমার বুকের ছাতি যত সময় যাচ্ছে, তত মোদি হচ্ছে! ডাক্তারবাবুর এবার— 'আপ মিঠাই খাতে হো? কেয়া পসন্দ হ্যায় আপকো? পুরে দিন কেয়া করতে হো আপ প্র্যাদিপবাবু? থোড়া

এক্সপ্লেন কিজিয়ে কাইন্ডলি।'

মা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। বাবা থামিয়ে দিলো। এতক্ষণ বাবা কেমন নেতিয়ে ছিল। এবার ঝাঁঝালো সজারুর মতো নড়ে উঠলো।

আশঙ্কা করেছিলাম। শুরু হলো এক মর্মভেদী, উদর কোমা বক্তৃতা— "হাম নতুন গুড়'কা রসগোল্লা খাতা হ্যায়। নতুন গুড় বুঝতে হো আপনি? ও লাল লাল। লাল পিঁপড়ে কা মাফিক কালার। হাঁ, কিন্তু ইয়ে ফেঁচো সুগার কোত্থেকে আ গায়া হাম নেহি জানতা। মাগার হাম রস চিপকে খাতা হ্যায়। নেহি তো ইয়ে পাশওয়ালি বিবি হামার বহুত চেল্লাতা হ্যায়। সত্যি বোলতা হ্যায় স্যার। আগার আপ রসগোল্লা মুঝে দে, তো হাম আপকে রস চিপকে খা লেঙ্গে। ওর সারাদিন বাজার দোকান থাকতা হ্যায়। রিটায়ার লোকেকা কই সম্মান শ্রদ্ধা নেহি হ্যায়। আগার হাম বেশি মিষ্টি খাতে, তো আপনার জ্যায়সা ইতনা মোটাসোটা নাড়ুগোপাল নেহি হো যাতা?'

আমি বসে পড়েছি।

ডাক্তারবাবুর ফর্সা মুখ লাল।

মা ফোন হাতে নিয়ে এক-দুই-তিন টিপছে। মনে হয় উকিলের নাম্বার খুঁজছে।

ডাক্তারবাবু ধৈর্যশীল লোক। মিহি গলায় বললেন— 'ওকে মিস্টার মুখার্জী। ঔর কই প্রবলেম? কই পরেসানী?' বাবা ফুল ফর্মে। তৎক্ষণাৎ উত্তর— 'না না। কই আগে সানি, পরে সানি কুছ নেহি হ্যায়। শুধু রাত্তির মে বেশি বেশি হিসি লাগতা হ্যায়। বার বার বাথরুম যাতা হ্যায়। সেদিন ফেসবুক মে পড়া, যাদা হিসি নাকি শনি ঠাকুর কা অভিশাপ হ্যায়। হাম পুজো দিতে গ্যয়ে। কিন্তু কি বদমাইশ পুরোহিত! পুরোহিত না নির্মলা সীতারামন! বোলা একশো এক টাকা চাই। পয়সা লুট লুট কে আপকে জায়সা নধর হো গ্যয়া। হামকো আশীর্বাদ নেহি চাহিয়ে। বেশি আশীর্বাদ সে বেশি বেশি পয়সা চলা যাতা হ্যায়।'

ডাক্তার বাবুর মুখ জ্বলন্ত দাবানলের মতো। শান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন শেষ প্রশ্ন— 'তো আপ অভি কেয়া চাহতে হ্যায় মিস্টার মুখার্জী?'

বাবার অমায়িক প্রতিবাদী কোদাল মুখ থেকে বেরিয়ে এলো কিছু শব্দ— 'আমি কেয়া চাই সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো এই পাশ মে বসে থাকা বিবি কেয়া চাহতা। ক্ষমা করনা, আপকে বারোশ টাকা ফিজ শুনকে হামার খাওয়াদাওয়া কা ইচ্ছে উড়ে চলা গ্যয়া। আবার রক্তহীনতা না হো যায়ে। ও রিপোর্ট মে সকাল সকাল এক মগ রক্ত লেকে চলা গ্যয়া। আভি তাড়াতাড়ি সুস্থ হো যায়ে ব্যাস...'

আমার মা ডিভোর্স করে চলে গেলে;

খাসির দোকানগুলো বেসরকারি হয়ে গেলে—

আমায় একটু আলুপোস্ত করে খাওয়াবেন?

আজ সৃজিত বাবু আমাকে ব্লক না করে দিলে নির্ঘাত বলতেন— "awapnwar bawabwa kwe two bwadhiwe rwakhtwe hoy mowshwai."

মাইরি!

সন্ধে সন্ধে মানুষজন'কে অফেন্ড করতে আছে?

ছিঃ!

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩ উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

ঘরবন্দি দিনগুলিতে ঘরকন্না

বাড়িতে বসে থেকে যে কাজগুলো করা যায় লেখালেখি তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু কী লিখব? এত বেশি হতাশাজনক পরিস্থিতি আগে আসে নি, তাই স্বভাবতই মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। আর সবচেয়ে বড় কথা কোনও সুনির্দিষ্ট সময় নেই যে মানুষ ভাবতে পারে যে এরপর থেকে আবার সব আগের মত হবে, আবার আমাদের জীবন আগের মতই গড়গড়িয়ে চলবে... নিতান্ত খুঁড়িয়ে চলার রসদটুকু তো জীবনের চলার পথে সংগ্রহ করে নিতে হবে নাকি? খুঁজে নিতে হবে সেইসব কাজ বা চিন্তাভাবনা যা আমাদের গৃহবন্দি দিনগুলোতে একটু হলেও সদর্থক হবার কথা বলবে। যতটা সম্ভব বাড়িতে থাকার চেষ্টা করাই প্রয়োজন এখন, নিজের আর পরিবারের সুরক্ষায়।

সবার বাড়িতেই অল্প বিস্তর গাছগাছালি আছে। যদি নাও থাকে গাছকে বন্ধু বানিয়ে ফেলুন। একথা হলফ করে বলতে পারি গাছ আপনাকে ফিরিয়ে দেবে সমপরিমাণ বন্ধুত্ব। যে যে রকম পছন্দ করেন ফুল বা ফলের গাছ মাটিতে বা টবে লাগাতে পারেন। খুব সাধারণ কিছু ফুলের কথাই বলি, অল্প পরিশ্রমেই অনেক ফুল ফোটে এই বর্ষায়। অপরাজিতা এদের অন্যতম। নীল আর সাদা দুটো রঙেই হয়। টবে লাগানো গাছের খুব স্বাভাবিকভাবেই লতিয়ে বাড়ার একটা প্রবণতা থাকে, সেক্ষেত্রে ডগাগুলো কেটে দিতে হবে,তাহলে ঝোপড়া হয়ে উঠবে, আর ফুল ও হবে বেশি। যে সমস্ত গাছগুলো বারান্দায় রাখা থাকে তাদের এই বর্ষায় মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে ভেজানো ভালো। বৃষ্টির জলে অনেক স্বাভাবিক পুষ্টি পদার্থ থাকে যেটা তোলা জলে থাকে না। এইসময় করে আগাছা জন্মায় একটু বেশিই। সেগুলো পরিষ্কার করে, মাটি খুঁচিয়ে আলগা করে দেওয়াও জরুরি। আর একটা বেশ জরুরি কথা হল এইসময় পিঁপড়ের উপদ্রব খুব বেশি। সপ্তাহে দুই-তিন দিন নিমতেল একলিটার জলে,আট-দশ ফোঁটা দিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে। এতে ফাঙ্গাসের হাত থেকেও রক্ষা হবে গাছের। জবা, রঙ্গন, টগর এইসব রোজকার ফুলের জোগান দেওয়া গাছগুলোকেও একই ভাবে যত্ন করতে হবে। রেগুলার প্রুনিং করে খোলা জায়গায় রাখতে পারলে ঝলমলে হয়ে উঠবে ওদের চেহারা।

মাইক্রোয়েভের ব্যবহার আছে এরকম দুটো রেসিপি এবার দেব ভাবছি। বাঙালি শাক চচ্চড়িতে একঘেয়েমি এসে গেলে এই দুটো ট্রাই করতে পারেন। বাচ্চাদের সকাল-সন্ধ্যা খাবার জোগাতে জেরবার হোমমেকারদের আনন্দ দেবে রেসিপিগুলো।

স্পিনাচ এগ মাফিন

এই রেসিপিটাতে খুব মিনিমাম জিনিস লাগে আর যারা স্বাস্থ্য সচেতন আর মুখরোচক খাবার খেতে

চায় তাদের জন্য আদর্শ। পালং শাক, ডিম, চীজ, টমেটো— এই চারটে বেসিক জিনিস হলেই চলবে এছাড়া আপনি সুইট কর্ন আর ক্যাপসিকামও ব্যবহার করতে পারেন।

ডিমের সাদা অংশ আর কুসুম আলাদা করে নেবেন। সাদা অংশটা মিনিট পাঁচেক ধরে ফেটিয়ে নিলে অনেকটা সাদা ফেনার মত হবে, এবার হলুদ অংশ হালকা হাতে ফেটিয়ে ওটার সঙ্গে মেশান। এর মধ্যে দিন টমেটো আর পালং শাক কুচোনো। শাক খুব ভালো করে বারবার ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখবেন আগে। তার মধ্যে দেবেন পরিমাণ মত গ্রেট করা চিজ। এক্ষেত্রে একটা কথা বলি মৎজারেলা চীজ ব্যবহার করলে ভাল হয়। এখন সব শহরেই পাওয়া যায়। একান্ত না পেলে রেগুলার আমুলের চীজ কিউব নিয়ে নেবেন। স্বাদমতো নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো আর মিক্স হার্বস (এটি না হলেও চলবে) হালকা হাতে সব মিশিয়ে নিতে হবে। ওভেন প্রি হিট করে নেবেন। ৫-১০ মিনিট। মোল্ডগুলো তেল দিয়ে ব্রাশ করে নেবেন এবার। কেকের ব্যাটারের মতই এটাও ভরতে হবে মোল্ডের ৩ - ৪ অংশ, কেননা কাপ কেক বা মাফিনের মত এটাও ফুলবে তার জন্য এটুকু জায়গা রাখতে হবে। এবার ২০০ ডিগ্রিতে ২০ মিনিট বেক হবে কনভেনশন মোডে। করে আমাকে জানাবেন সবাই কতটা মজা করে খেল।

স্পিনাচ এগ মাফিন

সেভোরি পাই

সেভোরি পাই

পাই কোথায় পাই? রান্নাঘরে আসতে হবে, একটু যত্ন করে বানাতে হবে। ব্যস। আলু, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, কাঁচা লঙ্কা, মাশরুম, টমেটো খুব ছোট চৌকো করে কেটে নিন। টমেটোর খোসা আর বীজ ছাড়িয়ে নেবেন, ক্যাপসিকামের বীজ। ধরুন আপনি তিনটি ডিম নিলেন তাহলে সেই আন্দাজমত সবজি নেবেন। ডিম ফেটিয়ে নেবেন তার মধ্যে সবজি মেশাবেন, স্বাদমত নুন, আধ কাপ ভেজিটেবল অয়েল, আধকাপ দুধ, দেড়কাপ ময়দা, একচামচ বেকিং সোডা আর একশো গ্রাম পনির বা ছানা মিশিয়ে নিন ভাল করে। এর মধ্যে কোনও সবজি বা ছানা যদি না দিতে চান বাদ দেবেন। কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। এবার একটা কাঁচের কাঁধওয়ালা ফ্ল্যাট বোলে আগে বাটার বা তেল ব্রাশ করে নিয়ে ব্যাটারটা সমান করে বিছিয়ে দিন। ওপরে ছড়িয়ে দিন গ্রেট করা চীজ। আর ইচ্ছে হলে চিলি ফ্লেকস বা গোলমরিচ গুঁড়ো দিতে পারেন।

প্রি-হিটেড আভেনে ১৮০ ডিগ্রিতে ৩৫ থেকে ৪০ মিনিট বেক করুন। হয়ে গেলে কেটে নিয়ে গরমগরম পরিবেশন করুন সকালে বা রাতে যে কোনো সময়।

চন্দ্রাশ্রী মিত্র (পাতা)

খুচরো ডুয়ার্স

ফের গোষ্ঠী-ফাইট হাট-বাজার জমিয়া উঠুক

কলম সিং

লকডাউন কখন কী ভাবে হইবে তা বুঝিতে না পারিয়া সমিতির সদস্য হারু রায় কহিল, ‘পঞ্জিকায় লিখিয়া দেওয়া উচিত ইহা কখন কয়টায় ধরিবে আর কয়টায় ছাড়িবে।’ ইহা লইয়া সমিতিতে আলোচনা শুরু হইতেই পারিত, কিন্তু তখনই মোবাইল খুলিয়া দেখাইলো ডুয়ার্সের ছোটফুলে উল্লেখযোগ্য রদবদল হইয়াছে।

দেখিয়া সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সকলেরই কমবেশি ধারণা যে পূজার পর ভোটের বাদ্যি বাজিলেই করোনা পালাইয়া কুল পাইবে না। টিকাও কিছু একটা বাজারে আসিয়া যাইবে। তাই রদবদলের সংবাদ তাহাদের আহ্লাদিত করিল। তবে কবিরত্ন পুরন্দর ভাট বহু আগেই লিখিয়াছিলেন:

ভোটরূপি এন্টিভাইরাস যায় বাড়ি বাড়ি।
তাহাকে দেখিয়া ভাগে যত মহামারী।।

কোচরাজ্যে ছোট ফুলের শাসনভার অর্জুনমূর্তির হস্তে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া সমিতির পলিটিকাল বিশ্লেষক চাণক্য নন্দী কহিল, ‘দেখিয়াছেন কলমবাবু! বড় সূর্যের দিন বোধহয় ফুরাইল! আগেই বলিয়াছিলাম তিনি বেশি দিন আর নাই। তাহার কথাবার্তা ক্রমশ বড় ফুলের সূর্য ঘোষের মতো হইয়া যাইতেছে। ভালো কথা, বৈকুণ্ঠপুর-এর সম্মোহনবাবুর খবর কী?’

পাশ থেকে কে জানি কইল, ‘মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং! তিনিও দল ছাড়েন নাই দলও তাকে ছাড়েন নাই।’

কাজ না পাইয়া শিলিনগর ছাড়িয়া পাব্লিক কাটিয়া পড়িতেছে। শিলিনগর ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতেছে। খান তিনেক হাতি এই ফাঁকে শিলিনগরে পায়চারি করিয়া গিয়াছে বলিয়া কে জানি খবর দিল। সমিতির সদস্য এবং ‘গাছ কাটলে ফাটাবো মাথা’ সমিতির কার্যকরী প্রেসিডেন্ট নিঝুম গোঁসাই এর ধারণা তার সাইলেন্ট

করোনা হইয়াছে। সমিতির এক কোণে একাকী বসিয়া থাকেন। সেই কোণ হইতেই তিনি চেঁচাইয়া বলিলেন, 'বিশ্বকর্মা পূজা হইবে কিনা তাহা মাপিতে আসিয়াছিল। বাতাস ফ্রেশ দেখিয়া টের পাইয়াছে হইবে না। ফ্রেশ এয়ার মানে ইন্ডাস্ট্রি নাই, তার মানে পূজাও নাই— এলিফ্যান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস।'

অতঃপর চিনে বিশ্বকর্মা পূজা হয় কি না তাহা লইয়া আলোচনা হইল।

কিন্তু কোচদেশে অর্জুনমূর্তির পুনর্বহালের সংবাদ পাইয়া এবং বৈকুন্ঠপুরের সম্মোহনবাবুর উন্নয়নের খবর নাই দেখিয়া মনে হইল সরকার গড়িবার পর যাহারা ইনস্টলমেন্ট ছোট ফুলে মধু খাইতে গিয়াছে, ডুয়ার্সে তাহাদের মহাদিদি খুব একটা আর ভরসা করিবেন না। দু-একজন বড়জোর পাত্তা পাইবেন।

তখনই দারোগা বসুনিয়া গলদঘর্ম হইয়া কোথা হইতে আসিয়া দুই টান মারিয়া শান্ত হইয়া কহিলেন যে কোচরাজ্যে নাকি অনেকগুলি অস্ত্র ধরা পড়িয়াছে। সেগুলি বাহিরে বেচিবার প্ল্যান ছিল নাকি স্থানীয় পোলাপানদের হাতে পূজার উপহার হিসেবে দেওয়া হইত তাহা জানা যায় নাই।

সমিতির সদস্যরা অবশ্য পোলাপান বিষয়টাকেই স্বীকার করিলেন। কর্মহীন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করিল, 'ভোট তবে জমিবে ডুয়ার্স, কী বলেন?'

বসুনিয়া জানাইয়া দিলেন, নাইই যদি জমে তবে পুলিশ জীবন বৃথা। তাহার পর তৃপ্তির সুরে কহিলেন, 'আমি চান্স পাইলে দলনিরপেক্ষ লাঠিচার্জ করিব।'

অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মী মজুমদারবাবু এতক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া ছিলেন। এবার নড়িয়া চড়িয়া বলিলেন, 'সবজির দামের খবর রাখেন মশাই? আলু কিনছি না এন্টিবায়োটিক ট্যাবলেট কিনছি বুঝতেই পারি না।'

সকলে হাহাকার করিয়া কহিল, 'বটেই তো বটেই তো! আলু তিরিশ বেগুন আশি— অকল্পনীয়!'

প্রাক্তন সন্ন্যাসী গোকুলচন্দ্র কথা মাপিয়া বলেন। এইবার কহিলেন, 'শিলিনগরে সবজির গাড়ি হইতে তোলা আদায় চলিতেছে। এই কারণেই বেগুন আশি।'

মধ্যবয়সী যুবনেতা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, 'বাজে কথা! স্যানিটাইজারে আঠার পারসেন্ট জিএসটি লইয়া কিছু বলুন!'

বামপন্থী কালুদা গলার রগ ফুলাইয়া টিপ্পনি কাটিলেন: 'আপনারা তো মহাশয় উহাদের বি টিম!'

অতঃপর যুক্তি তক্কো গপ্পো চলিতে লাগিল। সেই অবসরে আমি কয়েকটি সংবাদ টুকিয়া পুরন্দর ভাটকে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি নোট দিয়া ফেরত দিলেন। নোট সংবলিত সংবাদ আপনাদের দিতেছি।

১) কোচবিহারে ১০০ দিনের কাজ দ্বিগুণ বৃদ্ধি।
নোট: শুনিয়াই সন্দেহ হইতেছে। ভুতুড়ে কাজ আর ভুতুড়ে কর্মী কত খোঁজ লইতে হইবে।

২) দিনহাটার রাস্তাঘাট বেশ খারাপ।
নোট: দরকারে হেলিকপ্টার দাও তবুও রাস্তা ঠিক করিও না।

৩) রামসাই আর লাটাগুড়ি থেকে এক জোড়া কিং কোবরাকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ফেরত পাঠানো হলো।
নোট: ভুল হইয়াছে। উহারা কোয়ারান্টিনে আসিতেছিল। ১৪ দিনের আগে ফেরত পাঠানো উচিত হয় নাই।

৪) ময়নাগুড়িতে ভাঙা রাস্তায় ধানগাছ পুঁতিয়া বিক্ষোভ।
নোট: জানি। রাস্তা এতটাই খারাপ যে ধানগাছগুলিও মরিয়া গিয়াছে।

দেখিলাম করোনা ভাইরাস এর চাপে বাকি খবর মুছিয়া গিয়াছে। এই রকম চলিলে বানাইয়া বানাইয়া খুচরা লিখিতে হইবে। প্রার্থনা করি ডুয়ার্সের রাস্তায় লোক ফিরিয়া আসুক, গোষ্ঠী ফাইট শুরু হউক, হাট-বাজার জমিয়া উঠুক! তাড়াতাড়ি হউক! আর ভালো লাগিতেছে না।

EKHON DUARS, Vol-7, Issue-2 WBBEN/2014/56733 Rs. 20 only

ডুয়ার্সের বইপত্র। রংরুটের বইপত্র। ছোটদের বইপত্র

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা
এখন ডুয়ার্স সাহিত্য ২০২০। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা
গণ আন্দোলনে কোচবিহার। হরিপদ রায়। ২৪০ টাকা
রাণী নিরুপমা দেবীর নির্বাচিত রচনা। দেবায়ন চৌধুরী। ১৬০ টাকা
শ্রম ও জীবিকার উত্তরপক্ষ। প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। ১৬০ টাকা
কথায় কথায় জলপাইগুড়ি। রণজিৎ কুমার মিত্র। ২০০ টাকা
আদিবাসী অসুর সমাজ ও সংস্কৃতি। প্রমোদ নাথ। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা
দিল সে দিল্লী সে। কল্যাণ গোস্বামী। ২৯৫ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন। সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে। প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন। ১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা
মুর্শিদাবাদ। জাহির রায়হান। ১৯৫ টাকা
বাংলার উত্তরে টই টই। দ্বিতীয় সংস্করণ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৯৫ টাকা

বিষয় নাটক

নাট্য চতুষ্টয়। রবীশ্বর ভট্টাচার্য। ১৬০ টাকা
নির্বাচিত বেতার-শ্রুতি নাট্যগুচ্ছ। সমর চৌধুরী। ২৪৫ টাকা
বাঙ্ময়। সব্যসাচী দত্ত সম্পাদিত। ১২৫ টাকা

শুরু হল ছোটদের সিরিজ

গাছ গাছালির পাঠ পাঁচালি। শ্বেতা সরখেল। ১৯৫ টাকা
ডুয়ার্স ভরা ছন্দ ছড়া। বৈকুণ্ঠ মল্লিক সম্পাদিত। ১৯৫ টাকা

*** প্রায় নিঃশেষিত

এখন ডুয়ার্স

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।
হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে
ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের অনলাইন শোরুম **www. dooarsbooks.com**

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.